অপর দশ জাতির বল বিক্রমে বা আচার ব্যবহারেও নিরীহ একজাতির ভালমন্দ ঘটিতে পারে, ও ঘটিতেছে। যদি বাবর শাহ বা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ও স্বজাতীয়গণ ভ্রমণশীল, যুদ্ধক্ষম, শ্রমসহিষ্ণু, দিগ্বিজয়াকাঙ্ক্ষী না হইতেন, তাহা হইলে পৌরাণিক হিন্দু সন্তান হয়ত আরও শতশতবৎসর যজনাধ্যায়ন ও ঈশ্বর চিন্তায় যাপিত করিত। যদি অর্জ্জনস্পৃহ বণিগ্‌জাতির করতলে বঙ্গদেশ এই শতাধিক বৎসর যাপন না করিত, তাহা হইলে কি এখনকার মত বঙ্গসন্তান, মানমর্য্যাদা, লোক লৌকতা, সম্ভ্রম, সৌজন্য—সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া কেবল ধনসঞ্চয় করিতে ব্যস্ত হইত?

কোন একজাতির শুভাশুভ যে নানা দেশবাসীর জাতিগত চরিত্রের উপর নির্ভর করে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে সকল বিলাতীয় বিখ্যাতনামা পণ্ডিত শুদ্ধ দেশবিশেষের অবস্থা হইতে জাতিবিশেষের চরিত্র নিষ্কাশিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা অর্দ্ধদর্শী। সকল জাতির শুভাশুভের কারণ কেবল জড় নহে; শুভাশুভের কারণ জড় এবং জীব। যখন আমরা আমাদের বীর্য্যহীনতার উল্লেখ করিয়া বলি, যে, "শাক সিদ্ধান্ন শর্কর সেবনে আমাদের আর কত বীরত্ব হইবে?" তখন আমরা জড় প্রকৃতিকে আমাদের দুরবস্থার কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। তাহারপর আবার যখন বলি, "আর শত শত বৎসর দাসত্বের পর বীরত্ব থাকিবেই বা কি প্রকারে?" তখন আমরা জীব প্রকৃতিকে আমাদের দুরবস্থার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। বাস্তবিক জড় জীব উভয়েই আমাদিগের বিরোধী। বোধ হয়, জন্মলগ্নকাল হইতে জড়জগৎ আমাদিগকে জড়ীভূত করিতেছে; আর জীবগ্রহ একটির পর একটি আসিয়া, কেন্দ্রে ভর করিয়া, অনিষ্টসাধন করিতেছে। শুনিতে পাই আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে সকল ব্যবস্থাই আছে, এ কুগ্রহ-শান্তি-স্বস্ত্যয়নের কি কোন ব্যবস্থা নাই?

এই কুগ্রহ জড়ের অত্যাচার নিবারণার্থ বঙ্গ সন্তান কার্য্যে কোন চেষ্টা করুক বা না করুক, অন্ততঃ কথায় স্বীকার করেন, এবং হয় ত কেহ কেহ মনেও বুঝিয়াছেন। আহার পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন করিতে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে, উচ্চ ভূমিতে বাসকরিতে, প্রশস্ত গৃহে শয়ন করিতে—বাঙ্গালি এখনও অভ্যাস করেন নাই বটে, কিন্তু বোধ হয় যেন কিছু চেষ্টা করিতেছেন।

জীবপ্রকৃতির কার্য্যকারিত্ব সম্বন্ধে বাঙ্গালি বুঝেন—কেবল বর্ত্তমান সম্বন্ধ। সেই জন্যই বাঙ্গালায় সম্বাদপত্রের সৃষ্টি, সেই জন্য সভা, সেই জন্য বক্তৃতা; সেই জন্যই বাঙ্গালার রাজনীতি, সমাজনীতি এরূপ স্বল্পায়ত। বাঙ্গালির ইতিহাস নাই; বাঙ্গালি বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যৎ চিন্তা করেন; মহাভূতের সমীপে শিষ্যত্ব স্বীকার করেন না; সুতরাং চিরদিন কেবল গণ্ডগোল করেন। ইতিহাসে

উপেক্ষা করিয়া বাঙ্গালি যে সকল মতপ্রচার করেন, তাহা সম্পূর্ণ সহৃদয়তা ব্যঞ্জক হইলেও কোন কার্য্যকর হয় না। বাঙ্গালি বর্ত্তমান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, যে বাল্যবিবাহে, কুলীন বিবাহে, বিক্রয় বিবাহে, বাণিজ্য বিবাহে, বাঙ্গালার মহা অনর্থপাত হইতেছে, অমনই আশাস্ফুরিত হৃদয়ে বলিলেন, "এগুলি উঠাইয়া দাও।" একবার অতীত স্মরণ করিলেন না, কেন যে এগুলি এদেশে প্রচলিত হইল, একবার তাহার অনুধাবনা করিলেন না। একবার মনে হইল না, যে, যে যে কারণে এই সকল প্রথা বাঙ্গালায় প্রচলিত হইয়াছে ও রহিয়াছে, সেগুলি যদি এখনও থাকে তাহা হইলে, যত দিন না সে কারণগুলির ধ্বংস হয়, তত দিন পূর্ব্বোল্লিখিত প্রথাগুলি কখনই দেশ হইতে উৎপাটিত হইবে না। কারণের ধ্বংস না হইলে কার্য্যের নাশ হইবে না। সমাজসংস্করণের পূর্ব্বে প্রথমে কারণানুসন্ধান করা, ইতিহাস শিক্ষা করা, যে নিতান্ত কর্ত্তব্য একথা বাঙ্গালি আজিও স্বীকার করেন না।

জীবপ্রকৃতির তাড়নায় কোন জাতির আচার, ব্যবহার প্রভৃতিতে যে বৈলক্ষণ্য সঙ্ঘটন হয় ইতিহাসে তাহাই বিবৃত থাকে। কোন কোন বিভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক বাঙ্গালা কতবার এইরূপ তাড়িত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। এক ইংরাজদিগের কথা দেখিতেছি, আর এক মুসলমানের কথা শুনিয়াছি। কিন্তু এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, মুসলমানবিজয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালা অন্ততঃ আরও দুই তিন বার ভিন্নজাতি বা ভিন্নধর্ম্মীকর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ইহারা সকলেই স্বীয় স্বীয় নিশান বঙ্গবাসীর অন্তর্বাহিরে রাখিয়া গিয়াছে; আমরা অদ্যাপি সেই সকল কলঙ্কতিলক সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিয়া রহিয়াছি। বৌদ্ধেরা আসিয়া মঠমন্দির নির্ম্মাণ করিল; আমরা ভাঙ্গি নাই; যে একটু আধটু ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছে, তাহা এখনও ভুলি নাই। সন্তাল আসিয়া বাঙ্গালার সর্ব্বাঙ্গে কালী ঢালিয়া দিল, এখন ঘুচে নাই; বক্ষে রক্ত ছিটাইয়া দিল, আমরা তাহা এখনও মুছি নাই। সেনবংশ কুলধ্বজা প্রোথিত করিয়াছেন, গৃহে গৃহে এখনও উড়িতেছে। মুসলমান আগুন লাগাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালা এখনও পুড়িতেছে।

আমরা অমায়িক; কিছুতেই আমাদিগের পক্ষাঘাতগ্রস্ত শরীরে বেদনা বোধ হয় না। আমরা রোগী হইয়াও যোগীর ন্যায় নিশ্চিন্ত বসিয়া আছি। কিন্তু আর নিশ্চিন্ত থাকিলে চলে না। এখন অনেকেই সমাজসংস্কারকরূপে বাঙ্গালায় অবতীর্ণ হইয়া নানাবিধ প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছেন। ইতিহাসের সাহায্য না লইয়া সেই সকল বিষয়ে কোনরূপ মত প্রদান করা বিড়ম্বনা মাত্র, এইরূপ বিবেচনা করিয়া আমরা বাঙ্গালার পূর্ব্ব কথা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

আমাদের দেশের কোন একটি সত্য নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রে বেদা বিভিন্না, স্মৃতয়ো বিভিন্না; হইলে ক্ষতি ছিল না, তদ্রূপ সকল দেশেই হইয়া থাকে। আমাদের কোন একটি কথার স্থির নাই। সংস্কৃতে যাহা কিছু লেখা থাকে, তাহাই লোকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, এদিকে আবার সংস্কৃতে সকল কথাই লেখা আছে; ফলে হইয়া উঠিয়াছে, এই, যে হিন্দু সন্তান ক্রমে সত্য মিথ্যা প্রভিন্ন করিবার ক্ষমতা হারাইয়াছে; একই পদার্থকে কেহ সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া শুক্ল বলিলে বিশ্বাস করে; আর একজন সেইরূপ আর্য্যাচ্ছন্দের শ্লোক পাঠ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ বুঝাইয়া দিলে, তখনই বলে যে "হাঁ উহা কৃষ্ণবর্ণ।" দুই জনে একেবারে পীড়াপীড়ি করিলে বলে যে, "দুইই হইয়া থাকে।"

সকলের বোধগম্য হইবে বিবেচনায় সামান্য 'পঞ্জিকা' হইতে একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। পঞ্জিকায় লেখা থাকে, যে বিষ্ণুর দশাবতার। সত্যযুগে, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ। ত্রেতায় বামন, পরশুরাম ও শ্রীরামচন্দ্র। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধ। কলিতে (হইবে) কল্কী। পৌরাণিক এসকল কথায় বিশ্বাস করেন। তাঁহার পুরাণে আরও শুনা যায়, যে পরশুরাম ও দাশরথি রাম সমসাময়িক—দশরথ জামদগ্ন্যের ধনুর্ব্বহন করিতেন; জানকীর সহিত পরিণয়ের পরই শ্রীরামচন্দ্র পরশুরামের সহিত পথিমধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করেন। উত্তম, পরশুরাম ও দাশরথি রাম সমসাময়িক হইলেন। দ্রোণাচার্য্য পরশুরামের শিষ্য। দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনাদির গুরু ও শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক। সুতরাং তিনটি অবতারের সময় অব্যবহিত পরে পরে হইতেছে। শুদ্ধ তাহাই নহে। কলির আরম্ভেও যুধিষ্ঠির রাজা এবং দ্বাপরের মধ্যেই বুদ্ধাবতার সুতরাং এক যুধিষ্ঠিরের সময়েই (কৃষ্ণ ও বুদ্ধ) দুই অবতার হইয়াছেন। অতএব পরশুরাম, দাশরথি রাম, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব চারিটি অবতারই এক সময়ে হইয়া উঠিল। অথচ মধ্যে একটি পৌরাণিক দ্বাপরযুগ গিয়াছে। দ্বাপরযুগের পরিমাণ ৮৬৪০০০ বৎসর। বুদ্ধদেব যুধিষ্ঠিরের সময়ে, যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য, দ্রোণাচার্য্য পরশুরামের শিষ্য। পৌরাণিক প্রথানুসারে এক একজনের জীবনকাল দশ সহস্র বা বিংশতি সহস্র বর্ষ স্বীকার করিলেও, কিছুতেই আট লক্ষ বা নয় লক্ষ বৎসর হইবে না। গণিতের সহিত, জমা খরচের সহিত, এসকল কথার কোন সম্পর্ক নাই। শুন, বিশ্বাস কর, আর নিদ্রা যাও।

এইরূপ সকল কথাতেই। একটু পরীক্ষা করিতে যাইলেই মহা বিপদ্; কিছুতেই বুঝা যায় না, সমস্ত শিথিল হইয়া পড়ে। ভারতবাসিগণ একটি সহজ উপায় স্থির করিয়াছেন, কোন কিছু বিবেচনা না করিয়া সকল কথায় সম্মতি-

দান করিতে শিক্ষা করিয়াছেন। একজন সেকেন্দর মাকিডন হইতে ভারতবর্ষ জয় করিতে আসিয়াছিলেন, ভারতবাসী তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন; আর একজন সেকেন্দর শাহ দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন; অমায়িক ভারতবাসী জানেন দুইই এক। নানা সময়ে নানা বিক্রমাদিত্য ভারতে রাজ্য করিয়াছেন, ভারতবাসী জানেন বিক্রমাদিত্য একজন। অষ্টাদশ পুরাণ, একই জনের কৃত; মহাভারত—সেই মহাত্মারই কৃত; বেদ গ্রন্থন—তিনিই করিয়াছিলেন, দ্বাপরে চন্দ্রবংশের তিনিই—ঔরস পিতা; প্রধান দর্শন বেদান্ত—তাঁহারই কৃত। শৈব বৈষ্ণবে দ্বন্দ্ব—তাঁহা হইতেই আরম্ভ হয়। ব্যাসকাশী—তিনিই পত্তন করেন, বদরীনাথ মহাদেব—তাঁহারই স্থাপিত। এসকল কথায় কোন তর্ক নাই। পুরুষানুক্রমে বিশ্বাস কর; আর লীলাসম্বরণ কর।

এইরূপ বিকৃতবাদে বাঙ্গালার ইতিহাস পরিপূর্ণ। আমাদের বোধ হয় বাঙ্গালার ইতিহাসের "বিসমল্লায় গলৎ" আছে, ইহার "সিদ্ধিরস্তুতে" বর্ণাশুদ্ধি আছে। এখন যে সমাজ দেখা যাইতেছে, এ সমাজের বীজ এক সময়ে এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপ্ত হয়; আর এক সময়ে আর এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক তাহার অঙ্কুর সমস্ত রোপিত হয়। ব্রাহ্মণ আনিল কে? আদিশূর। শ্রেণীবদ্ধ করিল কে? বল্লাল সেন। কায়স্থ আনিল কে? আদিশূর। শ্রেণীবদ্ধ করিল কে? বল্লাল সেন। আদিশূর রাজা, রাজবংশীয়েরা বৈদ্য। উপবীত প্রদান করিয়া গৌরব বৃদ্ধি করিল কে? সেই বল্লাল সেন। বণিক্ বঙ্গে কবে আসিল? আদিশূরের সময়ে। সেই বণিক্‌কে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া, এক জাতিকে হীনগৌরব করিল কে? বাঙ্গালার ইতিহাসের সেই দ্বিতীয় নায়ক বল্লাল সেন। বর্ত্তমান সামাজিক বিভাগ সম্বন্ধে সকল প্রশ্নের উত্তর এইরূপ একই। কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোক ও বাঙ্গালা কারিকা এই অনর্থ উৎপাদন করিয়াছে। এই সকল বচনে বিশ্বাস করিলে বাঙ্গালা কি ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই।

বাঙ্গালার পূর্ব্ব কথার পরিষ্কৃতিসাধন জন্য আমরা এইরূপ বালক বুঝান প্রবাদ যে কখনই সত্য নহে, তাহাই প্রদর্শনের চেষ্টা করিব। অনেক দিন হইতে আমরা এই কথার বাচনিক আলোচনা করিয়া আসিতেছি; আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনয়ন করেন, একথায় বিন্দুমাত্র সংশয় আছে, শুনিলেই ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ শিহরিয়া উঠেন, যেন তাঁহাদিগের নিজের ও পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরব লোপ করিতে আমরা উদ্যত হইয়াছি, এইরূপ জ্ঞান করেন। এটী কুসংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে। মুখুয্যে মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষকে কোন রাজা আনেন নাই, ও একখানি গ্রাম দান করিয়া স্থাপিত করেন নাই, তাঁহারা বাঙ্গা-

লায় দুই সহস্র বৎসর বাস করিতেছেন। তাহাতে ক্ষতি কি? ইহাতে অগৌরবের কথা কিছুই নাই।

অতএব ভরসা করি আমাদিগের দ্বিতীয় প্রস্তাব সর্ব্ব সমীপে বিশেষ আলোচিত হইবে।

দরিদ্র যুবক।

১

চন্দ্রমাশালিনী নিশা গভীর সুমতি!
নির্ম্মল নীলিমাকাশে,সুধাংশু নক্ষত্র হাসে,—
হাসায় পার্থিব, নৈশ শোভার প্রকৃতি!
ভূধর, প্রান্তর, বন, নদ নদী প্রস্রবণ,
হাসিব তরঙ্গে ভাসে বিকাশি মূরতি!
হেসে পাগলিনী হল ধরারূপবতী।

২

পাদপ পাতাব আর স্রোতস্বতীকূলে
ধবলফুলিত কাশে, সোহাগে খদ্যোত হাসে
শশীমুখী সন্ধ্যামণি হাসে মন খুলে;
মৃদুনৈশ বায়ুভরে, আদরে গলিয়া পড়ে;
ধবল তুহিনকণা মুক্তাহার গলে!
এসব থাকিবে কোথা, নিশি পোহাইলে?

৩

ওই যে ভূধর হতে নির্ঝর নির্ম্মল
বারিবিম্ব ভেসে যায় চন্দ্রমাতে দীপ্তিপায়,
পলকে মিশায়ে হবে যে জল সেজল!
গাঢ় জলদের ঘটা চল সৌদামিনী ছটা
গম্ভীর অশনি, ঘোর বৃষ্টি অবিরল
হইলে সহসা কোথা যাবে এসকল?

৪

ওই যে নৈশিক বায়ু মৃদুল দুলিয়া
দুলায় বৃক্ষের পাতা, দুলায় বনের লতা,
দুলায় শারদী নদী থাকিয়া থাকিয়া
সৌধ গবাক্ষেতে পশি স্বেদসিক্ত মুখশশী
কার মুছাইছে ওই আদরে গলিয়া
ওই যে মৃদুলানিল মৃদুল দুলিয়া!

৫

চঞ্চল শঠের প্রেম হীরক রতন
উপরে অমিয়ময় গোপনে গরল বয়;
আপাত সুখের পরে সংহারে জীবন!
পৃথিবী কম্পিত করি-ভূধর উপাড়ি পাড়ি
গম্ভীর কল্লোলি নীল সাগরে যখন
ভীম দুর্নিবার ঝড় হবে নিমগন

৬

তখন কোথায় রবে এসব সম্পদ?
ধীরে কি বনের লতা,ধীরে কি গাছেরপাতা
ধীরে কি গবাক্ষে লয়ে সুরভি আমোদ
দুলিবে? দুলাবে সবে? কোথায় নিবায়ে যাবে
কৌমুদী চন্দ্রমা হাসি অমৃত আস্পদ!
মেঘেতে মিশাবে সব হইবে বিপদ!

৭

হেসনা হেসনা এত হাসি ভাল নয়
নির্ম্মল হৃদয়াকাশে, অমনিই হেসে হেঁসে
আশার সুধাংশু হয়েছিল যে উদয়,
সেই দিন সাধ করি,হেসেছিনু মুখভরি,
অমনি আঁধার হল এ পোড়া হৃদয়
তাই বলি এত হাসি হাসা ভাল নয়!

৮

এই যে মধুরা নিশা নিদ্রিতা ধরণী,
নিদ্রা আসিলনা চখে, কি ভাবিছি মনোদুখে?
কি ভাবনা—কাহারে বা বলি সে কাহিনী?
হৃদয়ের মধ্যে উঠে, হৃদয়ের মধ্যে ছুটে
হৃদয়েই লয় হয়, আপনা আপনি,
কে শুনিবে অভাগার দুঃখের কাহিনী?

৯

সংসার তড়াগ মাঝে জীবন মৃণালে
সোদর কমল নিধি, প্রতিভার প্রতিকৃতি
বিদ্যান আদর্শ হয়েছিল যত্নবলে,
বিকাশ হতে না হতে সুবার ভীষণ স্রোতে
জীবন বন্ধনে মোর অতলে ডুবালে
সুখের প্রদীপ নিবাইয়া দিলে কালে!

১০

আশ্রয় বিহীন, লয়ে শৈশব জীবনে
অপুষ্ট পাষাণ গলে, সংসার সাগর জলে,
ডুবাইনু দেহ ভাবি উৎকর্ষ রতনে
হৃদয় উৎসাহ হীন, হুতাশে শরীব ক্ষীণ
কি করিব কি হইবে যাব কোন স্থানে
ভাবিয়া কাঁদিছি নিত্য বসিয়া নির্জ্জনে!

১১

দরিদ্র মানব চিত্ত মরুভূমি প্রায়
আশা বারি বিন্দু নাই, আশ্রয় পাদপ নাই
ভিক্ষার আকাশে ঋণ মার্ত্তণ্ড পোড়ায়!
অনন্ত আকাঙ্ক্ষা মাঠে, দুরাশা পাবক উঠে
দুশ্চিন্তা বালুকাকণা হুতাশে উড়ায়!
দরিদ্র মানব চিত্ত মরুভূমি প্রায়।

১২

সোনার কনিষ্ঠ মোর ননীর পুতুল
উত্তাপে গলিয়া যায়, ঘুমালে জাগান দায়,
নিতান্ত শৈশব প্রিয় জীবনের মূল,
বিদেশে পরের ঘরে, পরের দাসত্ব করে,
শিক্ষার আশায় হায়! বিধি প্রতিকূল!
সোনার কনিষ্ঠ মোর ননীর পুতুল!

১৩

সকল সুখের স্রোত সুখায়ে গিয়েছে!
তবু খুজে দেখি দেখি, কোন সুখ আছে নাকি?
আছেইত মরুভূমে কমল ফুটেছে!
একটি বিশুষ্ক নালে, দুটি পুণ্ডরীক দোলে
সুবাসে পূরিত, প্রাণ কাড়িয়া লতেছে
চির তপ্ত মরুভূমে কমল ফুটেছে!

১৪

এত কালে মরুভূমি করি পর্য্যটন
মৃগতৃষিকার ফাঁদে শুষ্ক কণ্ঠে কেঁদে কেঁদে
এখন পেয়েছি এক সুধার সদন!
যখন যন্ত্রণাভরে প্রাণ ছাড় ছাড় করে
পৃথিবী আকাশ সম করি দরশন,
তথনি আকাশে আঁকা সুহৃদ রতন!

১৫

সোনার প্রতিমা মোর হৃদয়ের নিধি,
লজ্জার লেপনি দিয়ে, সরলতা মাখাইয়ে
নিভৃতে নির্ম্মাণ বুঝি করেছিল বিধি,
কোমলহৃদয়া সতী, প্রণয়ের প্রতিকৃতি,
দরিদ্র আনন্দময়ী সোহাগেব নদী
সোনার প্রতিমা মোর হৃদয়ের নিধি!

১৬

ভ্রমি অনাবৃত দেহে হিমানীর শীতে
নিদাঘ সন্তাপে পুড়ে ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে
দিনান্তে যদ্যপি পাই সে মুখ দেখিতে!
দুর্গম কান্তারে থাকি যদি শশীমুখ দেখি,
কারাগারে বদ্ধ যদি হই তার সাজে
তথাপি স্বর্গের সুখ তুচ্ছ করি চিতে!

শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী।

দেবীবর ঘটক ও যোগেশ্বর পণ্ডিত।

মেল বন্ধন। তাহার সময় নিরূপণ।

আনুষঙ্গিক তৎকালিক সামাজিক অবস্থা।

এরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে দেবীবর ঘটক ও যোগেশ্বর পণ্ডিত এক-জনের দৌহিত্র। তদনুসারে এই দুইজন পরস্পর মাসতুত ভাই। যোগেশ্বর কুলীনপুত্র। দেবীবর বংশজ গোষ্ঠী সম্ভূত। সুতরাং সমাজ মধ্যে দেবীবর অপেক্ষা যোগেশ্বর পণ্ডিতের মর্য্যাদা অধিক। যোগেশ্বর মুখ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। নানা দেশীয় ছাত্রগণকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন। সেই জন্য তাঁহার উপাধি পণ্ডিত হয়। যোগেশ্বর সম্বন্ধে এক প্রবাদ আছে, যে তিনি অত্যন্ত আতিথেয়ী ছিলেন। নিজের দান অতি সঙ্গোপনে নির্ব্বাহ করাই তাঁহার ব্যবস্থা ছিল। তাঁহার বদান্যতার বিষয় আপামর সাধারণের শ্রুতিগোচর ছিল না।

যোগেশ্বর পণ্ডিত এক সময়ে যদৃচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া দেশভ্রমণে নির্গত হন। দৈবগত্যা একদিন ভ্রমণ উপলক্ষে মধ্যাহ্নে দেবীবরের ভবনে উপস্থিত হইলেন। যোগেশ্বরের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে দেবীবরের জননী শশব্যস্তে দ্রুতপদে আসিয়া যথা বিহিত স্নেহ সম্ভাষণ পুরঃসর অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা করিলেন। যোগেশ্বর বিনয় বচনে অতি নম্রভাবে তদীয় মাতৃষ্বসার শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। তিনিও যথাবিহিত আশীর্ব্বচন প্রয়োগ পূর্ব্বক যোগেশ্বরকে কহিলেন, বাছা জলপান কর, আমি তোমার জন্যে অন্নাদি প্রস্তুত করিতে যাই।

যোগেশ্বর তদীয় মাতৃষ্বসার সেই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, মাসি, আমার মাতামহ আপনাকে যে কুলে সম্প্রদান করিয়াছেন, আমরা সে কুলে পদ প্রক্ষালনও করি না। অতএব আপনি আহারের জন্য আমায় বিশেষ অনুরোধ করিবেন না। আপনি মাসি আপনার অন্ন পরিত্যাগ করিয়া আপনার বাটীতে স্বপাকে ভোজন করিলে গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়। তাহাতে পাতক জন্মে। এবং মাসতুত ভাই দেবীবরের গৃহে ভোজন করিলে আমাদিগের মর্য্যাদার হ্রাস হয়। সুতরাং আপনার অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সহজ ও সাধ্যায়ত্ত নহে। এই বলিয়া যোগেশ্বর প্রস্থান করিলেন। যোগেশ্বর পণ্ডিত যে সময়ে দেবীবর ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তৎকালে দেবীবর দেশভ্রমণে নির্গত হন।

দেবীবর বাটী আসিয়া জননীকে অপ্রসন্ন দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি স্বীয় মনঃক্ষুণ্নের পূর্ব্বাপর সমস্ত

কারণ গুলি স্বীয় পুত্রের নিকট বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন বাপু, যদি যোগেশ্বর আমার বাটীতে আসিয়া সাধ্য সাধনা পূর্ব্বক অন্ন দাও বলিয়া ভোজন করে, এরূপ কোন উপায় করিতে পার, তবেই প্রাণরক্ষা করিব, নতুবা আমার এ মর্য্যাদাহীন তুচ্ছজীবনে প্রয়োজন কি! দেবীবর কহিলেন মাতঃ ক্ষান্ত হও, মনের খেদ মনেই রাখ। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে অচিরেই তোমার মনোমালিন্য দূর করিব, যদি নিতান্তই অকৃতার্থ হই, তাহা হইলে তোমার নিকট এ মুখ দেখাইব না ও জীবন রাখিব না।

দেবীবরের জননী কহিলেন বাছা তুমি উদ্বিগ্ন হইও না। আমার পরামর্শ শ্রবণ কর; কালীর আরাধনা কর, সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিবে।

দেবীবর যখন দেবীর বর পাইয়া সিদ্ধ হন, তখনই তাঁহার নাম দেবীবর হয়। ইতি পূর্ব্বে ইহাঁর অন্য এক নাম ছিল। সিদ্ধ হইলে তাঁহার সে নাম লোপ পায়। তিনি দেবীবর নামেই প্রসিদ্ধ হইলেন। সুতরাং তাঁহার প্রকৃত নাম পাওয়া যায় না। দেবীবরটী তাঁহার উপাধি স্বরূপ ধরা যায়।

দেবীবর বাক্‌সিদ্ধ হইয়া কৌলীন্য মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাঢ় ও বঙ্গের সমস্ত প্রদেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কুলাংশে কে কত দূর পরিশুদ্ধ অবস্থায় অবস্থিত আছেন, তাহা স্বচক্ষে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বিশেষ পর্য্যালোচনা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানিতে পারিলেন, যে কুলীনদিগের অধিকাংশই নবগুণবিহীন হইয়াছেন। তখন বিবেচনা করিলেন, আমার নিজের কৃতিত্ব দেখাইবার এই প্রকৃত অবসর ও সময়।

তিনি সময় বুঝিয়াই সমস্ত ঘটক চূড়ামণি দিগকে আহ্বান করিলেন। তাঁহাদিগের নিকট কুলীন দিগের দোষোল্লেখ পূর্ব্বক কৌলীন্য মর্য্যাদার পুনঃ সংস্কারের ব্যবস্থার উল্লেখ করেন। সমস্ত কুলাচার্য্য একবাক্য হইয়া দেবীবরের অভিপ্রায়ের অনুকূল পক্ষে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাহাদিগকে স্বপক্ষ পাইয়া দেবীবর দিনস্থির করিলেন।

যেদিন সভায় উপবিষ্ট হইয়া সভ্যমণ্ডলীর মধ্যে সকলের গুণ বিচার পূর্ব্বক সভার অগ্রে মর্য্যাদা সংস্থাপন করিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে হঠাৎ একটী দৈববাণী হইল যে বৎস দেবীবর! তুমি যেদিন কৌলীন্যাদির নিয়ম নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক বিশেষ সভা করিবে সেদিন সমস্ত দিবসের জন্য কৌলীন্য বিষয়ে তোমার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা থাকিবে না। তুমি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত সভার নির্দ্ধারিত দিবসে দশ দণ্ডকাল মধ্যে কুল মর্য্যাদা প্রদান বিষয়ে অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী থাকিবে; নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইলে কুলমর্য্যাদা প্রদান বিষয়ে তোমার প্রভাব থাকিবে না।

দেবীবর দৈববাণীর প্রতি বিশেষ

বিশ্বাস সহকারে কার্য্য করিবেন বলিয়া সপক্ষ ও বিপক্ষ মণ্ডলীর নিকট আকাশ বাণীর কথা প্রচার করিলেন।

নির্দ্ধারিত দিন উপস্থিত হইল, ঘড়িয়াল ঘড়ি ধরিয়া বসিয়া থাকিল। দেবীবর দোষ দেখিয়া একবিধ দোষাশ্রিত ব্যক্তিবর্গকে এক এক দলনিবদ্ধ করেন। তদনুসারে এক একটী মেল হয়। সমস্ত কুলীনকে ছত্রিশটী মেলে বিভক্ত করেন।

যোগেশ্বর পণ্ডিতের কুল বিচারের সময় দেবীবরের মুখ হইতে নিম্নলিখিত কারিকাটী নির্গত হইয়াছিল। যথা

শশে যদি বিষাণং স্যা-
দাকাশে কুসুমং যদি।
সুতো যদিচ বন্ধ্যায়াং।
তদা যোগেশ্বরে কুলং॥

যোগেশ্বর পণ্ডিত খড়দহ মেলের প্রকৃতি। ইনি দেবীবরের সমসাময়িক লোক। কেননা তিনি দেবীবরের মাসতুত ভাই ও সমবয়স্ক। দেবীবরের বাটীতে অন্নগ্রহণ না করাতেই যোগেশ্বর প্রথমে নিষ্কুল হন। দেবীবর কেন যোগেশ্বরকে নিষ্কুল করিয়াছিলেন তাহা প্রথমে যোগেশ্বর অনুভব করিতে পারেন নাই। তৎপরে দেবীবরের অনুগ্রহে যোগেশ্বর পুনর্ব্বার কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন ইহা প্রসিদ্ধ কিম্বদন্তী।

শোভাকর ভট্টাচার্য্য লক্ষণ সেনের মন্ত্রী পরম পণ্ডিত হলায়ুধ ভট্টের বংশীয়, সুতরাং ইনি চট্টোপাধ্যায় কুলসম্ভূত।* ইনি দেবীবরের মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন। এই হেতু মনে করিলেন কুলমর্য্যাদা প্রাপ্তি বিষয়ে দেবীবরকে অবশ্য আমায় সর্ব্বপ্রধান করিতে হইবেক। তদনুসারে তাঁহার অন্তঃকরণে আর একটি ভাব উদয় হইল। সে ভাবটী এই, দেবীবর পরম পণ্ডিত, ও সিদ্ধ ব্যক্তি। সিদ্ধ হইলেও সে সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে গুরুর নাম গ্রহণ পুরঃসর স্বস্তিবাচন করে। আমিই তাহার গুরু। আমি যদি সভার অগ্রে উচ্চাসনে আসীন হইয়া তাহাকে সন্দর্শন দিয়া, তাহার প্রীতিবিধান করিতে পারি, তাহা হইলে সে অবশ্য গুরু দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-কুলীন বলিবে।

এই মনস্কামনা স্থির করিয়া সভার অগ্রে এক উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইলেন। সভার অগ্রে সভাগণের বিনানুমতিতে উচ্চাসনে উপবেশন যে অতীব দূষ্য ইহা দেবীবর বিলক্ষণ জানিতেন, তদনুসারে তিনি গুরুর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। দেবীবর সভাপতি, সভাপতির ভাব দেখিয়াই সভ্যেরা মনে করিল দেবীবর ইঁহার অশিষ্টতা অবগত হইয়াছেন, সুতরাং এবিষয়ের উল্লেখ দ্বারা

* বহুরূপঃ শুচো নাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ।
বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ॥
ধ্রুবানন্দ মিশ্র ধৃত কুল পদ্ধতি।

আমাদিগের অসৌজন্য দেখান উচিত নহে। তথাপি সকলেই কর্ণাকর্ণিপূর্ব্বক তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন।

শোভাকরের অশিষ্টতা হেতু দেবীবর যে বিরক্ত হইয়াছেন ইহা এক্ষণে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। কিন্তু পাছে লোকে বিদ্রূপ করে এজন্য আসন হইতে অবতরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। দেবীবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস দেবীবর আমি তোমার গুরুদেব, যেন আমার মর্য্যাদা সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানাস্পদীভূত হয়।

শিষ্য গুরুর ঈদৃশ বিষম বাক্যের উত্তরে কিছু প্রতিশ্রুত হইতে পারিলেন না। গুরুদেবের নিরন্তর উত্তেজনায় কহিলেন, প্রভো নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে বাগ্‌দেবী আমার মুখ হইতে কি বলাইবেন তাহা আমি অগ্রে কি প্রকারে স্থিরনিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি॥

এই সকল জনশ্রুতির মূল এই,—

ডাক দিয়ে বলে দেবীবর।
নিষ্কুল শোভাকর॥
ডাক দিয়ে বলে শোভাকর।
নির্ব্বংশ দেবীবর।

মেলমালা

এখন দেবীবর যাঁহাদিগের প্রতি কুলমর্য্যাদা প্রদান করিলেন ও যাঁহাদিগের কুলধ্বংস করিলেন তাঁহারা কতকালের লোক তদনুসারে বিচার কর। নিম্নলিখিত ছয় ব্যক্তিকে সমকালীন ও সমান মেলের লোক বলিয়া স্থির করিতে পারা যাইবে।

১। যোগেশ্বর পণ্ডিত।
২। দিনকর চট্টোপাধ্যায়।
৩। হরি বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪। পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।
৫। ভগীরথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬। সুসেন মুখোপাধ্যায়।*

উল্লিখিত কয়েক মহাপুরুষের অধস্তন পুরুষের গণনা করিলে দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ সন্ততির অতিরিক্ত দেখা যাইবে না। এক্ষণে ত্রয়োদশ পুরুষের কাল একটা মোটামুটী ধরঃ প্রত্যেক ২৫ বৎসরে এক এক পুরুষের জন্ম ধরা যাইতে পারিবে। তাহা হইলে ২৫ × ১৩ = ৩২৫ বৎসরকাল পূর্ব্বে এই কয়েক মহাত্মা জীবিত ছিলেন।

এক্ষণে শালিবাহনের শক ১৭৯৭ উহা
হইতে ৩২৫ বৎসর
অন্তর কর।

১৪৭২ দেখিবে

* যোগেশ্বরো,দিনেশশ্চ,হরিবংশধরস্তথা।
পঞ্চাননো সুসেনশ্চ ষড়েতে টেক-
মেলকাঃ॥
ধ্রুবানন্দ মিশ্র।

পঞ্চাননে হয় কুল দিনকর বংশে।
সুসেন হয়েন মূল নৃসিংহের অংশে॥
সুসেন বলিলে হয় ত্রিযোগের সঙ্গ।
জগদানন্দের সঙ্গে আইসে যে গঙ্গা॥
পঞ্চানন পূর্ব্বে ছিল সেই অংশে মেলা।
খড়দা যোগেশ্বর বংশে কুলেতে বিরলা॥
হরিবন্দ্য গয়গড় পাল্টী মূল হয়।
বংশধর ভগীরথ জানহ নিশ্চয়
যোগেশ্বর খড়দহে বংশ সার হয়।
চট্টবংশ দলেতে দিনেশ কুল রয়॥
(বলাগড়ী নিবাসী চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত কুলচন্দ্রিকা)

যদি বার পুরুষ ধর তাহা হইলে ৩০০ তিন শত বৎসর অন্তর কর ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইবে এবং দেখিবে যে পঞ্চদশ শকাব্দার শেষভাগে দেবীবরের কৌলীন্য মর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়। এখন দেখ ঐ সময়টি কেমন সময়; তখন কোন্ ভাবের স্রোত চলিতেছে; তখন নবদ্বীপনিবাসী নিমাই ভূমণ্ডলে চৈতন্য দেব বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তখন বঙ্গ সমাজের জাতিভেদ উঠাইবার প্রস্তাব হইতেছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভিনব মত সকল হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে সমভাবে প্রচারিত হইতেছে। চৈতন্য দেব লোকান্তরিত হইয়া তদীয় কীর্ত্তির গুণ দোষের স্তুতি নিন্দা শ্রবণ করিতেছেন। যথা

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্ট চল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারী॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের বিধান।
চৌদ্দশত ছাপ্পান্নে তাঁহার অন্তর্ধান॥

চৈতন্য চরিতামৃত॥

সে সময়ে বঙ্গ সমাজের সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত। যখন স্মার্ত্ত চূড়ামণি বন্দ্যঘটীয় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বর্গবাসী হইয়া বঙ্গবাসীদিগের নিকট মহর্ষি মন্বত্রি বিষ্ণু হারীত প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেছেন, যে সময়টী আর একজন মহাপুরুষের কাল বলিয়া বঙ্গবাসীদিগের নিকট বড় আদরের ও গৌরবের সময়। তখন কানা ভট্ট শিরোমণি (রঘুনাথ শিরোমণি) পক্ষধর মিশ্রের নিকট পাঠ সমাপ্তি পূর্ব্বক মিথিলাহইতে ন্যায় শাস্ত্রের স্রোত ফিরাইয়া নবদ্বীপে আনয়ন করিয়া দেবলোকে অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বদেশীয় নৈয়ায়িক দিগের মুখ হইতে স্বীয় প্রশংসা শ্রবণ করিতেছেন। তাঁহারা শিরোমণিকে গৌতমাদি অপেক্ষা কুশাগ্র বুদ্ধি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন।

উপরি কথিত মহোদয় দিগের মত সংস্থাপিত হইলেই দেবীবরের মেলবন্ধন ও কৌলীন্য মর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়।

এই কথার প্রামাণ্য সংস্থাপন জন্য আমরা কান্যকুব্জাগত দ্বিজপঞ্চকের অধস্তন বংশাবলীর উল্লেখ করিব।

বল্লালের কৌলীন্য মর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের ত্রয়োদশ পর্য্যায় অর্থাৎ অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষে কায়স্থদিগের মধ্যে সমান পর্য্যায়ে কন্যা সম্প্রদানের ব্যবস্থা হয়।

এইটী দেবীবরের দৃষ্টান্তে হয়। পুরন্দর বসু এই নিয়ম স্থির করেন। তিনি দশরথ বসু হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ অন্তর। দেবীবরের পূর্ব্বে সর্ব্বদ্বারী বিবাহ প্রচলিত ছিল। দেবীবরের সময় হইতে সমান সমান পর্য্যায়ের কন্যা পুত্রে বিবাহের ব্যবস্থা হয়। পিতা বরে পুত্র ও পৌত্র পিতা পিতামহের সমান পর্য্যায় থাকিয়া কুল রক্ষা করিবার অধিকারী হন।

এই সময়েই কুলীন দিগের মধ্যে স্বীয় স্বীয় দলে আবার অবান্তর ভেদ হয়। সেটী এই;—আর্ত্তি ক্ষেম্য ও উচিত। ১আর্ত্তিঃ—শিরোভূষণং ২ক্ষেম্যঃ—পদভূ-

ষণং। ৩ উচিতঃ সমানং। ঘটকবিশারদ দেবীবর পিতৃ পর্য্যায়ের লোকের সহিত কন্যাদানকে আর্ত্তি শব্দে ব্যাখ্যা করেন। পুত্র পর্য্যায়ের সহিত কন্যাদানকে ক্ষেম্য শব্দে নির্ণয় করিয়াছেন। সমানে সমানে কন্যাদানকে উচিত শব্দে নির্দ্দেশ করেন। আর্ত্তিকুল হইলে শিরোভূষণ রূপে মান্য হন। ক্ষেম্য কুল হইলে পাদভূষণ রূপে পরিগণিত হন। উচিত কুল হইলে দোষ গুন কিছুই হয় না।*

দেবীবরের সময়েই কিছুকাল এরূপ সমান ঘরের বরে আদান প্রদান চলিয়া ছিল। পরে এই নিয়মানুসারে চলা কুলীন দিগের পক্ষে অতি সুকঠিন বিবেচিত হইলে অন্যান্য ঘটক বিশারদেরা সমান পর্য্যায়ের দান উত্তম বলিষা ব্যাখ্যা করেন। যথা

সপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণ মুত্তমং।
কন্যাভাবে কুলত্যাগঃ প্রতিজ্ঞাবা পরস্পরং॥

রাঢ়ীয় কুলীনগণ পর্য্যায় সমান রাখিবার জন্য বর দিতে লাগিলেন, অর্থাৎ কুলকর্ত্তা নিজের মর্য্যাদা পুত্র পৌত্র ভ্রাতৃপুত্র দিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পিতা পিতামহ ও পিতৃব্যদিগের ন্যায় সম্মানাস্পদীভূত পদে অবস্থান করিতে লাগিলেন তাঁহাদিগের গুণ দোষবরদাতার স্কন্ধে পতিত হইতে লাগিল। যথা

গ্রহণাৎ স্বস্য পুত্রস্য বরস্যাভিমতস্যচ
পৌত্রস্য ভ্রাতৃপুত্রস্য কুলকর্ত্তু র্ভবেৎকুলং।
কুলদীপিকা

ব্রাহ্মণদিগের এই দৃষ্টান্ত অনুসারে পুরন্দর বসু কায়স্থকুলের সম্মান পর্য্যায় লইয়া কুলীনদিগের বিবাহের ব্যবস্থা করেন।

কান্যকুব্জাগত কালিদাস মিত্রের অষ্টম পুরুষে ধুই গুঁই নামক দুই সন্তানের যৌবনকালে সমাজবদ্ধ হয়।* তাঁহাদিগের সমাজের নাম বড়িষা টেকা। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের আট দশ পুরুষ গত হইলে, কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপিত হয়। এবং কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপনের ত্রয়োদশ পুরুষ গত হইলে কায়স্থ দিগের মধ্যে প্রকৃত সোপান গণানুসারে সপর্য্যায়ে বিবাহের নিয়ম হয়। সুতরাং পূর্ব্বাপর দুইটীকে সমষ্টি করিলে তৎকালে কান্যকুব্জ দিগের ২৩ ত্রয়োবিংশতি পুরুষ হইয়াছে ধরিতে হয়। কায়স্থদিগের পর্য্যায় বন্ধন হইতে এইক্ষণে কাহার ১২ বার কাহার বা ১৩ তের পুরুষ হইয়াছে। এক্ষণে ঐ তের পুরুষের সঙ্গে যোগ করিলে তখন ইহাদিগের বার পুরুষের সময় ঠিক করিলে নিশ্চয় হইবে যে ঘটক

* পিতৃস্থানং ভবেদার্ত্তিঃ পুত্র স্থানঞ্চ ক্ষেমকং।
উচিতশ্চ সমানং স্যাৎ ত্রিবিধং কুল মুচ্যতে।
দেবীবর কারিকা।

* শব্দকল্প দ্রুমে কায়স্থদিগের কৌলীন্য দেখ।

বিশারদ দেবীবর ৩০০ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কুলীনদিগের মেল বন্ধন করেন।

আর একটী প্রমাণ দেখিলেও জানা যাইবে যে দেবীবরের মেল বন্ধন ঐ সময়েই হইয়া থাকিবে।

বারেন্দ্র কুলে অদ্বৈত প্রভুর জন্ম হয়। তিনি চৈতন্যের সহচর ও অভেদাত্মা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার আর এক সঙ্গী নিত্যানন্দ মহাপ্রভু। অদ্বৈত মহাপ্রভুর আট সন্তান হয় তন্মধ্যে অচ্যুত গোস্বামী সর্ব্ব কনিষ্ঠ। ইঁহাকে অদ্বৈত প্রভু বিশেষ স্নেহ করিতেন। এক সময়ে এমন বলিয়াছিলেন যে,

অচ্যুতের যেই মত সেই মোর সার,
আর সব পুত মোর হৌক ছাবথার;

অদ্বৈত বাক্য চৈতন্য চরিতামৃত।

এই সময় হইতেই ইহাঁদিগের কুলের গৌরব হয়। তৎকালে শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া গণনীয় হন। ইহাঁদিগের মেল (পটী) বন্ধনের পারিপাট্য এই সময় হইতেই হয়। এক্ষণে অচ্যুত গোস্বামী হইতে গণনা করিলেও দেখা যায় যে তৎকুলে ধারাবাহিক ১১।১২ পুরুষ হইয়াছে। ইনি আবার নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের সমবয়স্ক ছিলেন। দেবীবর বীরভদ্র সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বীরভদ্রী থাকের অন্তর্গত করেন। বীরভদ্রের জীবনকাল গণনা করিলে আমরা তাঁহাকে ৩২৫ সওয়া তিনশত বৎসর পূর্ব্বে দেখিতে পাই সুতরাং দেবীবরের মেল বন্ধনের সময় ৩২৫ সওয়া তিন শত বৎসরের অগ্রবর্ত্তী হইতে পারেনা। বরং পরবর্ত্তী হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এখন দেখ সে সময় আমাদিগের দেশে ব্রাহ্মণ রাজা ছিল কি না; সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছে কি না; তদনুসারে দেখা যায় যে তৎকালে বঙ্গদেশে প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রাহ্মণ রাজার নাম গন্ধ পাওয়া যায় না। তৎকালে বাঙ্গালা দেশে যশোহরে প্রতাপাদিত্যের অত্যন্ত প্রভাব বর্ণিত দেখা যায়। প্রতাপাদিত্য বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন।

তৎকালে ভারতের রাজধানী হস্তিনা নগরের সিংহাসনে মুসলমান ভূপতি আক্‌বর সা অধিরূঢ় ছিলেন।

দেবীবর কুলীন্ দিগকে ৩৬ প্রধান শাখায় বিভক্ত করেন। যথা—

১ ফুলিয়া	১৯ হরি মজুমদারী
২ খড়দা	২০ শ্রীবর্দ্ধনী
৩ বল্লভী	২১ প্রমোদনী
৪ সর্ব্বানন্দী	২২ দশরথ ঘটকী
৫ সুবাই	২৩ শুভরাজ খানী
৬ আশ্চর্য্য শেখরী	২৪ নড়িয়া
৭ পণ্ডিত রত্নী	২৫ রায় মেল
৮ বাঙ্গাল পাশ	২৬ চট্ট রাঘবী
৯ গোপাল ঘটকী	২৭ দেহাটী
১০ ছয়ান রেন্দ্রী	২৮ ছয়ী
১১ বিজয় পণ্ডিত	২৯ ভৈরবী ঘটকী
১২ চাঁদাই	৩০ আচম্বিতা
১৩ মাধাই	৩১ ধরাধরী
১৪ বিদ্যাধরী	৩২ বালী
১৫ পারিহাল	৩৩ রাঘব ঘোষাল
১৬ শ্রীরঙ্গ ভট্টী	৩৪ শুঙ্গোসর্ব্বানন্দী
১৭ মালধিরখানী	৩৫ সদানন্দ মানী
১৮ কাকুস্থী	৩৬ চন্দ্রবতী

এই ছত্রিশটী মেলের মধ্যে ফুলিয়া মেলের মান্য অধিক; তদনুসারে ফুলিয়া গ্রামেরও মহিমা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; কৃত্তিবাস পণ্ডিত স্বীয় রামায়ণের মধ্যে ফুলিয়া গ্রামকে সকল স্থান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সে কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? কৌলীন্য মর্য্যাদায় ফুলিয়া সর্ব্বাগ্রগণ্য স্থান সুতরাং স্বর্গ তুল্য। যথা

স্থানের প্রধান সেই ফুলিয়ায় নিবাস।
রামায়ণ গায় দ্বিজ মনে অভিলাষ॥

অরণ্য কাণ্ড।

কৃত্তিবাস যখন ফুলিয়া গ্রামের নামে আপনার মনকে প্রফুল্ল মনে করিতেছেন তখন দেবীবরের মেল বন্ধনের পরেই ফুলিয়া গ্রামের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়।

তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে তাঁহার রামায়ণে নবদ্বীপকে সপ্ত দ্বীপের সার বলিয়া বর্ণন করিতেন না। চৈতন্য রঘুনন্দন কাণা ভট্ট শিরোমণি (রঘুনাথ শিরোমণি) প্রভৃতির জন্মস্থান বলিয়াই নবদ্বীপকে সপ্ত দ্বীপের সার বলিয়াছেন। এই নিয়ম ধরিলেই ফুলিয়া গ্রামকে মেল বন্ধনের পরে প্রসিদ্ধ বলিয়া স্থির করিতে হয়। ১৪৫৬ শকে চৈতন্যের তিরোভাব হয়। ঐ কাল হইতে অন্ততঃ এক পুরুষের কাল গত না হইলে তাঁহাকে দেবতা মনে করা সহজ ব্যাপার নহে। সুতরাং ১৪৫৬ সহিত অন্ততঃ ২৫ বৎসর যোগ করিতে হয়। ঐ কালটি যোগ করিলে ১৪৮১ হয়, এই সময়ে রামায়ণ রচনার সময় ধরিলে সর্ব্বাংশের একতা হইতে পারে। ১৪৮১ + ৭৮ বৎসর যোগ করিলে ১৫৫৯ খৃঃ অব্দ হয়। এক্ষণে খ্রীষ্টীয় ১৮৭৫ এক্ষণে এই অব্দ হইতে ৩২৫ বৎসরকাল পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে মেলবন্ধনের পরবর্ত্তী ১২।১৩ পুরুষের কাল পাওয়া যাইবে। এই কাল পাইলেই জানা যায় যে কৃত্তিবাস ঐ সময়ে রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রামায়ণে নবদ্বীপাদির প্রশংসার সার্থকতা থাকে। যথা

গঙ্গারে লইয়া যান আনন্দিত হইয়া।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া॥
সপ্ত দ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম।
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করেন বিশ্রাম॥
রথে চড়ি ভগীরথ যান আগুয়ান।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা নাম সপ্ত গ্রাম॥
সপ্ত গ্রাম তীর্থ জান প্রয়াগ সমান।
সেথান হইতে গঙ্গা করিলেন প্রয়াণ॥*

সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে কৃত্তিবাস মেল বন্ধনের পর রামায়ণ রচনা করেন।

এরূপ অনুমান যে নিতান্ত ভ্রমসংকুল নহে, তাহার প্রামাণ্যসংস্থাপন জন্য কবিকঙ্কণের চণ্ডী রচনার সময়ের উল্লেখ করিতে পারি। মুকুন্দরাম নিজগ্রন্থে মানসিংহের প্রশংসা করিয়াছেন। মানসিংহ ১৫১১ শকে (খৃঃ ১৫৮৯ অব্দে) বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার নবাবী পদ প্রাপ্ত হন। কবিকঙ্কণের গ্রন্থে তাঁহার

* আদিকাণ্ড সগরবংশ উদ্ধার রামায়ণ।

মহিমা যখন বর্ণিত হইয়াছে তখন কবিকঙ্কণের চণ্ডী রচনার সময় ১৫৮৯ খৃঃ অব্দ ধরিতে হয়। ইহার ৩০. বৎসর পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার সময় নির্দ্ধারণ করিলে কৃত্তিবাসকে আমরা ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দেখিতে পাই। এই সময়েই দেবীবরের মেলবন্ধন হয় দেবীবরের দ্বারাই ফুলিয়ার নাম বিখ্যাত হয়। তৎকালে ফুলিয়া নিবাসী কৃত্তিবাসের স্বগ্রামের প্রশংসা করা অযৌক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না; বরং স্বদেশানুরাগেরই লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কেহ কেহ এরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, কবিকঙ্কণে যে সংস্কৃত শ্লোকটি আছে তাহার অর্থ করিলে কবিকঙ্কণের রচনার সময় ১৪৯৯ শাক হয়। যথা

শাকে রসরস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥

এ শ্লোকটিকে কবির নিজের রচিত বলিয়া প্রতীতি করিতে গেলে কবিকঙ্কণের স্ববচনের বিরোধ হয়। যথা

ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজ ভৃঙ্গ,
গৌড় বঙ্গ উৎকল সমীপে।
অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে,
খিলাত পায় মামুদ শরীপে।
কবিকঙ্কণ॥

মেলবন্ধনের পর ধারাবাহিক পুরুষ গণনা করিলে ১১।১২ পুরুষের অতিরিক্ত দেখিতে পাই না। সুতরাং এখন হইতে ৩০০ শত বৎসর মাত্র কাল অগ্রবর্ত্তী হইলে কৃত্তিবাসকে কবিকঙ্কণের সমকালবর্ত্তী বলিতে হয়, কারণ এখন ১৭৯৭ শক ইহা হইতে ৩০০ বৎসর অন্তর করিলে ১৪৯৭ শক হয়। এটী যদি সত্য বল তবে কি কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাস সমকালীন লোক, বস্তুতঃ তাহা নহে। কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণ অপেক্ষা ৩০—৪০ বৎসরের অধিক অগ্রবর্ত্তী কালের লোক। কৃত্তিবাসকে কেন আমরা কবিকঙ্কণের ৩০।৪০ বৎসর অগ্রবর্ত্তী বলি, তাহার কারণ এই কৃত্তিবাসের পূর্ব্বে কোন বঙ্গীয় কবি ত্রিপদী ছন্দরচনা করেন নাই। উক্ত মহোদয় জয়দেব প্রণীত নিম্ন লিখিত গীতকে আদর্শ করিয়া গীত ত্রিপদী রচনা করেন। পূর্ব্বকালে কোন নূতন বিষয় অত্যল্প কালমধ্যে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে পারিত না। তৎকালে একটি বিষয় সর্ব্ববাদিসম্মত করাইতে হইলে ন্যূনকল্পে ৩০।৪০ বৎসর লাগিত। তদনুসারেই কৃত্তিবাসকে আমরা মুকুন্দরামের ৩০।৪০ বৎসর অগ্রবর্ত্তী কহিতে ইচ্ছা করি। কৃত্তিবাসের পরেই মুকুন্দরাম লঘু ত্রিপদী ছন্দ গ্রহণ করেন ইতি পূর্ব্বে অন্য কেহ গ্রহণ করেন নাই।

গীত গোবিন্দ—
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে,
শঙ্কিত ভবদুপযানং।
রচয়তি শয়নং, সচকিত নয়নং,
পশ্যতি তব পন্থানং॥
মুখর মধীরং, ত্যজ মঞ্জীরং,
রিপুমিব কেলিষু লোলং।
চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং
শীলয় নীল নিচোলং॥

লঘুত্রিপদী যথা—

রাবণ সংহার, জানকী উদ্ধার,
কর এই উপকার।
তোমার উদ্যোগ, নহিলে দুর্যোগ,
কে লইবে হেন ভার॥
রাবণ দুরন্ত, কর তার অন্ত,
অনন্ত যশঃ প্রকাশ।
গীত রামায়ণ, করিল রচন,
ভাষা কবি কৃত্তিবাস॥

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

সুতরাং ঐ সংস্কৃত শ্লোকটী আমরা কবিকঙ্কণের রচিত বলিয়া সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না। যদি বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা নিতান্ত উহাকে কবির রচিত ব লেন, তবে উহাকে গ্রন্থ রচনার সূত্র পাতের কাল ধরিতে হইবে।

শক ১৪৯৭ (খ্রীঃ অঃ ১৫৭৫) ইহার প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে একরূপ নিশ্চয় হইল, যে দেবীবর ও যোগেশ্বর ৩২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয়েন। তৎকালে চৈতন্য অবতার বলিয়া কথিত হইতেছেন। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব-নামক স্মৃতির নিয়মানুসারে বঙ্গসমাজে আচার ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ঐ সময়েই শিরোমণির দীধিতি গ্রন্থের সবিশেষ আলোচনা দ্বারা ন্যায় শাস্ত্রের চর্চ্চার প্রকৃত পথ পরিচিত হয়। তদবধিই বঙ্গদেশীয়েরা অন্যদেশীয়দিগের নিকট বিশিষ্ট বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া পরিগণিত হন। তদবধিই চৈতন্যের দৃষ্টান্তানুযায়ী সাধারণ লোকদিগের মনে অদ্বৈত বাদের বীজ রোপিত হয়। তদবধিই বঙ্গদেশীয় জাতিচতুষ্টয়ের মধ্যে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ পুনঃপ্রবর্ত্তিত হয়। সেই সময় হইতে সন্ন্যাস ধর্ম্ম যে অন্য বর্ণের বিশেষ প্রতিসিদ্ধ নহে, ইহা আপামর সাধারণ সকলেরই প্রতীতি যোগ্য হয়। এই সময়েই প্রসিদ্ধ মন্ত্রী মুসলমান বংশোদ্ভব রূপ সনাতনের দৃষ্টান্ত অনুসারে অনেক মুসলমান বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুদিগের তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। সর্ব্ব জাতীয় প্রজাদিগকে সমভাবে দেখিতে হয়, ইহা এই সময়েই প্রথমতঃ মুসলমান ভূপতিদিগের হৃদ্বোধ হয়। এই সময়েই হিন্দুগণের বুদ্ধিমত্তা মুসলমান দিগের নিকট প্রতিভাশালিনী বলিয়া আদৃত হয়। এই সময়েই হিন্দু দিগের মাথা-গণতিকর (জীজীয়া নামক কর) ও তীর্থ যাত্রার শুল্ক রহিত হয়। এই সময়েই হিন্দু ভূপতি তোডরমল্লকর্ত্তৃক কর সংগ্রহের সুব্যবস্থা হয়। এই সময়েই শস্যের পরিবর্ত্তে মুদ্রা দ্বারা কর প্রদানের ব্যবস্থা হয়।

এই সময়েই

শশে যদি বিষাণং স্যা
দাকাশে কুসুমং যদি
সুতো যদিচ বন্ধ্যায়াং
তদা যোগেশ্বরে কুলং

এই পাঠের পরিবর্ত্তে "তদা যোগেশ্বরেঽকুলং" এইরূপ পাঠ স্থির হয়।

ব্যাকরণ অনুসারে পদের অন্তঃস্থিত একারের পর অকারের লোপ পায় এই সূত্র ধরিয়া দেবীবরের বাক্যসমর্থন পূর্ব্বক যোগেশ্বরের কুলরক্ষা হয়।

দেবীবর বাঙ্গাল ঘটক ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান তাঁহার মেলবন্ধন দ্বারাই তিনি লোক সমাজে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। দেবীবরের পিতার নাম সর্ব্বানন্দ ঘটক, পিতা মহের নাম (লক্ষণ) লখাই। প্রপিতামহের নাম আনো বা অনন্ত। বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম সঙ্কেত বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্কেত সাগরের ভাই।

কেহ কেহ বলেন বারেন্দ্র কুলের মধু মৈত্রেয়, ধেয় (ধেঞী) বাগ্‌চী, উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি, মণ্ডল মিশ্র প্রভৃতি কয়েক জন প্রসিদ্ধ লোক, দেবীবরের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

মধু মৈত্রেয় হইতে কাপের সৃষ্টি। ইনি শান্তিপুরের গোস্বামী দিগের ঘরে বিবাহ করেন। ধেঞী বাগ্‌চী ইহার ভগিনীপতি। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি বারেন্দ্রবংশে কংশনারায়ণ কুলাচার্য্য একজন প্রবলপ্রতাপান্বিত সমৃদ্ধিশালী জমিদার মণ্ডল মিশ্র বারেন্দ্র বংশের কুলাচার্য্য; উদয়নাচার্য্যের লীলাবতীনাম্নী কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। তদ্দ্বারা মধু মৈত্রেয়ের কুল রক্ষা পায়। তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্রগণ কাপ হন। শান্তিপুরের পক্ষের সন্তানগণ কুলীন থাকিলেন। মধুমৈত্রেয় অদ্বৈতের ভগিনীপতি। অদ্বৈতের পিতার নাম নৃসিংহ লাড়ুলী। নৃসিংহের পুত্র অদ্বৈতের সহচর। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র। দেবীবর বীব ভদ্রের সমকালীন লোক সুতরাং দেবীবরকে আমরা চৈতন্যেব পবরর্ত্তী বলি।

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা

উত্তর।

১

নিবুক্ নিবুক্ প্রিয়ে! দাও তারে নিবিবারে
আশাব প্রদীপ;
এই ত নিবিতেছিল, কেন তারে উজ্জ্বলিলে,
নিবুক্ সে আলো, আমি
ডুবি এই পারাবারে।

২

কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ, যুগ কত,—
কত যুগান্তর;
এই আলো লক্ষ্য করি, জীবন সিন্ধুব নীরে,
দিবস যামিনী প্রিয়ে!
ভাসিযাছি অনিবার!

৩

এখন সে আশা-আলো, হায়! দূর দরশন,
সুদূর!—স্বপন!
কতবার পাই পাই, উন্মত্ত অন্তরে ধাই
চকোরের আকিঞ্চন,
যথা চন্দ্র-পরশন!

৪

কিবা সুখ, কিবা দুখ, কিবা দেশ দেশান্তরে
জাগ্রতে নিদ্রায়,—
স্থির নেত্রে অনুক্ষণ, করিয়াছি দরশন,
এই আশা আলো প্রিয়ে;
হায়রে! বিষাদ ভরে।

৫

প্রচণ্ড তপন ত্রাস, কালের তিমিরে হায়!
এই ক্ষীণালোক,
হয়ে ক্রমে ক্ষীণতর, হতেছিল নির্ব্বাপিত,
কেন অকরুণ প্রাণে
জ্বালাইলে পুনরায়?

৬

নিবুক্—নিবুক্ প্রিয়ে, দাও তারে নিবিবারে.
জ্বালিও না আর;
উন্মত্ত জলধিরূপ, উন্মত্ত জীবন জলে,
অস্ত যাক্ শেষতারা,
হক্ সব অন্ধকার!

৭

"পাষাণ মানব মন, সময়েতে সব সয়—"
জানি প্রিয়তমে!
"পাষাণ মানব মন, সময়েতে সব সয়,"
কিন্তু সে পাষাণ মন
আশা ছাড়িবার নয়।

৮

প্রেমের অমর বর্ণে, আশার কোমল করে,
চিত্রিব যে ছবি,
কালের অনন্ত জলে, আজীবন প্রক্ষালনে,
পাষাণ মনের ছবি
প্রক্ষালিতে নাহি পারে।

৯

আশার আলোকে, যেই, বিশ্ব-বিনোদিনী ছবি
পড়েছে পাষাণে,
পাষাণ হৃদয়ে ধরি, ভাসি আশালোক চেয়ে
আশাময়ী আলিঙ্গনে
তরলিত হয় যদি।

১০

কিসে আশা? -কারছবি? জীবন কাহার ধ্যান
বলিব কেমনে?
বলিব কেমনে হায়! প্রেয়সি তোমার কাছে
আশা, তব ভালবাসা;
আশাময়ী—তুমি প্রাণ?

১১

ক্ষমাকর প্রিয়তমে, দুরাশয়ে মত্ত আমি,
উন্মত্ত পামর;
ক্ষমাকর দয়াময়ি, বিদীর্ণ-হৃদয় জনে,
ক্ষমাকর ক্ষণপ্রভা!
উন্মত্ত-প্রলাপবাণী।

১২

হায় যেই আশা স্বপ্ন, অন্তর অন্তরে মম
ছিল লুক্কায়িত;
কেহ না জানিত যাহা, বিনা সে অন্তরযামী,
আদরে রাখিয়াছিনু
দরিদ্রের ধন সম।

১৩

"পাষাণ মানব মন, সময়েতে সব সয়—"
শুনিলাম যবে
শোনিতে বিজলি ঝলি, হৃদয় বিদীর্ণ হলো,
আজি সেই স্বপ্নকথা
হইল জগত ময় ।

১৪

নির্ব্বাপিত প্রায় আশা, আবার হইল আজি
দ্বিগুণ উজ্জ্বল !
আবার পাষাণে প্রিয়ে, তবচিত্র দেখা দিল,
জীবন সিন্ধুর জল
হাসিল আলোকে সাজি ।

১৫

কিন্তু বৃথা আশা প্রিয়ে, যাবে দিন যাবে মাস,
বর্ষ যুগান্তর ;
ফলিবেনা আশাময়, জীবনের এই তীরে,
কিন্তু অন্যতীরে, প্রিয়ে !
পুরাইব অভিলাষ ।

আদিম মনুষ্য ।

এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে মনুষ্যের অসীম ক্ষমতা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয় । এই ক্ষমতা কেবল মাত্র বুদ্ধিসম্ভূত, বস্তুতঃ শারীরিক বলে মনুষ্য অনেক জন্তু অপেক্ষা হীনকল্প । কত শত বৎসরে মনুষ্যবুদ্ধি চালিত ও মার্জ্জিত হইয়া যে বাষ্পীয় কল ও তাড়িতবার্ত্তাবহ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহা কে নির্ণয় করিবে ? মনুষ্যের আদিম অবস্থার কোন পুরাবৃত্ত নাই । মনুষ্যজাতি এত কাল পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে তাহার সহিত তুলনায় ঐতিহাসিক কাল গত কল্য আরম্ভ হইয়াছে বলিলেও অন্যথা উক্তি হয় না । যে সকল লেখকেরা মনুষ্য সৃষ্টি খ্রীষ্ট জন্মের কেবল কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করেন তাঁহাদের মত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন হইয়াছে । ভূতত্ত্ব শাস্ত্র দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, মনুষ্যজাতি শত শত শতাব্দী পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল ।

কোন এক জাতীয় মনুষ্য অন্য জাতীয় অধিকতর সভ্য লোকের বিনা সাহায্যে উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে পারে কি না, এ বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে মত ভেদ আছে । কেহ কেহ বলেন, সভ্যতা ঈশ্বর প্রদত্ত ; মনুষ্য হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে অসভ্য হইয়া উঠে । পক্ষান্তরে অনেকে বলেন যে, অসভ্যতাই মনুষ্যের আদিম অবস্থা ও কোন না কোন সুযোগ পাইয়া মনুষ্য ক্রমে ক্রমে আপন মানসিক বলে সভ্যপদারূঢ় হয় । এই দুই মতের মধ্যে কোনটি সঙ্গত তাহা মীমাংসা করা কঠিন । লিখিত ইতিহাস অতি সামান্য কাল অর্থাৎ প্রায় ২৫০০

বৎসর আরম্ভ হইয়াছে ও আফ্রিকা ও আমেরিকার অসভ্যজাতিদিগের সহিত ইউরোপীয় সুসভ্য জাতিদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রায় ৪০০ বৎসর ঘটিয়াছে। অধিকন্তু যে সময়ে অসভ্য জাতীয় লোকের সহিত সভ্যজাতীয় লোকের সাক্ষাৎ হয় সেই সময় হইতেই অসভ্যজাতির অবস্থা পূর্ব্বমত থাকে না সুতরাং ইতিহাস বা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা উপরোক্ত দুই মতের কোন এক মতের পোষকতা করা সুকঠিন। পরন্তু বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যে যে স্থানে কোন অনিবার্য্য প্রতিবন্ধক নাই সেই সেই স্থানে মনুষ্যের বুদ্ধি ও কার্য্য কুশলতা উত্তরোত্তর পরিপক্কতালাভ করিতেছে। ঐতিহাসিক কালের প্রথমে যদিও গ্রীক, রোমক ও হিন্দু জাতীয়েরা অনেক বিষয়ে প্রাধান্যলাভ করিয়া ছিল কিন্তু অধুনাতন ইউরোপীয়দিগের সহিত তাহাদের তুলনা হইতে পারে না। যদি মনুষ্যজাতির ক্রমশঃ মানসিক উন্নতি স্বীকার করা যায় তবে ইহাও স্বীকার্য্য হইতে পারে যে আদিম মনুষ্য ঐতিহাসিক কালের মনুষ্যাপেক্ষা বুদ্ধি ও মানসিক বলে অনেকাংশে হীনকল্প ছিল। অকাট্য প্রমাণের দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে আদিমাবস্থার মনুষ্যজাতি সমূহ নিঃসহায় ও আত্মরক্ষা জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিল। তখন পৃথিবীতে এক প্রকার পশ্বাদির রাজত্ব ছিল। তখন আহারান্বেষণ ও আত্মরক্ষার জন্য মনুষ্যের যত সময় অতিবাহিত হইত। যে মানসিক বলে মনুষ্য সকল জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই মনের উন্নতির্‌ জন্য তাহার কিছুমাত্র সাবকাশ ছিল না।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মনুষ্যের আদিমাবস্থার কোন লিখিত পুরাবৃত্ত নাই। কিন্তু পুরাকালিক মনুষ্যের যে সকল চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তদ্দ্বারা তাহাদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। বর্ত্তমান শতাব্দীতে অনেক ভূতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতেরা সেই তমসাবৃতকালের অনেক বিষয় আলোকে আনিয়াছেন। অতি পূর্ব্বকালে মানবজাতি বাটীনির্ম্মাণকৌশল জানিত না। আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না থাকায় গিরিগুহায় বাস করিত; ক্রমে পর্ব্বতাবৃত স্থান সকল অধিকৃত করিয়াছিল ও সুবিধা মত বিল ও হ্রদে দ্বীপ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিত। এই সকল গিরিগুহা প্রভৃতি আদিম বাসস্থানে ও তাৎকালিক সমাধি মন্দির সমূহে ব্যবহারোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র ও তৈজসাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সকল ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির দ্বারা আদিম মনুষ্যের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক বিষয় স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ডারউইন, হক্‌স্‌লি প্রভৃতি কয়েকজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের মতে মনুষ্য বানর জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এ সিদ্ধান্ত কতদূর যুক্তিমূলক তাহা স্থির করা সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু

মনুষ্যের আদিম অবস্থা সম্বন্ধে যতদূর অনুসন্ধান হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইহাই উপলব্ধ হয় যে মনুষ্য ও বানর স্বতন্ত্র-জাতি। মনুষ্য বানর হইতে উৎপন্ন হয় নাই, অথবা বানর মনুষ্যের সন্ততি নহে। ঐতিহাসিক কালে বা তৎ পূর্ব্বে বানরের অবস্থা যে কখন উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারিবেন না। বানর চিরকালই শাখামৃগ আছে। তাহার হস্ত পদাদির গঠন স্বতন্ত্র। বানর কখনই অগ্নির ব্যবহার জানে না ও শিখিতেও পারে না, বানর কখনই রন্ধন পদ্ধতি শিখিতে পারিবে না ও এপর্য্যন্ত আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারিল না। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে মনুষ্যের উন্নতির ইয়ত্তা নাই। প্রথমে মনুষ্য হীনবল নিঃসহায় কেবল আত্মরক্ষায় ও আত্মপোষণে সকল সময় অতিবাহিত করিত। অতি আয়াসে ও বহুকষ্টে দিন২ বন্য পশুর অপক্ক মাংসে উদর পূরিত করিত, সময় বিশেষে মনুষ্য মাংস বা শৃগাল ও ইন্দুরের মাংস তাহার অভক্ষ্য ছিল না। ক্রমে অগ্নির আবিষ্ক্রিয়া হইল, তখন দগ্ধ মাংস ভোজন, প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্র ও তৈজসাদির গঠন ও ব্যবহার ও পশ্বাদি পালন আরম্ভ হইল। তৎপরে মিশ্র ধাতুর ব্যবহার ও কৃষি কার্য্যের আরম্ভ, শেষে লৌহের আবিষ্ক্রিয়া ও কৃষি কার্য্যের উন্নতি। গুহাবাসী মনুষ্য পর্য্যায় ক্রমে শিকারী, পশুপালক, কৃষিজীবী হইয়া শেষে বাহ্যিক সমস্ত বিষয়ে নিরুদ্বেগ হইয়া জ্ঞানোপার্জ্জনে সক্ষম হইয়াছে। মনুষ্য প্রথমে হীনবল ও নিঃসহায় ছিল, এক্ষণে মনুষ্য পৃথিবীর অধিপতি। জ্ঞানবলে মনুষ্যের অবস্থার আরও যে কত উন্নতি হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

ইউরোপখণ্ডে গিরিগুহা প্রভৃতি পূর্ব্বকালিক মনুষ্যের বাসস্থানে ও সমাধিমন্দিরে যে সকল অস্ত্র শস্ত্র ও তৈজসাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, যে আদিম মনুষ্যের পুরাবৃত্ত দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, প্রথম প্রস্তর কাল, দ্বিতীয় ধাতু কাল। ইউরোপ সম্বন্ধে এই দুই কালের কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া প্রস্তাব উপসংহার করা যাইতেছে।

১ম প্রস্তর কাল—এই কালে কোন ধাতুর আবিষ্ক্রিয়া হয় নাই। মনুষ্য ধাতুর ব্যবহার জানিত না। এই কালের যে সকল অস্ত্র ও তৈজসাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা সমুদায় প্রস্তর নির্ম্মিত। কোন২ অস্ত্র পশ্বাদির অস্থি বা শৃঙ্গে নির্ম্মিত। এই কাল তিন ভাগে বিভক্ত, প্রথম কালে ম্যামথ অর্থাৎ কেশর যুক্ত হস্তী ও গুহাস্থিত ভল্লুক, ও অন্যান্য প্রকাণ্ড২ জীব সকল বর্ত্তমান ছিল। এই সকল জন্তু এক্ষণে পৃথিবী হইতে একেকালে অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু এককালে তাহারাই ইউরোপের অনেক দেশের অধিকারী ছিল। মনুষ্য তাহাদের ভয়ে সশঙ্কিত থাকিত ও অতি কষ্টে সামান্য

প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্রের দ্বারা আত্মরক্ষা করিত এই সময় কেবল গিরিগুহাই মনুষ্যের বাসস্থান ছিল। দ্বিতীয় কালে কেশরযুক্ত হস্তী প্রভৃতি বড়২ পশুর চিহ্ন আর লক্ষিত হয় না। কিন্তু সমস্ত ইউরোপ তখনও হিমপ্রধান দেশ ছিল। বেনডিচর প্রভৃতি যে সকল পশু এক্ষণে হিম প্রধান দেশে আশ্রয় পাইয়াছে, এই সময়ে তাহারা ইউরোপের প্রায় সকল দেশে বিচরণ করিত। এই কালে মনুষ্য পূর্ব্বাপেক্ষা নির্ভয় হইয়া ছিল। গিরিগুহা ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতের আবৃত স্থানে অথবা হ্রদ মধ্যে দ্বীপ নির্ম্মাণ করতঃ তথায় কাষ্ঠ ও চর্ম্ম নির্ম্মিত কুটীর প্রস্তুত করিয়া বাস-করিত। এই কালের অস্ত্র ও তৈজসাদি প্রস্তর ও বেনডিচরের শৃঙ্গ নির্ম্মিত দেখা যায়। এই কালে শিকারোপযোগী অনেক অস্ত্র দেখা যায়, বোধ হয় এই সময়ে মনুষ্য শিকারে বিশেষ পটু ছিল। তৃতীয় পোষিত পশুর কাল। এই কালে গো অশ্ব কুক্কুর প্রভৃতি অনেক পশু মনুষ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। প্রাত্যহিক আহার বিষয়ে মনুষ্যের পূর্ব্বমত অনিশ্চিত ছিল না কিন্তু পশুপালনের সুবিধা জন্য সময়ে২ বাস পরিবর্ত্তন করিতে হইত। এই সময়ের প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্রাদিতে অধিক পারিপাট্য ও বুদ্ধিকৌশল লক্ষিত হয়।

২য় ধাতুকাল। এই কাল দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমে মনুষ্য ধাতুর ব্যবহার শিখিয়াই লৌহ প্রস্তুতের পদ্ধতি শিখিতে পারে নাই। Bronze বা পিত্তল প্রস্তুত করা অতি সহজ কিন্তু খনিজাত দ্রব্য হইতে লৌহ প্রস্তুত প্রক্রিয়া সহজ নহে। ধাতুর আবিষ্ক্রিয়া হইলে পর প্রথমতঃ কেবল পিত্তল নির্ম্মিত অস্ত্র ও তৈজসাদির ব্যবহার দেখা যায়। এই কালের বাসস্থানে লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্রাদি পাওয়া যায় না; এই কালে কৃষিকার্য্যের আরম্ভ হইয়া থাকিবে কারণ কেবল কৃষিকার্য্যোপযোগী পিত্তলের দ্রব্যাদি এই সময়েই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কালে মনুষ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছিল এমত বোধ হয় কিন্তু পিত্তলের দ্রব্যাদিব্যবহারজনিত অনেক কার্য্যের অসুবিধাও ঘটিত। শেষে লৌহের আবিষ্ক্রিয়া হয়। কি প্রকারে যে এই অমূল্য ধাতু প্রথমে মনুষ্যের পরিচিত হইয়াছে তাহা স্থির করা কঠিন। বোধ হয় অভাব অনুভূত হইলেই মনুষ্য বুদ্ধি স্বয়ং অভাব পূরণ করে। লৌহের ব্যবহার আরম্ভ হওনাবধি মনুষ্যের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উন্নতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই কালের পরেই ঐতিহাসিক কালের আরম্ভ। মনুষ্য জাতি লৌহের নিকট যে কত প্রকার ঋণী আছে তাহা বলা যায় না। বোধ হয় লৌহের আবিষ্ক্রিয়া না হইলে ইউরোপীয় সভ্যতা মিসর, মেক্সিকো ও পেরুদেশের আদিম সভ্যতার সহিত অদ্যাবধি সমপদস্থ থাকিত।

কুঞ্জবনে কমলিনী।

১

না আইল কালাচাঁদ, যায় যে যামিনী;
কুঞ্জবনে কমলিনী হইল মলিনী;
দেখা দিল সুখতারা, না উদিল সুখতারা,
কেন নাহি কান্তিহারা হইবে কামিনী?

২

স্মরশর জর জর ক্লান্ত কলেবর;
কম্পমান অনুক্ষণ হিয়া থর থর;
আশানাশে হীনবল, তনুতরী টলমল;
আঁখি করে ছল ছল বিপদে বিস্তর।

৩

কতক্ষণে মনকথা অতি ধীরে ধীরে
কহিলা কাতরে রামা, সম্বোধি সখীরে।
কেনা জানে সিন্ধুবারী, হৃদয়ে ধরিতে নারি,
বর্ষাগমে ফেলে বারি উছলিয়া তীরে?

(প্রভাতের তারা)

১

সখিলো
বিফলে রজনী যায় প্রাণকান্ত এল না।
এ মনের ঘোরতর প্রেমজ্বালা গেল না।
ওই দেখ সুখতারা, দ্বিবাদূতী দিব্যাকারা,
আমারে করিতে সারা, বিকশিত বদনা;
নিশার আঁধার যাবে, আমারে আঁধারে পাবে,
সহে না সজনি আর এ বিষম যাতনা।

২

সখিলো
অচিরে উদয়াচলে হৈম উষা হাসিবে,
আমার সকল আশা একেবারে নাশিবে।
হেরি তার মন্দ হাসি, যেনরে জলদরাশি,
শরীরে প্রবেশি আসি, সুখশশী গ্রাসিবে।
দেবতা হইয়া কেন, তাহার স্বভাব হেন?
উচ্চ কি নীচের দুখে রঙ্গরসে ভাসিবে?

৩

সখিলো
কেন আজি রসরাজ আসিবারে ভুলিল?
মিছা অঙ্গীকার করি এদাসীরে ছলিল?
বল, সই, বল, বল, দেহে আর নাহি বল,
বিকল হিয়াব কল, একি ভাব ধরিল?
অথবা কি দেখি দোষ, শ্যাম করিয়াছে রোষ?
অভাগিনী সে চরণে কিসে দোষী হইল?

৪

সখিলো
শুনিব না আর কি লো সে মধুর বচন?
দেখিবনা আর কি সে প্রেমোৎফুল্ল লোচন?
আর কিসে মুখে হাসি, মেঘে সৌদামিনীরাশি
সকাশে বিকাশি আসি, রঞ্জিবেনা জীবন?
আর কি প্রণয়োল্লাসে, বসিয়া আমার পাশে,
তুষিতে আমারে নাথ কবিবে না যতন?

৫

সখিলো
সে অঙ্গ—পরশে পুনঃ বহিবে কি শরীরে
সুধাময় সুখানিল নিন্দি মন্দ সমীরে?
পাইয়া নূতন বল, হৃদয় জলধিজল
উথলিয়া টল টল করিবে কি অচিরে?
লোমাবলী কলেবরে, শিহরি কি প্রেমভরে,
মনের আনন্দ পুনঃ প্রকাশিবে বাহিরে?

৬

সখিলো
ওই দেখ জলধর বোষাবেশে আসিয়া
স্বর্ণময়ী সুখতারা ফেলিল লো গ্রাসিয়া।
আমার অন্তরাকাশে, যেসুখের তারা হাসে,
সেও লো বিরহগ্রাসে মৃতপ্রায় বিষিয়া।
পাশি সেন বাঞ্ছা করে, বিস্মৃতির সরোবরে,
যাই সেন একেবারে অন্ধকারে মিশিয়া।

৭

সখিলো
সরিল জলদদল: বাহিরিল দেখ না
প্রভাতের প্রিয়তারা প্রফুল্লিত-বদনা।
ঘটিবে কি এ কপালে, বিচ্ছেদ-বারিদজালে
ছেদিতে পারিব কালে, বল, সই, বল না?
দুর্ব্বল অবশ তনু, প্রতিক্ষণে হয় তনু;
কোথা পাব নব বল পূরিতে এ বাসনা?

(অস্তাচলগামী চন্দ্র)

১

ওই দেখ দাঁড়াইয়া আকাশের পাশে
যামিনী বিলাসী;
পাণ্ডুবর্ণ কলেবর, কাঁপিতেছে থর থর,
কপোল নয়নজলে যাইতেছে ভাসি;
ছাড়িতে প্রাণের প্রিয়া, ব্যাকুল প্রণয়িহিয়া;
প্রেমবিনা এ সংসার অন্ধকার রাশি;
কেনরে গোকুল চাঁদ ভুলিল আমারে?
বিষের জলনে জলি হব কারাগারে।

২

বিরহ রাহুর ভয়ে শশীর এদশা
গগন মণ্ডলে;
দেবতার বুদ্ধি হত, মানুষের সহে কত,
দুর্ব্বল মানব কুল সকলেই বলে;
অবলা মনুজে নারী; যন্ত্রণা সহিতে নারি;
জীবন জ্বলিছে যেন বাড়ব অনলে;
বল স্বজনিলো বল বাঁচিব কেমনে?
অথবা মরণ ভাল শ্যামের বিহনে।

৩

প্রেমের কমল, হায়, মানস সরসে
ফুটিবে কি আর?
হৃদয় গগনরবি, সংসাররঞ্জন-ছবি,
ঊষার সহিত দেখা দিবে কি আবার?
লোকে মোরে কমলিনী, বলেকেন নিতম্বিনি?
আমারে ঘেরিয়া আছে চির অন্ধকার।
এ নিশার অবসান হবে কিলো সই?
আর কার কাছে মোর মনকথা কই।

৪

কেন সই তোর আঁখি করে ছল ছল
বল না আমারে?
কি ভাবি হৃদয়ে তোর, উথলে যন্ত্রণাঘোর?
কিসে তোর ফুল্লমুখ গ্রাসিল আঁধারে?
বুঝিলাম মোর দুখ, হরিয়াছে তোর সুখ,
সুখ সুখ, দুখ দুখ, চৌদিকে বিস্তারে।
যেখানে বসন্ত যায়, ফুটে ফুলকুল;
যথায় শীতের গতি, সৌন্দর্য্য নির্ম্মূল।

৫

স্বজনিলো সরোবরে দেখনা কাঁপিছে
ভয়ে কুমুদিনী,
নয়ন মুদিত প্রায়, যেন অবসন্ন কায়,
নাথ যায়, বলি হায়, এমন মলিনী।
না আইল মোর নাথ, কেবল বিরহ সাথ
যাপিতে হইল মম বিষম যামিনী।
নিশা তো হইল গত, বিরহ না যায়।
কেন হরি নিদারুণ হইলে আমায়?

৬

বলিতে আমারে তুমি কত ভালবাস,
বৃন্দাবন ধন।
কত প্রেমকথা কয়ে, আমায় হৃদয়ে লয়ে,
করিতে পুলক কায়ে সাদরে চুম্বন।
একেবারে স্বপ্নবৎ, হইল কি সে তাবৎ?
অবলা ছলিতে তুমি পার কি কখন?
অথবা কপালগুণে—আমি অভাগিনী—
অমৃত হইল বিষ, লো প্রিয় ভগিনি।

(কোকিল)

১

ওই শুন, স্বজনিলো, সুললিত স্বরে
কে যেন গাইছে গীত, বিহরি অম্বরে;
রাগের তরঙ্গ উঠে, যথা পূতধারা ছুটে
বিষ্ণু পাদপদ্ম ফুটে, যবে মোক্ষতরে
বাঁধিতে আশার সেতু, পাপবিনাশের হেতু,
উড়াতে ধর্ম্মের কেতু, এ বিশ্ব ভিতরে,
বিশ্বরূপ নিরঞ্জন, সৃজিলা সহর্ষমন
জ্যোতির্ম্ময়ী নীরময়ী গঙ্গায় সত্বরে।

২

সঙ্গীত গাইয়া যদি ভ্রমিছ গগনে
দয়াময় দেব কেহ, নিবেদি চরণে;—
কহ এ দাসীর কথা, নীলকান্তমণি যথা,
শুনিলে অবশ্য ব্যথা হবে তাঁর মনে।
না পাইয়া কালাচাঁদে, বৃকভানু সুতা কাঁদে,
পড়িয়া বিষম ফাঁদে বিরহ দহনে;
অবসন্ন কলেবর, কাঁপিতেছে নিরন্তর,
ব্যাকুল বিকল প্রাণ নিকুঞ্জ কাননে।

৩

যে যন্ত্রণা জ্বলিতেছে হৃদয়ে আমার,
নিবাইব কি প্রকারে? এ যে অনিবার।
শরীরে চন্দন দানে, বোধ হয় অগ্নি হানে;
সলিল মৃণাল স্থানে নাহি প্রতীকার।
পদ্মপত্রে পদ্মদলে, দ্বিগুণ এ দেহ জ্বলে;
চন্দ্র যেন হলাহলে বর্ষে বরিষার;
মলয় পবন ছায়া, হইয়াছে উষ্ণ কায়া;—
হায় বিধি ঘটাইলে কি ঘোর বিকার!

৪

শুন পুনঃ, সহচরি, কে আবার গায়?
এ বুঝি বসন্তসখা অমৃত ছড়ায়।
মোর দুখে পিকবর, হইয়া কি সকাতর,
এরূপ বিলাপ কর, বল না আমায়;
দেখিয়া আমার মুখ, তোমার কি নাহি সুখ,
মলিন কি তব মুখ হইয়াছে হায়?
যে যাহারে ভাল বাসে, তার দুখে দুখে ভাসে,
প্রণয়ের এই রীতি সতত ধরায়।

৫

ভাল বাস মোরে তুমি জানি হে কোকিল,
বরষিতে তুমি হেথা সুস্বর সলিল,
যখন শ্যামের সনে, বসি সুখে একাসনে,
প্রণয়ের আলাপনে আতিল পাতিল,
বকিতাম কত কত, মত্তভাবে অবিরত,
বর্ষাবারি স্রোতমত উল্লাসে আবিল,
আনন্দ তরঙ্গ সঙ্গে, উৎসাহে অন্তর রঙ্গে,
লোমাঞ্চিত কলেবর পুলকে শিথিল।

৬

হে পিক, তোমার ডাকে আসেন তপন,
প্রফুল্লিত করিবারে নলিনীবদন;
শুনিলে তোমার গীত, বসন্ত হইয়া প্রীত,
বিতরেন চারিভিতে সৌন্দর্য্য শোভন;
মরে রাই কমলিনী, অনুক্ষণ বিষাদিনী,
অশ্রুত্যাগ বিলাপিনী করে ঘন ঘন;

তাহার বসন্ত রবি, বিশ্ববিমোহন ছবি,
আনি দেহ মধুবঁধু, মোর নিবেদন।

(উষা)

১

সৌরভ মণ্ডিত হেম কলেবর;
কপালে উজল তারকা জ্বলে;
কোকিল কূজন ভাষ মনোহর;
বিকচ কুসুম মালিকা গলে,
হাসিতে হাসিতে পূবর গগনে
আইল আলোক বসনা উষা।
বিফলা রজনী সখার বিহনে,
কুক্ষণে করিনু এবেশ ভূষা।

২

পেয়ে প্রিয়কর বিকশিত হাসি,
বদন বসন খুলিয়া ধীরে,
অলি গুন গুন মধুর সম্ভাষি,
নাচয়ে নলিনী সরসীনীরে।
হাসিতে হাসিতে পূবর গগনে
আইল আলোক বসনা উষা।
বিফলা রজনী সখার বিহনে,
কুক্ষণে করিনু এ বেশ ভূষা।

৩

রসে টস টস বসন্ত বল্লরী
গাঁথিয়া পরিয়া ফুলের হার,
প্রিয় চূতরু জড়াইয়া ধরি
বিস্তারি সুখের সুগন্ধ ভার।
হাসিতে হাসিতে পূবর গগনে
আইল আলোকবসনা উষা।
বিফলা রজনী সখার বিহনে,
কুক্ষণে করিনু এ বেশভূষা।

৪

রসাল মঞ্জরী, বকুলের ফুল,
ফুটিয়া কেমন রয়েছে গাছে;
চুম্বিয়া আনন্দে দেখ অলিকুল
গুঞ্জরিয়া গান করিছে কাছে।
হাসিতে হাসিতে পূরব গগনে
আইল আলোক বসনা উষা।
বিফলা রজনী সখার বিহনে,
কুক্ষণে করিনু এ বেশভূষা।

৫

বিগত বিরহ নিশা অবসানে
চক্রবাক্ যুগ সহর্ষমুখে,
চাহে পরস্পর পরস্পর পানে,
মগন নূতন প্রণয় সুখে।
হাসিতে হাসিতে পূবর গগনে
আইল আলোক বসনা উষা।
বিফলা রজনী সখার বিহনে,
কুক্ষণে করিনু এ বেশ ভূষা।

৬

মিলনে সকলে পুলকে বিহ্বল,
নাহিক মিলন এ পোড়া ভালে;
আমায় কেবল, ঘেরে অবিরল,
বিষম বিরহ তিমির জালে।
হাসিতে হাসিতে পূবর গগনে
আইল আলোক বসনা উষা।
বিফলা রজনী সখার বিহনে,
কুক্ষণে করিনু এ বেশ ভূষা।

(মলয়ানিল)

১

বন পরিমল বাসিত শীতল
মলয় অনিল মধুরভাষী,

"দিনেশ আইল," বলিতে ধাইল;
বন্দে ফুলকুল আনন্দে হাসি।
কি কাজ সমীর এ কুঞ্জে আসি?
বাহু কি বহিতে বিষাদরাশি?

২

অবলা বালায়, হেথায় জ্বালায়—
বিকট কবল বিরহানল;
হিয়া উথলিয়া, নয়নান্ত দিয়া
বহে অবিরল শোকাশ্রুজল;
নাথের বিহনে হারাই বল
কেমনে অধীনী সহে সকল?

৩

আশ্রয় বিহনে ভবের ভবনে,
রমণী বাঁচিয়া রহে কেমনে?
লতিকা ললিতা, তরুর আশ্রিতা;
চপলা নিয়ত জড়িত ঘনে;
নলিনী জীবিত সরজীবনে;
কৌমুদীর স্থান চন্দ্র বদনে।

৪

জানি এসকল, দলে অবিরল,
রমণী মণ্ডলে পুরুষ দল;
ফিরে ফুল কুল, জিনি অলিকুল,
জিনিয়া অনিল, সদা চপল;
নূতন অমিয়ে চাহে কেবল।
না গণি আশ্রিত জন কুশল।

৫

নির্ম্মম এমন, তথাপি আনন
সতত সুধার সুধারা ঢালে;
কথায় ভুলায়, অবলা বালায়,
কেমন মোহন মায়ার জালে।
হৃদে হলাহল অমিয় গালে;
জুটিয়াছে ভাল নারীর ভালে।

রজনী।

চতুর্থ খণ্ড।

(পুনর্ব্বার শচীন্দ্র বক্তা।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঐশ্বর্য্য হারাইয়া, কিছুদিন পরে আমি পীড়িত হইলাম। ঐশ্বর্য্য হইতে দারিদ্র্যে পতনে, মনে কোন বিকার উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া, কি কিজন্য এই পীড়ার উৎপত্তি তাহা আমি বলিবার কোন চেষ্টা পাইব না। কেবল পীড়ার লক্ষণ বলিব।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে রৌদ্রের তাপ অপনীত হইলে পর, প্রাসাদের উপর বসিয়া অধ্যয়ন করিতে ছিলাম। সমস্ত দিবস অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। জগতের দুরূহ গূঢ় তত্ত্ব সকলের আলোচনা করিতেছিলাম। কিছুরই মর্ম্ম বুঝিতে পারি না, কিন্তু কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি পায় না। যত পড়ি তত পড়িতে সাধ করে। শেষ

শ্রান্তি বোধ হইল। পুস্তক বন্ধ করিয়া হস্তে লইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলাম। একটু নিদ্রা আসিল—অথচ নিদ্রা নহে। সে মোহ, নিদ্রার ন্যায় সুখকর বা তৃপ্তিজনক নহে। ক্লান্ত হস্ত হইতে পুস্তক খসিয়া পড়িল। চক্ষু চাহিয়া আছি—বাহ্য বস্তু সকলই দেখিতে পাইতেছি কিন্তু কি দেখিতেছি তাহা বলিতে পারি না। অকস্মাৎ সেইখানে, প্রভাতবীচিবিক্ষেপচপলা কল কল নাদিনী নদী বিস্তৃতা দেখিলাম—যেন তথা ঊষার উজ্জ্বল বর্ণে পূর্ব্বদিক্ প্রভাসিত হইতেছে—দেখি সেই গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, সৈকতমূলে, রজনী! রজনী জলে নামিতেছে। ধীরে,ধীরে, ধীরে! অন্ধ! অথচ কুঞ্চিতভ্রূ, বিকলা, অথচ স্থিরা; সেই প্রভাতশান্তিশীতলা ভাগীরথীর ন্যায় গম্ভীরা, ধীরা, সেই ভাগিরথীর ন্যায় অন্তরে দুর্জ্জয় বেগশালিনী! ধীরে, ধীরে, ধীরে,—জলে নামিতেছে। দেখিলাম,কি সুন্দর! রজনী কি সুন্দরী! বৃক্ষ হইতে নবমুঞ্জরীর সুগন্ধের ন্যায়, দূরশ্রুত সঙ্গীতের শেষভাগের ন্যায়, রজনী জলে, ধীরে—ধীরে—ধীরে. নামিতেছে! ধীরে রজনি! ধীরে! আমি দেখি তোমায়। তখন অনাদর করিয়া দেখি নাই, এখন একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই। ধীরে রজনি, ধীরে! তুমি সর্ব্বত্যাগিনী, সন্ন্যাসিনী,—সুবদনী, সুহাসিনী—

আমার মূর্চ্ছা হইল। মূর্চ্ছার লক্ষণ সকল আমি অবগত নহি। যাহা পশ্চাৎ শুনিয়াছি, তাহা বলিয়া কোন ফল নাই। আমি যখন পুনর্ব্বার চেতন প্রাপ্ত হইলাম, তখন রাত্রিকাল—আমার নিকট অনেক লোক। কিন্তু আমি সে সকল কিছুই দেখিলাম না। আমি দেখিলাম—কেবল সেই মৃদুনাদিনী গঙ্গা, আর সেই মৃদুগামিনী রজনী। ধীরে, ধীরে, ধীরে জলে নামিতেছে। চক্ষু মুদিলাম, তবু দেখিলাম সেই গঙ্গা, আর সেই রজনী। আবার চাহিলাম, আবার দেখিলাম সেই গঙ্গা আর সেই রজনী! দিগন্তরে চাহিলাম—আবার সেই রজনী, ধীরে, ধীরে, ধীরে, জলে নামিতেছে। ঊর্দ্ধে চাহিলাম—ঊর্দ্ধেও আকাশবিহারিণী গঙ্গা ধীরে, ধীরে, ধীরে বহিতেছে; আর আকাশবিহারিণী রজনী ধীরে, ধীরে, ধীরে নামিতেছে। অন্যদিকে মন ফিরাইলাম: তথাপি সেই গঙ্গা আর সেই রজনী। আমি নিরস্ত হইলাম। চিকিৎসকেরা আমার চিকিৎসা করিতে লাগিল।

অনেকদিন ধরিয়া আমার চিকিৎসা হইতে লাগিল, কিন্তু আমার নয়নাগ্র হইতে রজনী রূপ তিলেক জন্য অন্তর্হিত হইল না। আমি জানি না আমার কি রোগ বলিয়া—চিকিৎসকেরা কি চিকিৎসা করিতেছিল। আমার নয়নাগ্রে যে রূপ অহরহঃ নাচিতেছিল, তাহার কথা কাহাকেও বলি নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ওহে ধীরে, রজনি ধীরে! ধীরে, ধীরে, আমার এই হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ কর! এত দ্রুতগামিনী কেন? তুমি অন্ধ, পথ চেন না, ধীরে, রজনি ধীরে! ক্ষুদ্র এই পুরী, আঁধার, আঁধার, আঁধার! চিরান্ধকার! দীপশলাকার ন্যায় ইহাতে প্রবেশ করিয়া আলো কর;—দীপশলাকার ন্যায় আপনি পুড়িবে, কিন্তু এ আঁধার পুরী আলো করিবে।

ওহে ধীরে, রজনি ধীরে! এ পুরী আলো কর, কিন্তু দাহ কর কেন? কে জানে যে শীতল প্রস্তরেও দাহ করিবে—তোমায় ত পাষাণগঠিতা, পাষাণময়ী জানিতাম, কে জানে যে পাষাণেও দাহ করিবে? অথবা কে না জানে পাষাণ ও লৌহের সংঘর্ষণেই অগ্ন্যুৎপাত হয়। তোমার প্রস্তরধবল, প্রস্তরস্নিগ্ধদর্শন, প্রস্তরগঠিতবৎ মূর্ত্তি যতই দেখি, ততই দেখিতে ইচ্ছা হয়। অনুদিন, পলকে পলকে, দেখিয়াও মনে হয় দেখিলাম কই? আবার দেখি। আবার দেখি, কিন্তু দেখিয়া ত সাধ মিটিল না।

পীড়িতাবস্থায়, আমি প্রায় কাহারও সঙ্গে কথা কহিতাম না। কেহ কথা কহিতে আসিলে ভাল লাগিত না। রজনীর কথা মুখে আনিতাম না—কিন্তু প্রলাপকালীন কি বলিতাম না বলিতাম, তাহা স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না। প্রলাপোক্তি সচরাচরই ঘটিত।

শয্যা প্রায় ত্যাগ করিতাম না। শুইয়া শুইয়া কত কি দেখিতাম তাহা বলিতে পারি না। কখন দেখিতাম, সমরক্ষেত্রে যবন নিপাত হইতেছে—রক্তে নদী বহিতেছে; কখন দেখিতাম, সুবর্ণ প্রান্তরে হীরক বৃক্ষে স্তবকে স্তবকে নক্ষত্র ফুটিয়া আছে। কখন দেখিতাম, আকাশমার্গে, অষ্টশশিসমন্বিত শনৈশ্চর মহাগ্রহ চতুশ্চন্দ্রবাহী বৃহস্পতির উপর মহাবেগে পতিত হইল—গ্রহ উপগ্রহ সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল—আঘাতোৎপন্ন বহ্নিতে সে সকল জ্বলিয়া উঠিয়া, দহ্যমানাবস্থাতে মহাবেগে বিশ্বমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইতেছে। কখন দেখিতাম, এই জগৎ, জ্যোতির্ম্ময় কান্তরূপধর দেবযোনির মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ; তাহারা অবিরত অম্বর পথ প্রভাসিত করিয়া বিচরণ করিতেছে; তাহাদিগের অঙ্গের সৌরভে আমার নাসারন্ধ্র পরিপূর্ণ হইতেছে। কিন্তু যাহাই দেখি না—সকলের মধ্যস্থলে—রজনীর সেই প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাইতাম। হায়! রজনি! পাথরে এত আগুন!

ধীরে, রজনি, ধীরে! ধীরে, ধীরে, রজনি, ঐ অন্ধ নয়ন উন্মীলিত কর। দেখ, আমায় দেখ, আমি তোমায় দেখি! ঐ দেখিতেছি—তোমার নয়নপদ্ম ক্রমে প্রস্ফুটিত হইতেছে—ক্রমে, ক্রমে, ক্রমে, ধীরে; ধীরে, ধীরে, ধীরে, নয়নরাজীব

ফুটিতেছে! এ সংসারে কাহার না নয়ন আছে? গো, মেষ, কুক্কুর, মার্জ্জার, ইহাদিগেরও নয়ন আছে—তোমার নাই? নাই, নাই, তবে আমারও নাই! আমিও আর চক্ষু চাহিব না।

শিবজি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মুসলমান রাজত্বকালে আর্য্যকুলে যে সকল বীরগণ জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে, বোধ হয়, কেহই শিবজির ন্যায় ক্ষমতাশালী ছিলেন না। তিনি কেবল ভারতবিজয়ী মোগল পতাকা দলিত করিয়া রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, এমত নহে; তিনি স্বজাতিকে এরূপ সজীব ও সতেজ করিয়া গিয়াছিলেন, যে তাঁহার মৃত্যুর অত্যল্পকাল পরেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতাপে হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত স্থল কম্পান্বিত হইয়াছিল। ঈদৃশ মহাত্মার জীবনচরিত যত পর্য্যালোচনা করা যায়, ততই উপকার লাভের সম্ভাবনা। এজন্য তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

বাল্যকালে আমরা বৃদ্ধলোকের মুখে যে বর্গিদিগের দৌরাত্ম্য বৃত্তান্ত শুনিতাম, তাহাদিগের অপর নাম মহারাষ্ট্রীয় বা মারহাট্টা। মহারাষ্ট্র প্রদেশের পূর্ব্বসীমা ববদা নদী; উত্তর সীমা সাতপুর গিরিমালা; পশ্চিম সীমা সাগর; দক্ষিণ সীমা গোবানগর হইতে মাণিক দুর্গ পর্য্যন্ত একটী কল্পিত বক্ররেখা। এই ভূভাগে সহ্যাদ্রি বা ঘাট পর্ব্বত সমুদ্রসলিল হইতে দুই তিন সহস্র হস্ত ঊর্দ্ধে শৃঙ্গ নিকর তুলিয়া সিন্ধুকূলকে পঞ্চদশ হইতে পঞ্চবিংশতি ক্রোশ দূরে রাখিয়া দক্ষিণোত্তর ধাবিত হইয়াছে। শৈল-পদতল হইতে অর্ণব তীর পর্য্যন্ত ভূমিখণ্ডের নাম কঙ্কণ; তথায় নিবিড় কানন, উচ্চপর্ব্বত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, দুরারোহ গিরিসঙ্কট, প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়। পার্ব্বতীয় বিভাগে অনেক গুলি স্বাভাবিক দুর্গ আছে; অল্লায়াসেই সেগুলিকে দুর্ভেদ্য করা যায়।

সাধারণতঃ মহারাষ্ট্র শৈলময়; এবং তাহার জল বায়ু এত উত্তম যে বোধ হয় ভারতবর্ষের আর কুত্রাপি এমন নাই। এই প্রদেশে নর্ম্মদা, তাপ্তী, গোদাবরী, ভীমা এবং কৃষ্ণা প্রবাহিতা রহিয়াছে; এই সকল নদীর উভয় কূলস্থ ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা; এবং তথায় অনেক শস্য জন্মিয়া থাকে। গোদাবরী ভীমা এবং তৎশাখা নীরা ও মান, ইহাদিগের তট-

বর্ত্তী স্থান সমূহে ভাল ভাল অশ্ব জন্মে; তাহারা উৎপত্তিস্থল ভেদে গঙ্গথরী,* ভীমথরী, নীরথরী, এবং মানদেশীনামে খ্যাত।

অপরাপর পার্ব্বতীয় দেশবাসীদিগের ন্যায় মহারাষ্ট্রীয়েরা পরিশ্রমী এবং অধ্যবসায়ী। যদিও তাহারা রাজপুতদিগের ন্যায় সুশ্রী ও দীর্ঘদেহ নহে, তথাপি সাহসে ও শক্তিতে তাহারা রাজপুতগণাপেক্ষা কোন ক্রমে ন্যূন নহে; এবং বুদ্ধি ও চতুরতায় বোধ হয় ভারতবর্ষীয় কোন জাতিই তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। মহারাষ্ট্রীয় মহিলারা অন্যান্য স্থানীয় হিন্দু কামিনী কুলের ন্যায় অন্তঃপুরনিরুদ্ধা নহেন। তাঁহাদিগের অনেক দূর স্বাধীনতা আছে; এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে অশ্বারোহণ করিতে জানেন।

মহারাষ্ট্রের প্রাচীন বিবরণ অপ্রাপ্য। কিন্তু বিবেচনা হয় যে এককালে তাহার বিলক্ষণ ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি ছিল। খৃষ্টাব্দের সার্দ্ধদ্বিশত বর্ষ পূর্ব্বে এই প্রদেশের টগর নগরে মিসরের বণিক্‌গণ বাণিজ্য করিতে আসিতেন; খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতেও গ্রীকেরা তথায় বাণিজ্যদ্রব্য সংগ্রহার্থে আগমন করিতেন। এই প্রদেশের গোদাবরীতটস্থ প্রতিষ্ঠান পুরের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া পরাক্রান্ত শালিবাহন শকাব্দা প্রচলিত করেন; এবং এই প্রদেশেই জগদ্বিখ্যাত কৈলাশধাম সমস্থিত ইলোরাস্থ ক্ষোদিত গিরি গহ্বরমালা দ্বিতল ত্রিতল গৃহ, বিচিত্র গঠিত স্তম্ভ ও দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য শিল্পকার্য্য সমূহে পরিশোভিত হইয়া কোন অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন প্রতাপশালী জাতির পূর্ব্বাধিপত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যখন খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন্থসং এদেশে আগমন করেন, তখন মহারাষ্টীয়দিগের এত বল বিক্রম, যে দিগ্বিজয়ী রাজচক্রবর্ত্তী কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন সমুদায় আর্য্যাবর্ত্ত করতলস্থ করিয়া মহারাষ্ট্র হইতে পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন করেন। মুসলমান্‌দিগের দক্ষিণাপথ প্রবেশকালে* এই প্রদেশস্থ দেবগিরিতে যাদববংশীয় রাজা রামদেব রাজত্ব করিতেছিলেন;‡ প্রচণ্ড আলা উদ্দীন তাঁহার রাজ্যধ্বংস করিলে পর অনেককাল পর্য্যন্ত মাহারাষ্ট্রের আর কোন জীবিত লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই।

শকাব্দা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে মুসলমানদিগের লিখিত ইতিবৃত্তে আবার মহারাষ্ট্রীয়দিগের উল্লেখ দেখা যায়। মহারাষ্ট্র তৎকালে দক্ষিণাপথস্থ বিজয়পুরের আদিলসাহী ও আহম্মদ নগরের নিজামসাহী রাজ্যভুক্ত ছিল। উক্ত

* মহারাষ্ট্রীয়েরা গোদাবরীকে গঙ্গা বলিয়া থাকে।

* খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।

‡ রাজা রামচন্দ্রের রাজত্বকালে বৈয়াকরণ বোপদেব প্রাদুর্ভূত হন। তিনি ভাগবতপুরাণ লেখক বলিয়া প্রবাদ আছে। হেমাদ্রি রাজা রামচন্দ্রের মন্ত্রী ছিলেন।

রাজ্যদ্বয়ের চক্রবর্ত্তীদিগের মধ্যে সর্ব্বদা বিরোধ ঘটিত, এবং পার্শ্ববর্ত্তী নৃপালবর্গের সহিতও তাঁহাদিগের অনেক সময়ে যুদ্ধ উপস্থিত হইত। এজন্য মারহাট্টা প্রজাগণের মধ্য হইতে তাঁহাদিগের অনেক সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। সৈন্যাধ্যক্ষদলের কেহ কেহ সেনাপরিপোষক জায়গির ও সম্মানসূচক পদবী পাইয়াছিলেন। এইরূপে মহারাষ্ট্রীয়গণ দিন দিন এত উন্নতিলাভ করেন যে শকাব্দা পঞ্চদশ শতাব্দী সমাপ্ত না হইতে হইতে বিজয়পুরপতি হিসাবপত্রে পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে মারহাট্টা ভাষা ব্যবহারের আদেশ প্রদান করেন এবং দলিলদস্তাবেজ উভয় ভাষায় লিখিতে বলেন। শকাব্দা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে আহম্মদনগরে দুইটি, এবং বিজয়পুরে সাতটি, মহারাষ্ট্রীয়বংশের বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। নিরন্তর সংগ্রাম ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়া মারহাট্টারা সাহসী ও সমরকুশল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহারা স্বদেশের গৌরব বুঝিত না; এবং বিধর্ম্মী যবনদিগের মহিমাবৃদ্ধি নিমিত্ত সমধর্ম্মা ও আত্মীয়দিগের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। একতা, স্বজাতিপ্রিয়তা এবং স্বধর্ম্মানুরাগ মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া যে প্রতাপশালী ঐন্দ্রজালিক তাহাদিগকে দাক্ষিণাত্য হিন্দুকুলের অলঙ্কার করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা আরম্ভ করা যাইতেছে।

পুনানগরীর প্রায় পঁচিশ ক্রোশ উত্তরে শিবনারী দুর্গে ১৫৪৯ শকের বৈশাখ মাসে শিবজি জন্মগ্রহণ করেন। যে বৎসরের উদয়ে শিবজির জন্ম, তাহার অন্তকালে সাজাহানের দিল্লীসিংহাসন সমারোহণ। রত্ননির্ম্মিত ময়ূর সিংহাসন, বিচিত্ররচিত তাজমহল, নগরসদৃশ বৃহদায়তন সুদৃশ্য পটমণ্ডপ প্রভৃতি মোগল সমৃদ্ধির চরমোন্নতিসূচক চিহ্ন নিচয়ের সূচনা না হইতেই, মোগল সাম্রাজ্য বিলয়কারীর আবির্ভাব হইল। মুসলমানেরা বলিতে পারেন, পুষ্পটি ভাল করিয়া প্রস্ফুটিত না হইতে হইতেই, মধ্যে কীট জন্মিল। হিন্দুরা বলিবেন, কাহারও অতিবৃদ্ধি হইতে দিবার পূর্ব্বে বিধাতা তাহার পতন বিধান করেন।

পঙ্কজাত পদ্মসদৃশ শিবজি নীচকুলোদ্ভূত ছিলেন না। তিনি বহ্নি হইতে প্রজ্বালিত বহ্নির ন্যায় শূরবংশসম্ভূত। তাঁহার পিতা সাহজি ভোঁসলা বীরপুরুষ বলিয়া পরিচিত। সাহজি আহম্মদ নগরের সৈন্যাধ্যক্ষতা কার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষতা প্রকাশ পূর্ব্বক বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করেন, এবং পতনোন্মুখ নিজামসাহী রাজ্যরক্ষার্থ বারম্বার মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তদুচ্ছেদ নিবারণে অসমর্থ হইলে বিজয়পুর রাজসংসারে কর্ম্মগ্রহণানন্তর কর্ণাটে বিজয়পতাকা উড্ডীন করত একটি হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের সূত্রপাত করেন।

শিবজির মাতা জিজিবাই* লক্ষজি যাদবরাও দেশমুখের † কন্যা। লক্ষজি আহম্মদনগরাধিপতির নিকটে দশ সহস্র অশ্বারোহী প্রতিপালনের নিমিত্ত বিস্তীর্ণ জায়গির পাইয়াছিলেন। কথিত আছে যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ দেবগিরির রাজাসনে আসীন ছিলেন। শকাব্দা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে যাদবেরা মহারাষ্ট্রীয় দিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ও পরাক্রান্ত বলিয়া গণ্য হইত।

শিবজির পিতামহ মল্লজি ১৪৯৯ শকে লক্ষজির অনুগ্রহে নিজামসাহী রাজ্যের একটি সামান্য অশ্বারোহীদলের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন। ক্রমে তাঁহার খ্যাতি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৫১৬ শকে তাঁহার একটি পুত্রসন্তান জন্মিল। আহম্মদনগরস্থ সাহ সরিফ নামক পীরের প্রার্থনায় পুত্রকামনা সিদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া, সন্তানের নাম সাহজি রাখিলেন। সাহজির বয়স পাঁচ বৎসর হইলে একদা মল্লজি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দোলযাত্রার উপলক্ষে যাদবরাও দেশমুখের আলয়ে গমন করিলেন। লক্ষজি সাহজির সৌন্দর্য্য ও প্রফুল্লতা সন্দর্শনে প্রীত হইয়া তাহাকে আহ্লাদ সহকারে নিকটে ডাকিলেন এবং আপনার তিন চারিবর্ষবয়স্কা নন্দিনী জিজিবাইর পার্শ্বে বসাইলেন। বালক বালিকা আমোদে খেলা করিতে লাগিল, দেখিয়া সানন্দ হৃদয়ে যাদবরাও পরিহাসচ্ছলে দুহিতাকে বলিলেন "দেখ তোমার কেমন বর আসিয়াছে;" এবং সভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "ইহাদিগের বিবাহ হইলে কেমন সাজে।" এই সময়ে ভোঁসলা কুমার এবং যাদব কুমারী পরস্পরের প্রতি আবির নিক্ষেপ করাতে, সভায় হাসি উঠিল। এই হাস্যরতঙ্গ মধ্যে মল্লজি উঠিয়া বলিলেন, "সকলের যেন স্মরণ থাকে, লক্ষজি আমার পুত্রকে কন্যাদান করিতে অঙ্গীকার-বদ্ধ হইলেন।" ইহাতে কেহ কেহ সম্মতি প্রদান করিল; কিন্তু যাদবরাও বিস্মিত এবং অবাক্ হইয়া রহিলেন। পরদিন লক্ষজি মল্লজিকে নিমন্ত্রণ করিলে, মল্লজি বলিয়া পাঠাইলেন, "যাদবরাও আমার পুত্রকে জামাতা বলিয়া গ্রহণ না করিলে আমি তাঁহার নিমন্ত্রণে যাইব না।"

যাদবরাও শুনিয়া সম্মত হইলেন না, বরং ক্রুদ্ধ হইলেন। কেন না হইবেন? তাঁহার প্রসাদেই মল্লজির সাংসারিক উন্নতি। আর যে বংশে মল্লজি জন্মিয়াছিলেন, সে বংশ কি দেবগিরির রাজকুলের তুল্য? উত্তরকালীন মহারাষ্ট্রীয় পুরাবৃত্তলেখকগণ যে ভোঁসলা বংশকে চিতোরের "হিন্দুসূর্য্য" কুল সমুদ্ভূত বলিয়াছেন, যে কোন কারণেই হউক যাদবরাও সে বংশের ঈদৃশ মহত্ব জানিতেন না।

লক্ষজির অসম্মতি দেখিয়াও মল্লজি

* মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বাই সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক দিগের উপাধি।

† দেশমুখ শব্দে দেশপ্রধান, দেশাধিকারী বা জমীদার বুঝায়।

সংকল্প করিলেন যে, যাদবদুহিতার সহিত অবশ্য অবশ্যই পুত্রের বিবাহ দিবেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার অনেক অর্থ সমাগম হইল। কিরূপে হইল, কে জানে? মহারাষ্ট্রীয় কিংবদন্তী এই যে ভগবতী ভবানীদেবী স্বয়ং মল্লজিকে দেখা দিয়া ধনরাশির সন্ধানপ্রদান করেন এবং বলেন "তোমার বংশে এক জন শম্ভু সদৃশ গুণবিশিষ্ট নরপাল জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাষ্ট্রে সদ্বিচার সংস্থাপন করিবে; এবং যাহারা ব্রাহ্মণের হিংসা করে ও দেবতার মন্দির অপবিত্র করে, তাহাদিগকে দূর করিয়া দিবে। তাহার রাজ্যকাল হইতে নূতন সময় আরম্ভ হইবে, এবং তাহার উত্তরাধিকারিগণ সপ্তবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবে।"

সৎ কি অসৎ যে উপায়েই মল্লজি ধনসঞ্চয় করুন, তদ্দ্বারা তাঁহার বিশেষ উপকার হইল। তিনি, অনেক গুলি ঘোটক ক্রয় করিয়া, স্বীয় অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিলেন; এবং কূপখনন, পুষ্করিণী খনন, মন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতি লোকপ্রিয় পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। অর্থবলে কোথায় কি না হয়, বিশেষতঃ মোসাহেবপূর্ণ মুসলমান রাজসংসারে? আহম্মদ নগরের সুলতান সন্তুষ্ট হইয়া মল্লজিকে রাজা উপাধি দিলেন এবং পাঁচ হাজার সোয়ারের অধ্যক্ষ করিলেন। পরগণা পুনা এবং সোপা জায়গির রূপে মিলিল; শিবনারী ও চাকুন দুর্গ এবং তদধীনস্থ প্রদেশ সমস্ত হস্তগত হইল। যাদব রাওর আর উদ্বাহ সম্বন্ধে কি আপত্তি থাকিতে পারে? ১৫২৬ শকে (১৬০৪ খৃ) সুলতানের সমক্ষে মহা সমারোহে সাহজি এবং জিজি বাইর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল।

জিজি বাইর গর্ব্ভে সাহজির দুই পুত্র জন্মে; জ্যেষ্ঠ শাম্বজি, কনিষ্ঠ শিবজি। শাম্বজি শাহজির বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, বাল্যকাল হইতেই পিতার সঙ্গে থাকিতেন। ছোট ছেলের প্রতিই মায়ের আদর; শিবজি জননী সন্নিধানেই থাকিতেন।

যৎকালে শিবজি জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালে দিল্লির মোগল সম্রাটই আর্য্যাবর্ত্তের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। দক্ষিণাপথে আহম্মদ নগর, বিজয়পুর ও গোলকুণ্ড নামক তিনটী পাঠান রাজ্য ছিল। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আক্‌বর বাদসাহ আহম্মদ নগর আক্রমণ করিয়া বহু কষ্টে জয়লাভ করেন; কিন্তু মালিক অম্বর নামে মন্ত্রীর প্রতিভাবলে নিজাম সাহী রাজ্য পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল। শিবজি জন্মিবার পূর্ব্ব বৎসর মালিক অম্বরের মৃত্যু হয়; এবং প্রায় সেই সময়েই বিজয়পুরের বিখ্যাত সুলতান ইব্রাহিম আদিল সাহ বিচিত্র অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ দ্বারা মহাসমারোহে রাজ্য করিয়া কাল কবলে কবলিত হন। গোলকুণ্ডপতি পূর্ব্ব এবং দক্ষিণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য

সকল আপনার অধিকারভুক্ত করিতে নিযুক্ত ছিলেন।

শিবজির বয়স যখন দুই বৎসর মাত্র (১৬২৯ খৃ,) আহম্মদনগরপতি, খাঁ জাহান লোদি নামক বিদ্রোহী পাঠান সেনাপতির পক্ষাবলম্বন করিয়া, দিল্লীশ্বরের ক্রোধে পতিত হন। সুলতান মর্ত্তিজা আজিম সাহ মালিক অম্বরের পুত্র প্রধান মন্ত্রী ফতে খাঁর প্রতি বিরক্ত হইয়া, তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু মোগল দিগের সহিত যুদ্ধে বারম্বার পরাভূত হইয়া, কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া, তাহাকে মুক্ত করিলেন এবং মন্ত্রিত্বপদে পুনর্নিযুক্ত করিলেন। ফতে খাঁ ক্ষমতা পাইয়াই বৈর নির্য্যাতনের পথ দেখিতে লাগিল এবং সুযোগক্রমে সুলতান এবং প্রধান ওম্‌রা দিগকে বধ করিল। অনন্তর নিজাম সাহী বংশীয় একটি শিশুকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া দিল্লির অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইতে চেষ্টা করিল। ইতিমধ্যে বিজয় পুরাধিপতি আহম্মদ নগর ধ্বংসে আপনার বিপদ বুঝিয়া সংগ্রাম জন্য প্রস্তুত হইলেন; এবং ফতে খাঁ সেই ষড়যন্ত্রে মিলিত হইলে, মোগল সেনাপতি কুপিত হইয়া তদ্বাসস্থান দৌলতাবাদ সযত্নে অবরোধ পূর্ব্বক অধিকার করিলেন। ফতে খাঁ দিল্লিতে প্রেরিত, এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত রাজকুমার গোয়ালিয়র দুর্গে চিররুদ্ধ, হইল। সাহজি ইহার পরে প্রায় চারি বৎসরকাল নিজামসাহী রাজ্যের পতন নিবারণার্থে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রধান সহায় মহম্মদ আদিল সাহও মোগলদিগের প্রতাপে প্রপীড়িত হইলেন। তিনি বিজয় পুরের চারিদিকে দশ ক্রোশ মরুভূমি করিয়া বিপক্ষপক্ষের আক্রমণ হইতে আপনার রাজধানী রক্ষা করিলেন বটে; কিন্তু শত্রুদিগকে দেশ হইতে দূরীকৃত করিতে পারিলেন না। পর্য্যায়ক্রমে জয় পরাজয় ঘটিতে লাগিল; প্রজাদিগের দুঃখের সীমা পরিসীমা রহিল না। পরিশেষে ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে বিজয় পুরপতি মোগলদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধিদ্বারা সাহজি বিজয় পুরের রাজসংসারে কর্ম্মগ্রহণ করিবার অনুমতি পাইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন; বিজয়পুরাধিপতি আহম্মদ নগরের কিয়দংশ লইয়া সম্রাট্‌কে বৎসরে বিংশতি লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকার করিলেন; এবং নিজামসাহী রাজ্যের অবশিষ্টাংশ দিল্লিসাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

এইরূপে শিবজির বয়ঃক্রম দশ বৎসর হইতে না হইতেই, মোগল পাঠানের দ্বন্দ্বদ্বারা দক্ষিণাপথের একটী মুসলমান রাজ্য বিনষ্ট হইল। বিজয়পুরও এই যুদ্ধে এত হীনবল হইয়াছিল, যে দক্ষিণে রাজ্য বিস্তার করিয়া বলবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল।

এই সংগ্রামসময়ে শিবজি কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, ভাল করিয়া জানা

যায় না। সমরপ্রারম্ভে (১৬২৯ খৃ) সাহজি, লোদির সহিত বিবাদ করিয়া, দিল্লীশ্বরের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং তজ্জন্য সম্রাট সাজাহানের নিকট হইতে পুনরায় জায়গির সম্বন্ধে একখানি সনন্দ পত্র প্রাপ্ত হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মোগল সেনাপতিদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া পুরাতন প্রভু আহম্মদ নগর পতির দলে প্রত্যাগমন করেন। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি তুকাবাই নাম্নী একটী নবীনা কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন; তাহাতে তেজস্বিনী যাদবনন্দিনী জিজিবাই অভিমানিনী হইয়া শিশু শিবজিকে সঙ্গে করিয়া পিত্রালয়ে প্রস্থান করেন। তদবধি নূতন প্রেমের কুহক বশেই হউক, বা যুদ্ধের বিরামাভাব প্রযুক্তই হউক, সাত বৎসরকাল সাহজি, শিবজি এবং তজ্জননীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন বিজয়পুরে গমন করেন, জিজিবাই তাঁহার সঙ্গে যান এবং তথায় কিছুদিন থাকিয়া শিবজির বিবাহ দেন। অনন্তর সাহজি পুনা জায়গিরের তত্ত্বাবধারক দাদাজি কর্ণদেবসন্নিধানে শিবজি এবং তাঁহার মাতাকে রক্ষণাবেক্ষণার্থে প্রেরণ করিয়া সুলতানের আদেশে কর্ণাট যাত্রা করেন।

দাদাজি কর্ণদেব অত্যন্ত প্রভুভক্ত ও সদ্বিবেচক ছিলেন। তিনি শিবজিকে যোদ্ধার উপযোগী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শিবজি, লিখিতে পড়িতে, এমন কি আপনার নাম সাক্ষর করিতেও শিখিলেন না; কিন্তু ব্যায়াম, অশ্বারোহণ, ভল্লপ্রহার, তীরনিক্ষেপ, অসিসঞ্চালন, প্রভৃতি কার্য্যে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। শিক্ষকের যত্নে হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মিল। তিনি কথকদিগের মুখে রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের অমৃতময় কথা শুনিতে ভাল বাসিতেন। কবিবর্ণিত প্রাচীন বীরগণের গুণগান শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় সরোবর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। তিনি কল্পনাপথে তাঁহাদিগের দেবতুল্য মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন, তাঁহাদিগের আশ্চর্য্য কার্য্য পরম্পরা নিরীক্ষণ করিতেন, এবং তাঁহাদিগের মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে কৃতসংকল্প হইতেন। তাঁহার হিন্দুধর্ম্মানুরক্তচিত্তে যবনগণ পুরাকালের পরাক্রান্ত দৈত্য রাক্ষসবৎ প্রতীয়মান হইত, এবং কবে তাহাদিগের দারুণ দৌরাত্ম্য হইতে পুণ্যময় ভারতভূমিকে মুক্ত করিতে পারিবেন, এই চিন্তায় তাঁহার অন্তঃকরণ নিরন্তর আলোড়িত হইত। যে দেশে রাম লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ বলরাম, ভীমার্জ্জুন, ভীষ্ম দ্রোণ, প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, যে দেশে স্বর্গাবতীর্ণা ভাগীরথী প্রবাহিতা, যে দেশ দেবগণের একমাত্র প্রিয়লীলাস্থল, সে দেশের ছিন্ন মুকুট মুসলমান পদতলে দলিত দেখিয়া তাঁহার তেজস্বী মনে ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত। তিনি আশ্বাসপ্রদায়িনী আশার বিশ্ববিমোহন

বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ভাবিতেন, ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত যবনগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবেন, স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিবেন, এবং "হরহর ভবানী" ধ্বনিতে হিমাদ্রি হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মনদ পর্য্যন্ত, প্রতিধ্বনিত করিবেন।

শিবজি যেস্থানে বাস করিতেছিলেন, সেস্থানও তৎসদৃশ উন্নতমনা বীরধর্ম্মা ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ অনুকূল। পুনানগরী সমতল ক্ষেত্র এবং পার্ব্বতীয় প্রদেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত। অনতিদূরেই সহ্যাদ্রি শৈলের শিখরমালা দুই তিন সহস্র হস্ত ঊর্দ্ধে শিরোত্তোলন করিয়াছে। গিরিশ্রেণী অধিকাংশ স্থলে চির-হরিত-তরুপুঞ্জ পরিশোভিত; কেবল মধ্যে মধ্যে অভ্রভেদী, বন্ধুর, বিশাল, জীবোদ্ভিদপরিশূন্য শৃঙ্গনিকর বিরাজিত। বর্ষাকালে যখন পর্ব্বতপার্শ্বে তরঙ্গের ছটা ছুটিতে থাকে; বৃষ্টির ধারা নাচিতে নাচিতে, খেলিতে খেলিতে, পড়িতে থাকে; বজ্র গর্জ্জিতে, ঝটিকা ঝমকিতে, চপলা চমকিতে থাকে; জলদরাশি কর্তৃক ভগ্ন ও প্রতিবিম্বিত সৌরকিরণলহরীতে সহস্র সহস্র মুহূর্ত্ত পরিবর্ত্তনশীল বর্ণে অচলকুল সাজিতে থাকে; তখন প্রকৃতির মনোহর অথচ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তির চিত্তে না ধর্ম্মজনিত গম্ভীর ভাবের উদয় হয়? আমরা যে সকল পদার্থে পরিবেষ্টিত থাকি, আমাদিগের অজ্ঞাতসারে তাহারা আমাদিগের মনোবৃত্তি সকলের উপর আধিপত্য করে। ঋষিগণের কানন, ঈশার পর্ব্বত, মহম্মদের গিরিগুহা, মহতী চিন্তার স্থল। কে বলিতে পারে, সহ্যাদ্রি শিবজির পক্ষে তদ্রূপ ছিল না?

সহ্যাদ্রির পথ সকল অতিশয় সংকীর্ণ ও দুরারোহ। স্থানে স্থানে উচ্চ শৃঙ্গ, তন্মধ্যে কোথায় বা উৎকৃষ্ট উৎস আছে; কোথায় বা বর্ষাকালীন জল ধরিয়া রাখিয়া সমুদয় বৎসর চলে। এই সকল শৃঙ্গ অল্প পরিশ্রমেই দুর্ভেদ্য দুর্গরূপে পরিণত হয়। বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত এ প্রদেশ আক্রমণ করা অতীব দুঃসাধ্য। তৎকালে এখানে বন জঙ্গল এত বাড়ে, সর্ব্বদা এত বৃষ্টি হয়, বহুসংখ্যক সামান্য সামান্য নদ নদী জল পূর্ণ হইয়া এরূপ দুস্তর হয়, এবং যে বায়ু বহিতে থাকে তাহা বিদেশীয়দিগের পক্ষে এত অস্বাস্থ্যকর, যে তখন ইহার ন্যায় দুরাক্রম্য দেশ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

এই পর্ব্বতের উপত্যকাগুলিকে মহারাষ্ট্রীয়েরা মাওল বলিত। মাওলী বা উপত্যকাবাসীরা দেখিতে কদর্য্যাকৃতি ও নির্ব্বোধ; কিন্তু তাহারা পরিশ্রমী, বিশ্বাসী, কার্য্যদক্ষ, সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয়। দাদাজি তাঁহাদিগের অনেককে জায়গিরের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত কর্ম্মচারীদিগের সহিত শিবজি গিরিভ্রমণে ও মৃগয়ায় যাইতেন। এইরূপ পর্য্যটন কালে তিনি শৌর্য্য ও মিষ্টভাষিতাগুণে মাওলীদিগের অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং ঘাট গিরি ও কঙ্কণের পথ,

গিরিশঙ্কট, দুর্গ প্রভৃতির অবস্থা বিলক্ষণ রূপে অবগত হইয়াছিলেন।

কিরূপে স্বাধীন হিন্দু রাজ্য সংস্থাপন করিবেন, কিরূপে আপনার সামান্য শক্তিতে এই মহতী ইচ্ছা ফলবতী করিবেন, চিন্তা করিতে করিতে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে শিবজির অন্তঃকরণে একটি নূতন ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন "কঙ্কণপ্রদেশে একটি বিলক্ষণ পরাক্রান্ত দস্যুদল আছে; আমি সেই দলে মিশিয়া তাহাদিগেব রাজা হইব; এবং যে শৌর্য্য তাহারা এক্ষণে সাধুলোকের অপকারার্থে পরিচালিত করিতেছে, সেই শৌর্য্য যবনবলবিনাশার্থে নিয়োজিত করাইব।" শিবজি-সদৃশ ব্যক্তির পক্ষে যে কল্পনা সেই কার্য্য। তিনি দস্যুদলে মিশিলেন। তিনি স্বাধীন রাজা হইবেন এরূপ ইচ্ছাও প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সময়ে সময়ে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত কঙ্কণপ্রদেশে থাকিতেন। দাদাজি তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া বিবেচনা করিলেন যে, শিবজি অসদনুষ্ঠানেই রত হইলেন; সুতরাং তাঁহাকে অন্যায় বর্ত্ম হইতে সুপথে আনিবার জন্য তাঁহার প্রতি অধিকতর যত্ন দেখাইতে লাগিলেন এবং জায়গির তত্ত্বাবধানেব অনেক ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিলেন। এই প্রকার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, পুনার নিকটবর্ত্তী ভদ্র মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত সর্ব্বদা তাঁহার সাক্ষাৎ হইত; এবং তাঁহার সদাচার ও সদালাপে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া যাইতেন।

সহ্যাদ্রি শৈলে বিজয়পুরাধিপতির অনেকগুলি দুর্গ ছিল। কোন কোন দুর্গে দুর্গাধ্যক্ষ থাকিত, এবং যুদ্ধাশঙ্কা উপস্থিত হইলে তথায় ভাল ভাল সৈন্যও প্রেরিত হইত। কিন্তু অস্বাস্থ্যকর বলিয়া অধিকাংশ গড়ে মুসলমান সেনা থাকিত না; এবং সেগুলি প্রায় জায়গিরদারদিগের অধীনেই ছিল। বিশেষতঃ দিল্লীশ্বরের সহিত ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি হইবার পরে, বিজয়পুরপতি কর্ণাটবিজয়ের অভিলাষে সেই প্রদেশেই উত্তমোত্তম যোদ্ধৃগণ পাঠাইয়াছিলেন; এবং ঘাটপর্ব্বতের দুর্গ সকল প্রথমে অল্লায়াসেই করস্থ হইয়াছিল বলিয়া তাহারা যে দুর্ভেদ্য ও বিশেষ প্রয়োজনীয়, ইহা বুঝিতে না পারিয়া তাহাদিগকে এক প্রকার অরক্ষিতাবস্থায় রাখিয়াছিলেন।

পুনার দশ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে নীরানদীর উৎপত্তিস্থল সন্নিকটে টর্ণা নামে একটি পার্ব্বতীয় দুরাক্রম্য দুর্গ ছিল। শিবজি দুর্গাধ্যক্ষের যোগে ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে উনবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সে দুর্গটি হস্তগত করিলেন; এবং বিজয়পুরে বলিয়া পাঠাইলেন যে সরকারের লাভ করিয়া দিবেন, এই উদ্দেশেই কেল্লাটি দখল করিয়াছেন, এবং ইহার প্রমাণ স্বরূপ তজ্জন্য তৎ প্রদেশস্থ দেশমুখাপেক্ষা অধিক রাজস্ব দিতে অঙ্গীকার করিলেন। টর্ণার নাম প্রচণ্ডগড় রাখিলেন, এবং

তাহাকে অধিকতর দুরাক্রম্য করিবার নিমিত্ত নূতন প্রাচীরনির্ম্মাণ ও পুরাতন প্রাকারাদি সংস্কার করাইতে লাগিলেন। দুর্গের মধ্যে একটি স্থান খনন করিতে করিতে সহসা স্বর্ণরাশি দৃষ্ট হইল। কাহার সঞ্চিত দ্রব্য কাহার ভোগে আইল! শিবজি এই ঘটনায় ভগবতী ভবানীর কৃপা দেখিলেন, এবং উৎসাহ সহকারে দুর্গসংস্কার সমাপন ও অস্ত্র শস্ত্র ক্রয় করিতে প্রযত্নশীল হইলেন। তদনন্তর টর্ণার দেড় ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে মর্ব্বুধ পর্ব্বতোপরি একটি দুর্গ নির্ম্মাণের উদ্যোগ করিলেন; এবং সমাপ্ত হইলে তাহার নাম রাজগড় হইল (১৬৪৭)।

রাজগড় নির্ম্মাণসম্বাদ বিজয়পুরে পৌছিলে, সুল্‌তান সাহজিকে ভয়প্রদর্শন করিয়া পত্র লিখিলেন। সাহজি তখন বিজয়পুরপতি-প্রদত্ত বাঙ্গালোর সন্নিহিত জায়গিরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি পুত্রের কার্য্যের ছন্দাংশ কিছুই জানেন না, সুল্‌তানকে এই মর্ম্মে উত্তর পাঠাইলেন; এবং শিবজি ও কর্ণদেবকে লিপি দ্বারা যৎপরোনাস্তি অনুযোগ করিলেন। মঙ্গলাকাংক্ষী দাদাজি শিবজিকে অনেক বুঝাইলেন; বলিলেন "বিজয়পুরে তোমার পিতার যেমন মান সম্ভ্রম, বিশ্বস্তভাবে সুলতানের চাকরী করিলে তুমি একজন বড় লোক হইবে। আর যেরূপ কার্য্যে তুমি প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহাতে পদে পদে শঙ্কা ও বিপদ্ সম্ভাবনা।" শিবজি মিষ্ট কথায় আপনার বশ্যতা জানাইলেন; কিন্তু বৃদ্ধ কর্ণদেব বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সংকল্প অণুমাত্রও পরিবর্ত্তিত হইল না। দাদাজি একে পীড়ায় ও জরায় জীর্ণ হইয়াছিলেন, এক্ষণে প্রভুবংশের বিপদাশঙ্কায় জর্জ্জরিত হইয়া আর অধিক দিন প্রাণধারণ করিতে সক্ষম হইলেন না। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি শিবজিকে নিকটে ডাকাইলেন; এবং সেই অন্তিম শয্যায় পূর্ব্ব প্রদর্শিতভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন "বাছা, তুমি স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন চেষ্টায় বিরত হইও না; গো, ব্রাহ্মণ ও কৃষকদিগকে রক্ষা করিও; দেবমন্দির অপবিত্র করিতে দিও না; এবং লক্ষ্মী তোমায় যে পথে লইয়া যান সেই পথেই অগ্রসর হইও।" অনন্তর শিবজির হস্তে আপনার পরিবারবর্গকে সমর্পণ করিয়া কর্ণদেব গতাসু হইলেন।

সেই বৃদ্ধ শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষাগুরু ও প্রতিপালকের পরলোক গমনকালীন বাক্যগুলি স্বধর্ম্মানুরক্ত স্বাধীনতাপ্রিয় তেজস্বী যুবার অন্তঃকরণে দৈববাণীর ন্যায় অঙ্কিত রহিল। তিনি যে পথ অবলম্বন করিতেছিলেন, সে পথ তাঁহার এবং জায়গিরের কর্ম্মচারীদিগের চক্ষে পবিত্রভাব ধারণ করিল। শিবজির বাল্যকাল শেষ হইল; তাঁহার জীবনের কার্য্য স্থিরীকৃত হইল।

এ সময়ে শিবজির বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর। তিনি ঈদৃশ অল্প বয়সেই দুইটী দুর্গের অধিকারী হইয়া রাজ্যসংস্থাপন

করিবার সূত্রপাত করিয়াছেন। একবার সমালোচনা করিয়া দেখা যাউক তাঁহার ভাবী উন্নতির কি কি উপকরণ ছিল।

প্রথমেই দৃষ্ট হইতেছে যে, শিবজির পিতা বীরপুরুষ, এবং মাতাও শূরকন্যা। জনকজননীর গুণ যে সন্তানে বর্ত্তে, তাহা অনেকেই জানেন। যেমন বাহ্য আকারে পিতামাতার সহিত সন্তানের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, যেমন পীড়ার বীজ পিতামাতার শরীর হইতে সন্তানে যায়, তেমনই পিতামাতার ন্যায় মনোবৃত্তি সন্তানগণ প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পর্য্যালোচক মাত্রেই অবগত আছেন যে, কোন কোন বংশে কোন কোন ক্ষমতা বা প্রবৃত্তির অধিক প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। রোমের ইতিহাস যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি কি ক্লডিয়াস বংশের দাম্ভিকতা এবং ফেবিয়াস বংশের ধীরতা ভুলিতে পারেন? যে বংশে পাইসিসট্রেটস্, সোলন ও পেরিক্লিস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গ্রীসদেশীয় আল্‌কমিওনীয় বংশ যে বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত কে না বলিবে? যে কুল হইতে ফিলিপ্‌, আলেকজণ্ডর, পিরহাস ও টলেমিদিগের উৎপত্তি, সে কুলের যে একটী নির্দ্দিষ্ট প্রতিভা ছিল, কে অস্বীকার করিবে? কার্থেজের হামিল্কার ও হানিবল্‌ বিভূষিত বার্কা বংশ, ইংলণ্ডের বিজয়ী উইলিয়মের বংশ, প্রুসিয়ার বিখ্যাত ফ্রেড্রিকের বংশ, রুসিয়ার মহাত্মা পিটরের বংশ, ভারতবর্ষের ঔরংজেব পর্য্যন্ত বাবর বংশ প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে শৌর্য্য কোন কোন কুলের অনুগামী। ভোঁসলা এবং যাদব দুই শূর বংশ সংযোগে শিবজির জন্ম; সুতরাং তিনি শৌর্য্যপ্রভা লইয়াই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শিবজি যে কেবল স্বভাবতঃ বীরত্ব-প্রতিভাবিশিষ্ট ছিলেন, এমত নহে; বাল্যকালে তিনি একপ্রকার বীরত্ব বায়ুতে আচ্ছন্ন ছিলেন। তাঁহার তিন হইতে দশবৎসর বয়স পর্য্যন্ত সাহজির আহম্মদ নগর রক্ষার্থে যুদ্ধ। এই সময়ে শিবজি কতবার শত্রুহস্তে পতিত হইতে হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। পরে যখন নিজামসাহী রাজ্য উচ্ছিন্ন হইল, মোগল সম্রাটের সহিত আদিলসাহী সুলতানের সন্ধি হইল, তখন বিজয়পুর পতির সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইয়া সাহজি কর্ণাট সমরে জয়পতাকা তুলিলেন। তদবধি অহরহঃ পিতার শৌর্য্যকথা ও বিজয়বার্ত্তা কর্ণদেব প্রভৃতির মুখে শিবজি শুনিতে পাইতেন; এবং জনকের যোগ্য পুত্র হইবেন, এরূপ বাঞ্ছা তাঁহার হৃদয়ে কেননা বলবতী হইবে? বিশেষতঃ রামায়ণ মহাভারত ভাগবত প্রভৃতি যেসকল ধর্ম্মগ্রন্থের উপাখ্যানসমূহ তিনি শ্রবণ করিতে ভাল বাসিতেন, সে সমুদয়ও বীররসপরিপ্লুত। আর যে মাওলীরা তাঁহার চিরসঙ্গী, তাহারাও সাহসী ও সংগ্রামপ্রিয়। বীরবীর্য্যে যাঁহার জন্ম, বীরকন্যার স্তন্যে যাঁহার বালদেহ বর্দ্ধিত,

বীররূপী পিতার বিজয়সংবাদ দিন দিন যাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইত, বীর যাঁহার উপাস্যদেবতা এবং বীর যাঁহার সহচর, সেই শিবজি কেননা বীরধর্ম্মা হইবেন?

এই বীরের সম্মুখে দক্ষিণাপথের বিচ্ছিন্ন মুসলমান রাজ্যগুলি পড়িল। তাঁহার শৈশবেই আহম্মদনগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বিজয়পুর মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া দুর্ব্বল হইয়াছিল, এবং দক্ষিণে রাজ্যবিস্তারে ব্যস্ত থাকিয়া শিবজির প্রথম উদ্যম বিফল করিতে পারিল না। কিন্তু রাজ্যের প্রথম সোপানগুলি সংস্থাপন কালেই বিশেষ প্রতিবন্ধকতা করা যায়; ক্ষমতা একবার বদ্ধমূল হইলে তাহার উপরে হস্তক্ষেপ করা অতীব দুস্কর। অধিকন্তু বিজয়পুরের প্রধান অবলম্বন মহারাষ্ট্রীয়গণ। তাহারা শিবজির স্বজাতি ও সমধর্ম্মা; সুতরাং ইহাও একটী সুলতানের দৌর্ব্বল্য ও শিবজির বলের কারণ। হিন্দুধর্ম্মের পতাকা উড্ডীন করিলেই শিবজির অনুচরবর্গের উৎসাহবৃদ্ধি এবং বিপক্ষপক্ষের শক্তি-হানি হইল।

এস্থলে আর একটী কথা বলাও অসঙ্গত হইতেছে না। দিল্লীশ্বরের দক্ষিণাপথ আক্রমণ শিবজির উন্নতির একটী প্রধান পরোক্ষ হেতু। এই আক্রমণে মোগলদিগের এবং দক্ষিণাত্য ভূপালবর্গের বিস্তর বলক্ষয় হয়; মুসলমানগণের গৃহবিচ্ছেদ বাড়ে এবং ধর্ম্মবন্ধন অনেকদূর শিথিল হইয়া যায়; নিজামসাহী রাজ্য একেবারে বিনষ্ট হইয়া যবন প্রভাবের বিলক্ষণ হ্রাস উপস্থিত হয়, এবং মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুদিগের প্রতিপত্তি, সমরকুশলতা ও স্বাবলম্বন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। যদি দক্ষিণে আহম্মদনগর, বিজয়পুর ও গোলকুণ্ড সম্মিলিত থাকিত, এবং যদি দিল্লিপতি তাহাদিগকে চূর্ণ করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাদিগের সহিত মিত্রতা সংস্থাপন পূর্ব্বক আর্য্যাবর্ত্তে স্বীয় ক্ষমতা বিশেষরূপে বদ্ধমূল করিতে যত্ন করিতেন, তাহা হইলে মুসলমানদিগের প্রতাপ এত প্রবল হইত যে কোনক্রমে কেহই তাহাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া জয়লাভ করিতে পারিত না। ভগ্নালয়ে বৃষ্টিধারাও প্রবেশ করে; বিরোধবিভক্ত অনৈক্য জীর্ণ মুসলমান সাম্রাজ্য কেনন৷ নবীন হিন্দুশক্তি প্রভাবে বিদারণ হইবে?

শিবজি জীবনের প্রথমাঙ্ক লিখিত হইল। যেরূপ বঙ্গভূমে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যেরূপ অবস্থায় তাঁহার নিত্যনবস্ফূর্ত্তিশালী প্রতিভার প্রথম বিকাশ হইয়াছিল, যেরূপ জ্ঞান ও কার্য্য মণ্ডলে তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল, একপ্রকার বর্ণিত হইল। সময়ান্তরে এই প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ লিখিবার বাঞ্ছা রহিল।

শৈশব সহচরী।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভ্রম।

"সোনার বরণ হলো কাল
গুণ দেখে মোর মন হারাল।"

কোথা হইতে কে এই গীত গাইতেছিল, তাহা কেবল বৃহৎ তিন্তিড়ী বৃক্ষের উপর বসিয়া একটি চিল জানিতে পারিতেছিল। বৃক্ষের সন্নিকটে উচ্চ স্তূপোপরি একটি শিবের মন্দির; তাহার পশ্চাদ্ভাগ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। তাহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠ সকল ভগ্ন, এবং তাহার চারিদিকে অতি নিবিড় বন। সেস্থল মনুষ্য সমাগম চিহ্নমাত্র রহিত। নিকটে অতি বৃহৎ প্রান্তর—বৃক্ষহীন, জনহীন, পশুহীন, শোভাহীন প্রান্তর। তন্মধ্যদিয়া গ্রাম্য পথ। কদাচিৎ সে পথে মনুষ্য যাইত, যদি কেহ যাইত তবে ভগ্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে মনুষ্য থাকিলে তাহাকে তাহার দেখিবার সম্ভাবনা ছিল না।

সন্ধ্যাকাল; মেঘাচ্ছন্ন, অল্প২ বৃষ্টি হইতেছিল। সেই ভগ্ন প্রকোষ্ঠ মধ্যে লুকাইয়া দশ বার জন মনুষ্য। তাহারই মধ্যে একজন মৃদু২ গান করিতেছিল, তিন্তিড়ী বৃক্ষারূঢ় পক্ষিভিন্ন আর কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছিল না। অকস্মাৎ গান বন্ধ হইল, গায়ক কহিল।

"কে আসিতেছে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল "যে আসিবার সে আসিতেছে।"

ইতিমধ্যে খর্ব্বাকৃতি অথচ বলিষ্ঠ এবং মল্লবেশী এক ব্যক্তি প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রকোষ্ঠস্থ ব্যক্তিরা তাহাকে ব্যগ্রতাসহকারে জিজ্ঞাসা করিল "কি সম্বাদ আনিলে?"

আগন্তুক কহিল "ঠিক সন্ধ্যার সময় বাবু পাল্কীতে উঠিবে।"

"এই পথদিয়া যাবে?"

"হাঁ, এই পথ দিযা।"

"সঙ্গে কয় জন বেহারা?"

"বার জন।"

"আর কোন লোক সঙ্গে আস্‌বে?"

"তা বুঝলুম না।"

"বেহারাদের কেমন দেখ্‌লে?"

"দিব্বি কালো কোলো নন্দঘোষের মত, কাহারও কাহারও বোকা ছাগলের মত দাড়ি আছে।"

"আচ্ছা তামাসা ছাড়, বলি আমরা দশ জনে বার জন বেহারার মোহাড়া নিতে পার্‌বো?"

"পার্‌বে, আমাদের চীৎকার শুন্‌লেই তাহারা মোহ যাবে।"

ইত্যবসরে দূরনিঃসৃত অস্ফুট ভ্রমর গুন গুনবৎ শিবিকাবাহকদের কোলাহল নৈশগগন ভেদ করিয়া শ্রুতিগোচর হইল। রজনী ঘনান্ধকার, নিকটের মানুষ লক্ষ্য

হয় না সুতরাং শিবিকা কোন্ পথ দিয়া আসিতেছিল তাহা দৃষ্ট হইল না। সমস্ত দিবস বৃষ্টি হওয়াতে প্রান্তরখণ্ড অতি দুর্গম হইয়াছিল, তজ্জন্য বাহকদিগের পা মধ্যে২ পিছলিয়া যাইতেছিল। বাহকেরা দেবতাকে, মাঠকে, এবং কখন২ শিবিকারোহীকে গালি আরম্ভ করিল; কিন্তু ইহাদিগকে গালি দিয়া তৃপ্তিলাভ না হওয়াতে, কেহ২ সমভিব্যাহারী বাহকের সহিত কলহ আরম্ভ করিল। এই প্রকার বিবাদ করিতে২ বনমধ্যে ভগ্নমন্দির নিকটবর্ত্তী হইল, কিন্তু এইখানে শুষ্ক স্থান পাইয়া কাঁধ বদলাইতে শিবিকা থামাইল। একজন বাহকের পা আর এক জনের পায়ের উপর পড়াতে দুইজনে বচসা হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে অলক্ষ্যে বেহারাদিগের উপরে শ্রাবণের ধারাবৎ যষ্টির আঘাত হইতে লাগিল। বাহকেরা প্রথমতঃ চমকিত ও বিহ্বল হইল। পরে আপনাদিগের দলের মধ্যে যষ্টিহস্ত অপরিচিত লোক দেখিয়া শিবিকা রাখিয়া পলায়ন করিল, এবং তাহাদিগের দেখাদেখি শিবিকারক্ষক দুইজন হিন্দুস্থানি মল্ল বেশীও পলায়ন করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দেবমন্দির।

দস্যুরা এক্ষণে নির্জ্জন দেখিয়া শিবিকার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দেখিল, উহার মধ্যে রজনী বাবুর পরিবর্ত্তে একজন অবগুণ্ঠনবতী রমণী বসিয়াছে। তদ্দৃষ্টে দস্যুবর্গ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও বিস্ময়বিহ্বল হইয়া রহিল। তৎপরে শিবিকারোহী রমণী বলিল—

"তোমরা যদি টাকার জন্য আমার পাল্কী ধরিয়া থাক তবে ভুল করিয়াছ—আমার সঙ্গে টাকা নাই, গাত্রেও অলঙ্কার নাই, আমি বিধবা। কিন্তু যদি আমাকে সুবর্ণপুরে আমার বাটী পর্যান্ত পৌঁছিয়া দাও তা হলে আমি পুরস্কার দিব ও এই ঘটনা গোপন করিব—"

একজন দস্যু কহিল, "তোমার বাড়ী সুবর্ণপুরে?"

রমণী। হাঁ।

দস্যু। তোমাদের কোন্ বাড়ী, রজনীবাবুদের বাড়ী?

রম। হাঁ সেই বাড়ীই বটে।

দস্যুরা চুপি২ পরামর্শ করিতে লাগিল। একজন কহিল, "ওরে গোবরা, আমাদের বড় ভুল হয়েছে, রজনী বাবুর সুবর্ণপুর হইতে আসিবার কথা, কিন্তু এ পাল্কী ঠিক উল্টাদিক্ দিয়া এসেছে, এ পাল্কী সুবর্ণপুরে যাবে; সুবর্ণপুর থেকে ত আস্‌ছিল না। আমাদের ঠিকে ভুল হয়েছে।"

একজন প্রবীণ দস্যু কহিল, "যা হবার হয়েছে এখন কি পরামর্শ।"

গোবরা কহিল, "মেয়ে মানুষটা বোধ হয় রজনী বাবুর বন, উহাকে রজনীর বদলে আমাদের বাবুর নিকট নিয়ে গেলে বোধ হয় কাজ হবে, কি বলিস্ রে?"

দস্যুগণ সকলেই এই পরামর্শ সঙ্গত বিবেচনা করিয়া চারিজন দস্যু দ্বারা শিবিকাসহিত রমণীকে লইয়া চলিল। রাত্রি একপ্রহর হইয়াছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়াতে অতিশয় অন্ধকার হইয়াছে। দস্যুরা প্রান্তর পার হইয়া গ্রাম্যপথ ত্যাগ করিয়া অন্য এক পথ ধরিল; দেখিয়া রমণী জিজ্ঞাসা করিল,

"তোমরা কোথায় যাইতেছ? এ ত সুবর্ণপুরের পথ নয়—"

দস্যুরা উত্তর করিল না দেখিয়া রমণী চিন্তিত হইলেন; কিন্তু তাহাদিগের অনুনয় বিনয় অথবা ভয়প্রদর্শন বৃথা বোধে আপনার অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর করিয়া মৌনাবলম্বনে রহিলেন। দস্যু বাহকগণ রমণীর এই প্রকার নির্ভীকতা দেখিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, "বাবুরা হলে এতক্ষণ কত কাঁদিত, কত আমাদের পায়ে পড়িত, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এ ছুঁড়ি একবার চেঁচালে না!" ক্রমে শিবিকার দুই পার্শ্ব গাঢ় অন্ধকারময় হইল। রমণী বুঝিল যে, শিবিকা কোন নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কিছুক্ষণ এই প্রকার অন্ধকারময় নিবিড় অরণ্য অতিবাহিত করিয়া এক স্থানে শিবিকা থামিল, এবং পরক্ষণেই একজন দস্যু কহিল

"বেরিয়া এসগো ঠাকুরুণ—"

রমণী শিবিকা হইতে অবরোহণ করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে এক প্রকাণ্ড মন্দির, চতুর্দ্দিকে নিবিড় অন্ধকার, এবং মধ্যে২ বিদ্যুৎ চমকিতেছে। তখন আদেশ মত একজন দস্যুর পশ্চাৎ২ ঐ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কুমুদিনী।

রমণী মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন গৈরিকবসনপরিহিত, শ্মশ্রুল মুখমণ্ডল, এক যুবা সম্মুখে পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি পূজা করিতেছেন। রমণী গাঢ় অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণের পর তাঁহার সমভিব্যাহারী দস্যু কহিল, "বাবু মহাশয়!" পূজক কিঞ্চিৎ বিলম্বে দস্যুদিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি, সফল হইয়াছে?"

দস্যু উত্তর না করিয়া হঠাৎ চমকিত নেত্রে রমণীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। তাহার কারণ এই যে পূজকের কণ্ঠস্বরে অবগুণ্ঠনবতী হঠাৎ অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন। পূজকও দস্যু যেদিকে চমকিতনেত্রে চাহিতেছিল, সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "এ কে, এ যে স্ত্রীলোক!"

দস্যু। আজ্ঞে, একটা ভ্রম হয়েছে, তাঁহাকে ধরিতে গিয়া একটা স্ত্রীলোককে ধরে ফেলেছি।

পূজক ক্ষণকাল অবগুণ্ঠনবতীকে আপাদ মস্তক অবলোকন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে?" কিন্তু স্ত্রীলোক

কোন উত্তর না করাতে পূজক পুনরপি কহিলেন,

"আপনি ভীতা হইবেন না। স্বচ্ছন্দে পরিচয় দিন কোন ভয় নাই। রমণী অবগুণ্ঠন হইতে অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কি কারণে দস্যুদ্বারা আমায় ধৃত করিলেন।"

উত্তর, আমার চিরশত্রুকে ধরিতে গিয়া ভ্রমক্রমে আপনাকে ধরিয়াছে। আপনার কোন আশঙ্কা নাই।

র। কোন আশঙ্কা নাই তাহার বিশ্বাস কি?

উত্তর, বিশ্বাস এই যে আমি এই ইষ্টদেবতার সম্মুখে অসত্য কথা কহিব না বা অন্যায় কার্য্য করিব না।

অবগুণ্ঠনবতী দস্যুকে মন্দিরহইতে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "কিন্তু যখন এই ইষ্টদেবতার সম্মুখে বন্দী করিবার অভিলাষে রজনীকান্তকে ধৃত করিবার অনুমতি করিয়াছিলেন তখন আপনাকে বিশ্বাস কি?

যেমন নিকটস্থ কোন বস্তুতে বজ্রাঘাত হইলে পথিক চমকিত ও বিহ্বল হয়, পূজক সেই প্রকার হইলেন এবং কিয়ৎকালপরে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"আপনি কে?'

রমণী দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া অবগুণ্ঠন কিঞ্চিৎ উন্মোচন করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার অগ্রজের পত্নী কুমুদিনী।"

পাঠক এতক্ষণে বোধ হয় শ্মশ্রুবিশিষ্ট পূজককে চিনিতে পারিয়াছেন। তিনি রতিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি রজনীকান্তের পিতার দ্বারা হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া উদাসীন হইয়াছেন। তিনি ক্ষণেক নীরব রহিলেন; পরে বিহ্বলের ন্যায় অস্ফুটস্বরে স্বগত বলিতে লাগিলেন "ইনি এখানে কেন?"

কুমুদিনী কিঞ্চিৎ কঠিন স্বরে কহিলেন, "তুমিই আমায় ধরিয়া আনাইয়াছ?"

রতিকান্ত অতি কাতর স্বরে বলিলেন, "আপনার কি আমার এ অবস্থা দেখিয়া দয়া হয় না, এখনও ভর্ৎসনা!"

কুমুদিনী উত্তর করিলেন না, কিন্তু রতিকান্ত বুঝিতে পারিলেন যে, কুমুদিনী কাঁদিতেছেন, তাঁহার পাষাণ নির্ম্মিত হৃদয় আর্দ্র হইল, চক্ষে এক ফোঁটা জল আসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কুমুদিনী কম্পিত স্বরে বলিলেন, "এ দুঃখ কি জন্য? কেন স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়াছ? এস, গৃহে চল, তাহাদিগকে লইয়া সংসার করিবে চল।"

রতি। গৃহে যাইয়া কি খাইব?

কুম। আমার বহুমূল্যের অলঙ্কার আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া খাইবে।

রতিকান্তের পুনবায় কঠিন হৃদয় দ্রব হইল, নয়নে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল।

রতি। আমি আপনার অনুরোধে গৃহে যাইতে পারি, কিন্তু আমার পৈতৃক ঐশ্বর্য্য যে রজনীকান্ত আমার সম্মুখে ভোগ করিবে তাহা আমার অসহ্য হইবে।

কুমু। রজনীকান্ত ধর্ম্মভীত লোক—সবিশেষ জানিতে পারিলে তোমার পৈতৃক সম্পত্তি তোমাকে ফিরিয়া দিতে পারেন।

রতিকান্তের হঠাৎ ভাবান্তর হইল এবং অতি রুষ্টভাবে কহিলেন, "কি! ভিখারীর ন্যায় রজনীকান্তের দ্বারস্থ হইব, আর সে আমাকে দ্বারবান্ দ্বারা বহিষ্কৃত করিবে!"

কুমু। রজনীকান্ত আমার ভগিনীপতি, আমি অনুরোধ করিলে তোমার সহিত কুব্যবহার করিবেন না।

রতিকান্ত ক্ষণেককাল ওষ্ঠদংশন করিতে লাগিলেন, তৎপরে কহিলেন,

"আমার স্মরণ ছিল না যে, রজনী আপনার সম্পর্কীয় ও এত আত্মীয়—আপনি আমার অন্তরের অতি গুহ্য কথা জানিতে পারিয়াছেন, এক্ষণেই উহা রজনীকান্তকে জ্ঞাত করাইবেন।"

কুমু। এ অতি অন্যায় কথা, আমার রজনীও যেমন তুমিও তেমন, আমি দিবা রাত্র কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি যেন নাইতেও তোমার মাথার কেশ ছেঁড়ে না।

রতি। আপনি যাহা বলিতেছেন সকলি সত্য, কিন্তু আমি অতি পাষণ্ড, আমি পৃথিবীর উপর বিশ্বাস হারাইয়াছি। আপনি এই দেবীর পদস্পর্শ করিয়া শপথ করুন যে, রজনীর প্রতি আমার যে অভিপ্রায় তাহা গোপন রাখিবেন।

কুমুদিনী উত্তর করিলেন না, ক্রোধে তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে অতি কঠিন স্বরে বলিলেন,

আমি তোমার কে, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ?

রতি। আপনি আমার আত্মীয়া, তাহা বিস্মৃত হয় নাই, কিন্তু রজনী যে আপনার ভগিনীপতি তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলাম।

কুমু। তবে আমার সহিত এমত কুব্যবহার করিতেছ কেন?

রতি। কেবল আত্মরক্ষার্থ।

কুমু। আমার দ্বারা অনিষ্টের আশঙ্কা কেন, আমি কি তোমার শত্রু?

রতি। আমার শত্রু নন, কিন্তু রজনীর ত মিত্র।

কুমু। ছি! তোমার অন্তঃকরণ অতি কুৎসিত হইয়াছে।

রতি। শপথ করুন।

কুমু। আমি শপথ করিব না।

র। রজনীকে সকল জ্ঞাত করাইবেন?

কুমু। তাঁহার বিপদ্ তাঁহাকে জানাইব।

র। শুনুন; যদি আপনি শপথ না করেন, তবে অদ্য রাত্রেই আপনার ভগিনী স্বর্ণপ্রভাকে বিধবা করিব।

কুমু। আচ্ছা, তবে আমি চলিলাম।

রতিকান্ত দ্বারদেশে দুই হস্ত বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,

"যতক্ষণ না রজনীর মৃত্যু হয়, ততক্ষণ আপনি এই ঘরে বন্দী রহিলেন।

কুমু। তুমি আজিও এমন পাষণ্ড হও নাই, এ সকল কার্য্য তোমার দ্বারা অসম্ভব।

র। তবে দেখুন।

এই বলিয়া রতিকান্ত, দস্যুদিগের দলপতিকে আহ্বান করিয়া মন্দিরের সোপানের নিকট দাঁড়াইয়া চুপি চুপি কি বলিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যে কুমুদিনী তথায় নাই। আশ্চর্য্য হইয়া আলোক লইয়া মন্দিরের চতুষ্কোণ ও অন্যান্য স্থান অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তখন সমূহ বিপদ্ বিবেচনা করিয়া দস্যুদিগের সহিত স্বয়ং যাত্রা কবিলেন।

পদ্য।

সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত।

"ওরে রে চপল মন, কতই কর ভ্রমণ,
পাতাল পর্য্যন্ত এস ঘুরে।
কভু ভ্রম দিঙ্মণ্ডলে, কখন বা নভঃস্থলে,
উল্লঙ্ঘিয়া যাও স্বর্গপুরে॥
কিন্তু তব অভ্যন্তরে, লীন ব্রহ্ম পরাৎপরে,
ভ্রমেও না করহ স্মরণ।
যিনি সন্নিকট হেন, বল ভাই কেন কেন,
তাঁর প্রতি বিরতি এমন॥

শান্তিশতক

হিংসাহীন মল্লভাবে সুলভ্য অশন।
সর্পগণ হেতু বিধি সৃজিলা পবন॥
পশুকুল তৃণাঙ্কুর ভোগে পুষ্টকায়।
ভূমিতে শয়ন করি সুখে নিদ্রা যায়॥
কিন্তু এ সংসারসিন্ধু লঙ্ঘন কারণে।
দিয়াছেন উপযুক্ত বুদ্ধি নরগণে।
অন্বেষণ করিলেই যে বুদ্ধির বলে।
সকল প্রকাব গুণ ন্যস্ত করতলে॥

বৈরাগ্য শতক

কই সে মুখারবিন্দ মধুর অধর।
কোথায় আয়ত সে কটাক্ষ কটুত্তর।
কোথা সে কোমল কথা শ্রুতি সুখকারী।
ভুরুর ভঙ্গিমা, স্মরধনু দর্পহারী॥
এযে অস্থি পঞ্জরেতে প্রকট দশন।
মঞ্জু মঞ্জু গুঞ্জরিছে তাহে সমীরণ॥
মহা মোহ জালরূপ শরের কপাল।
রাগান্ধের মত হাসে হেরিতে করাল॥

শান্তিশতক

দ্রৌপদী।

কি প্রাচীন, কি আধুনিক হিন্দুকাব্য সকলের নায়িকাগণের চরিত্র এক ছাঁচে ঢালা দেখা যায়। পতিপরায়ণা, কোমল প্রকৃতিসম্পন্না, লজ্জাশীলা, সহিষ্ণুতা গুণের বিশেষ অধিকারিণী—ইনিই আর্য্য-সাহিত্যের আদর্শস্থলাভিষিক্তা। এই গঠনে বৃদ্ধ বাল্মীকি বিশ্বমনোমোহিনী জনকদুহিতাকে গড়িয়াছিলেন। সেই অবধি আর্য্য নায়িকা সেই আদর্শে গঠিত হইতেছে। শকুন্তলা, দময়ন্তী, রত্নাবলী, প্রভৃতি প্রসিদ্ধা নায়িকাগণ—সীতার অনুকরণ মাত্র। অন্য কোন প্রকৃতির নায়িকা যে আর্য্যসাহিত্যে দেখা যায় না, এমত কথা বলিতেছি না—কিন্তু সীতানুবর্ত্তিনী নায়িকারই বাহুল্য। আজিও, যিনিই সস্তা ছাপাখানা পাইয়া নবেল নাটকাদিতে বিদ্যাপ্রকাশ করিতে চাহেন, তিনিই সীতা গড়িতে বসেন।

ইহার কারণও দুরানুমেয় নহে। প্রথমতঃ সীতার চরিত্রটি বড় মধুর, দ্বিতীয়তঃ এই প্রকার স্ত্রীচরিত্রই আর্য্যজাতির নিকট বিশেষ প্রশংসিত, এবং তৃতীয়তঃ আর্য্য-স্ত্রীগণের এই জাতীয় উৎকর্ষই সচরাচর আয়ত্ত।

মহাভারতকার যে রামায়ণকে এক প্রকার আদর্শ করিয়া কিম্বদন্তীমূলক বা পুরাণকথিত ঘটনা সকলকে ইতিহাস সূত্রে গ্রন্থিত করিয়াছেন, এই বঙ্গদর্শনে পূর্ব্বপ্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এমত কথায় আভাস দেওয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রধান নায়িকা সম্বন্ধে মহাভারতকার নিতান্ত নিরপেক্ষ। মহাভারতে নায়ক নায়িকার ছড়াছড়ি—অতএব সীতা-চরিত্রানুবর্ত্তিনী নায়িকারও অভাব নাই কিন্তু দ্রৌপদী সীতার ছায়াও স্পর্শ করেন নাই। এখানে, মহাভারতকার অপূর্ব্ব নূতন সৃষ্টি প্রকাশিত করিয়াছেন। সীতার সহস্র অনুকরণ হইয়াছে কিন্তু দ্রৌপদীর অনুকরণ হইল না।

সীতা সতী, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকেও মহাভারতকার সতী বলিয়াই পরিচিতা করিয়াছেন, কেন না, কবির অভিপ্রায় এই যে পতি এক হৌক, পাঁচ হৌক, পতিমাত্র ভজনাই সতীত্ব। উভয়েই পত্নী ও রাজ্ঞীর কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে অক্ষুণ্ণগতি, ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং গুরুজনের বাধ্য। কিন্তু এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য। সীতা রাজ্ঞী হইয়াও প্রধানতঃ কুলবধূ; দ্রৌপদী কুলবধূ হইয়াও প্রধানতঃ প্রচণ্ড তেজস্বিনী রাজ্ঞী। সীতায় স্ত্রীজাতির কোমল গুণ গুলির পরিস্ফুট, দ্রৌপদীতে স্ত্রীজাতির কঠিন-গুণ সকল প্রদীপ্ত। সীতা রামের যোগ্যা

জায়া, দ্রৌপদী ভীমসেনেরই সুযোগ্যা বীরেন্দ্রাণী। সীতাকে হরণ করিতে রাবণের কোন কষ্ট হয় নাই, কিন্তু রক্ষোরাজ লঙ্কেশ যদি দ্রৌপদীহরণে আসিতেন, তবে বোধ হয়, হয় কীচকের ন্যায় প্রাণ হারাইতেন, নয় জয়দ্রথের ন্যায়, দ্রৌপদীর বাহুবলে ভূমে গড়াগড়ি দিতেন।

দ্রৌপদী চরিত্রের রীতিমত বিশ্লেষণ দুরূহ; কেন না মহাভারত অনন্ত সাগর তুল্য, তাহার অজস্র তরঙ্গাভিঘাতে একটি নায়িকা বা নায়কের চরিত্র তৃণবৎ কোথায় যায়, তাহা পর্য্যবেক্ষণ কে করিতে পারে। তথাপি দুই একটা স্থানে বিশ্লেষণে যত্ন করিতেছি।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর। দ্রুপদরাজার পণ, যে, যে সেই দুর্ব্বেধনীয় লক্ষ্য বিঁধিবে, সেই দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিবে। কন্যা সভাতলে আনীতা। পৃথিবীর রাজগণ, বীরগণ, ঋষিগণ সমবেত। এই মহা সভার প্রচণ্ড প্রতাপে কুমারী কুসুম শুকাইয়া উঠে। সেই বিশোষ্যমাণা কুমারী লাভার্থ, দুর্য্যোধন, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি ভুবনপ্রথিত মহাবীর সকল লক্ষ্য বিঁধিতে যত্ন করিতেছেন। একে একে সকলেই বিফলে অক্ষম হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। হায়! দ্রৌপদীর বিবাহ হয় না।

অন্যান্য রাজগণ মধ্যে সর্ব্ববীর শ্রেষ্ঠ অঙ্গাধিপতি কর্ণ লক্ষ্য বিঁধিতে উঠিলেন। ক্ষুদ্র কাব্যকার এখানে কি করিতেন বলা যায় না—কেন না এটি বিষম সঙ্কট। কাব্যের প্রয়োজন, পাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ দেওয়াইতে হইবে। কর্ণ লক্ষ্য বিঁধিলে তাহা হয় না। ক্ষুদ্র কবি বোধ হয়, কর্ণকেও লক্ষ্যবিন্ধনে অশক্ত বলিয়া পরিচিত করিতেন। কিন্তু মহাভারতের মহাকবি জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইতেছেন, যে কর্ণের বীর্য্য, তাঁহার প্রধান নায়ক অর্জ্জুনের বীর্য্যের মানদণ্ড। কর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অর্জ্জুনহস্তে পরাভূত বলিয়াই অর্জ্জুনের গৌরবের এত আধিক্য; কর্ণকে অন্যের সঙ্গে ক্ষুদ্রবীর্য্য করিলে অর্জ্জুনের গৌরব কোথা থাকে? এরূপ সঙ্কট, ক্ষুদ্রকবিকে বুঝাইয়াদিলে তিনি অবশ্য স্থির করিবেন, যে তবে অত হাঙ্গামায় কাজ নাই—কর্ণকে না তুলিলেই ভাল হয়। কাব্যের যে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্নতার ক্ষতি হয় তাহা তিনি বুঝিবেন না—সকল রাজাই যেখানে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী লোভে লক্ষ্য বিঁধিতে উঠিতেছেন, সেখানে মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণই যে কেন একা উঠিবেন না, এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই।

মহাকবি আশ্চর্য্য কৌশলময়, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালী। তিনি অবলীলা ক্রমে কর্ণকে লক্ষ্যবিন্ধনে উত্থিত করিলেন, কর্ণের বীর্য্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন, এবং সেই অবসরে, সেই উপলক্ষে, সেই একই উপায়ে, আর একটি গুরুতর উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিলেন। দ্রৌপদীর চরিত্র পাঠকের নিকটে প্রকটিত করিলেন। যেদিন জয়দ্রথ দ্রৌপদীকর্ত্তৃক ভূতলশায়ী হইবে, যে দিন দুর্য্যোধনের সভাতলে

দ্যূতজিতা অপমানিতা মহিষী স্বামী হইতেও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে উন্মুখিনী হইবেন, সে দিন দ্রৌপদীর যে চরিত্র প্রকাশ পাইবে, অদ্য সেই চরিত্রের পরিচয় দিলেন। একটি ক্ষুদ্র কথায় এই সকল উদ্দেশ্য সফল হইল। বলিয়াছি, সেই প্রচণ্ড প্রতাপ সমন্বিতা মহাসভায় কুমারী কুসুম শুকাইয়া উঠে। কিন্তু দ্রৌপদী কুমারী, সেই বিষম সভাতলে, রাজমণ্ডলী, বীরমণ্ডলী, ঋষিমণ্ডলীমধ্যে, দ্রুপদরাজ তুল্য পিতার ধৃষ্টদ্যুম্নতুল্য ভ্রাতার অপেক্ষা না করিয়া, কর্ণকে বিদ্ধনোদ্যত দেখিয়া বলিলেন, "'আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না।' এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ণ সামর্ষ হাস্যে সূর্য্যসন্দর্শনপূর্ব্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন।"

এই এক কথায় যতটা চরিত্র পরিস্ফুট হইল শত পৃষ্ঠা লিখিয়াও ততটা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। এস্থলে কোন বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন হইল না—দ্রৌপদীকে তেজস্বিনী বা গর্ব্বিতা বলিয়া ব্যাখ্যাত করিবার আবশ্যকতা হইল না। অথচ রাজদুহিতার দুর্দ্দমনীয় গর্ব্ব নিঃসঙ্কোচে বিস্ফারিত হইল।

ইহার পর দ্যূতক্রীড়ায়, বিজিতা দ্রৌপদীর চরিত্র অবলোকন কর। মহাগর্ব্বিত, তেজস্বী, এবং বলধারী ভীমার্জ্জুন দ্যূতমুখে বিসর্জ্জিত হইয়াও, কোন কথা কহেন নাই, শত্রুর দাসত্ব নিঃশব্দে স্বীকার করিলেন। এস্থলে তাঁহাদিগের অনুগামিনী দাসীর কি করা কর্ত্তব্য? স্বামিকর্ত্তৃক দ্যূতমুখে সমর্পিত হইয়া স্বামিগণের ন্যায় দাসীত্ব স্বীকার করাই আর্য্যনারীর স্বভাবসিদ্ধ। দ্রৌপদী কি করিলেন? তিনি প্রাতিকামীর মুখে দ্যূতবার্ত্তা এবং দুর্য্যোধনের সভায় তাঁহার আহ্বান শুনিয়া বলিলেন,

"হে সূতনন্দন! তুমি সভায় গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে দ্যূতমুখে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। হে সূতাত্মজ! তুমি যুধিষ্ঠিরের নিকট এই বৃত্তান্ত জানিয়া এস্থানে আগমন পূর্ব্বক আমাকে লইয়া যাইও। ধর্ম্মরাজ কিরূপেপ পরাজিত হইয়াছেন, জানিয়া আমি তথায় গমন করিব।" দ্রৌপদীর অভিপ্রায়, কূটতর্ক উপস্থিত করিবেন।

দ্রৌপদীর চরিত্রে দুইটি লক্ষণ বিশেষ সুস্পষ্ট—এক ধর্ম্মাচরণ, দ্বিতীয় দর্প। দর্প, ধর্ম্মের কিছু বিরোধী, কিন্তু এই দুইটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রাকৃত নহে। মহাভারতকার এই দুই লক্ষণ অনেক নায়কে একত্রে সমাবেশ করিয়াছেন; ভীমসেনে, অর্জ্জুনে, অশ্বত্থামায়, এবং সচরাচর ক্ষত্রিয়চরিত্রে এতদুভয়কে মিশ্রিত করিয়াছেন। ভীমসেনে দর্প পূর্ণমাত্রায়, এবং অর্জ্জুনেও অশ্বত্থামায় অর্দ্ধমাত্রায়, দেখা যায়। দর্পশব্দে এস্থানে আত্মশ্লাঘাপ্রিয়তা নির্দ্দেশ করিতেছি না; মানসিক তেজস্বিতাই আমাদের নির্দ্দেশ্য। এই তেজস্বিতা দ্রৌপদীতেও পূর্ণমাত্রায় ছিল। অর্জ্জুনে এবং

অভিমন্যুতে ইহা আত্মশক্তিনিশ্চয়তায় পরিণত হইয়াছিল; ভীমসেনে ইহা বলবুদ্ধির কারণ হইয়াছিল; কেবল দ্রৌপদীতেই ইহা ধর্ম্মানুরাগ অপেক্ষা প্রবল। নহিলে তিনি স্বয়ম্বর সভাতলে পিতৃসত্যের ব্যতিক্রম করিয়া বলিতেন না যে, "আমি সূতপুত্রকে বিবাহ করিব না।" তা না হইলে, দুর্য্যোধনের সভায় স্বামীর পণ ব্যতিক্রম করিয়া কূটপ্রশ্ন করিতেন না। এটি স্বভাবসঙ্গতই হইতেছে, স্ত্রীলোকের গর্ব্ব, সহজে ধর্ম্মকে অতিক্রম করে। এত সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে দ্রৌপদীচরিত্র নির্ম্মিত হইয়াছে।

সভাতলে দ্রৌপদীর দর্প ও তেজস্বিতা আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি দুঃশাসনকে বলিলেন, "যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও তোর সহায় হন, তথাপি রাজপুত্রেরা তোকে কখনই ক্ষমা করিবেন না।" স্বামিকুলকে উপলক্ষ করিয়া সর্ব্বসমীপে মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, "ভরতবংশীয়গণের ধর্ম্মে ধিক্! ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞগণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" ভীষ্মাদি গুরুজনকে মুখের উপর তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "বুঝিলাম দ্রোণ, ভীষ্ম, ও মহাত্মা বিদুরের কিছুমাত্র স্বত্ব নাই।" কিন্তু অবলার তেজঃ কতক্ষণ থাকে! মহাভারতের কবি, মনুষ্যচরিত্র সাগরের তলদেশ পর্য্যন্ত নখদর্পণবৎ দেখিতে পাইতেন। যখন কর্ণ দ্রৌপদীকে বেশ্যা বলিল, দুঃশাসন তাঁহার পরিধেয় আকর্ষণ করিতে গেল; তখন আর দর্প রহিল না—ভয়াধিক্যে হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তখন দ্রৌপদী ডাকিতে লাগিলেন, "হা নাথ! হা রমানাথ! হা ব্রজনাথ! হা দুঃখনাশ! আমি কৌরবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি—আমাকে উদ্ধার কর!" এস্থলে কবিত্বের চরমোৎকর্ষ।

বলিয়াছি, যে দ্রৌপদী স্ত্রীজাতি বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে দর্প এত প্রবল, যে তাহাতে সময়ে সময়ে ধর্ম্মজ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানও অসামান্য—যখন তিনি দর্পিতা রাজমহিষী হইয়া না দাঁড়ান, তখন জনমণ্ডলে তাদৃশী ধর্ম্মানুরাগিণী আছে বোধ হয় না। এই প্রবল ধর্ম্মানুরাগই, প্রবলতর দর্পের মানদণ্ডের স্বরূপ। এই অসামান্য ধর্ম্মানুরাগ, এবং তেজস্বিতার সহিত সেই ধর্ম্মানুরাগের রমণীয় সামঞ্জস্য, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাঁহার বরগ্রহণ কালে অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। সেস্থানটি এত সুন্দর, যে যিনি তাহা শতবার পাঠ করিয়াছেন, তিনি তাহা আর একবার পাঠ করিলেও অসুখী হইবেন না। এজন্য সেই স্থানটি আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

"হিতৈষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে দ্রৌপদীকে কহিলেন, হে দ্রুপদতনয়ে! তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার সমুদায় বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দ্রৌপদী কহিলেন হে ভরতকুল-

প্রদীপ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান্ করুন যে, সর্ব্বধর্ম্মযুক্ত শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনার পুত্রগণ যেন ঐ মনস্বীকে পুনরায় দাস না বলে, আর আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্য যেন দাসপুত্র না হয়, কেননা প্রতিবিন্ধ্য রাজপুত্র, বিশেষতঃ ভূপতিগণ কর্ত্তৃক লালিত, উহার দাসপুত্রতা হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি তোমার অভিলাষানুরূপ এই বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি একমাত্র বরের উপযুক্ত নহ।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে মহারাজ! সরথ সশরাসন ভীম, ধনঞ্জয় নকুল ও সহদেবের দাসত্ব মোচন হউক। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন হে নন্দিনি! আমি তোমার প্রর্থনানুরূপ বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুই বর দান দ্বারা তোমার যথার্থ সৎকার করা হয় নাই, তুমি ধর্ম্মচারিণী আমার সমুদায় পুত্রবধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভগবন্! লোভ ধর্ম্মনাশের হেতু, অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নহি; যেহেতু বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয়পত্নীর দুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শত বর লওয়া কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমার পতিগণ দাসত্বরূপ দারুণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধৃত হইলেন, উঁহারা পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।"

এইরূপ ধর্ম্ম ও গর্ব্বের সুসামঞ্জস্যই দ্রৌপদীচরিত্রের রমণীয়তার প্রধান উপকরণ। যখন জয়দ্রথ তাঁহাকে হরণ মানসে কাম্যকবনে একাকিনী প্রাপ্ত হয়েন, তখন প্রথমে দ্রৌপদী তাঁহাকে ধর্ম্মাচারসঙ্গত অতিথিসমুচিত সৌজন্যে পরিতৃপ্ত করিতে বিলক্ষণ যত্ন করেন; পরে জয়দ্রথ আপনার দুরভিসন্ধি ব্যক্ত করায়, ব্যাঘ্রীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া আপনার তেজোরাশি প্রকাশ করেন। তাঁহার সেই তেজোগর্ব্ব বচন পরম্পরা পাঠে মন আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকে। জয়দ্রথ তাহাতে নিরস্ত না হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে গিয়া তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হয়েন; যিনি ভীমার্জ্জুনের পত্নী, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী তাঁহার বাহুবলে ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় মহাবীর সিন্ধু সৌবীরাধিপতি ভূতলে পতিত হয়েন।

পরিশেষে জয়দ্রথ পুনর্ব্বার বল প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে রথে তুলেন; তখন দ্রৌপদী যে আচরণ করিলেন, তাহা নিতান্ত তেজস্বিনী বীরনারীর কার্য্য। তিনি বৃথা বিলাপ ও চীৎকার কিছুই করিলেন না; অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় একবারও অজ্ঞানতা এবং বিলম্বকারী স্বামিগণের উদ্দেশে ভর্ৎসনা করিলেন না; কেবল কুলপুরোহিত ধৌম্যের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক জয়দ্রথের রথে আরোহণ করিলেন।

পরে যখন জয়দ্রথ দৃশ্যমান পাণ্ডবদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি জয়দ্রথের রথস্থা হইয়াও যেরূপ গর্ব্বিত বচনে ও নিঃশঙ্কচিত্তে অবলীলাক্রমে স্বামীদিগের পরিচয় দিতে লাগিলেন, তাহা এস্থলে উদ্ধারের যোগ্য।

"দ্রৌপদী কহিলেন, রে মূঢ়! তুমি অতি নিদারুণ আয়ুঃক্ষয়কর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে ঐ সকল মহাবীরের পরিচয় লইয়া কি করিবে। উহাঁরা সমবেত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন; আজি তোমাদিগের মধ্যে কেহই জীবিতাবশিষ্ট থাকিবে না। এক্ষণে অনুজগণের সহিত ধর্ম্মরাজকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার সকল ক্লেশই অপনীত হইল; আমি তোমা হইতে আর কোন অনিষ্ট আশঙ্কা করি না। তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা কনিলে; আমি ধর্ম্মরোধে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি; শ্রবণ কর।

যাঁহার ধ্বজাগ্রভাগে নন্দ ও উপানন্দ নামক সুমধুর মৃদঙ্গদ্বয় নিনাদিত হইতেছে। যাঁহার বর্ণ কাঞ্চনের ন্যায় গৌর; নাসা উন্নত ও লোচনদ্বয় আয়ত; উনিই আমার পতি, কুরুকুলশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির। কুশলাভিলাষী মনুষ্যেরা ধর্ম্মার্থবেত্তা বলিয়া উহাঁর অনুসরণ করিয়া থাকে। উনি শরণাগত শত্রুরও প্রাণদান করেন; অতএব তুমি যদি আপনার শ্রেয় ইচ্ছা কর; তাহা হইলে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবিলম্বেই উহাঁর শরণাপন্ন হও।

যিনি শাল বৃক্ষের ন্যায় উন্নত; যাঁহার বাহুযুগল আজানুলম্বিত; আনন ভ্রুকুটীকুটিল ও ভ্রূদ্বয় পরস্পর সংহত; যিনি মুহুর্মুহু ওষ্ঠাধর দংশন করিতেছেন; উনি আমার পতি, মহাবীর বৃকোদর। আয়ানেয় নামক মহাবল অশ্বেরা প্রফুল্ল মনে উহাঁরে বহন করিয়া থাকে। উহাঁর কর্ম্ম সকল অলোকসামান্য এবং উহাঁর ভীম এই সার্থক নামটি পৃথিবীতে সুপ্রচার হইয়াছে। উহাঁর নিকট অপরাধী হইলে অতি বলবতী জীবিতাশা পরিত্যাগ করিতে হয়। ইনি শত্রুতা কদাচ বিস্মৃত হন না এবং শত্রুর প্রাণান্ত না করিয়া অন্তঃকরণে অণুমাত্র শান্তিলাভ করেন না।

ইহাঁর নাম যশস্বী অর্জ্জুন। ইনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা ও প্রিয় শিষ্য; ভয়, লোভ বা কামপরতন্ত্র হইয়া কদাচ ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করেন না এবং নৃশংসাচারেও নিরত নহেন। ইতি ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য, সর্ব্বধর্ম্মার্থবেত্তা এবং ভয়ার্ত্তের ত্রাতা; ইহাঁর অসামান্য রূপলাবণ্য ত্রিলোকে প্রথিত আছে। অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গ সততই এই প্রাণপ্রিয় অর্জ্জুনের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। এই মহাবীরের নাম নকুল, ইনি আমার পতি। ইনি খড়্গযুদ্ধে অদ্বিতীয়; আজি দৈত্যসৈন্য মধ্যবর্ত্তী দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় রণস্থলে ইহাঁর অদ্ভুত কর্ম্ম সমুদায় প্রত্যক্ষ করিবে। ইনি মহাবল পরাক্রান্ত, মতিমান্ ও মনস্বী এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম-

রাজ যুধিষ্ঠিরকে নিরন্তর সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। আর যাঁহাকে সূর্য্যসম তেজঃসম্পন্ন দেখিতেছ; উনি আমার পতি, সর্ব্বকনিষ্ঠ সহদেব, উহার তুল্য বুদ্ধিমান্ ও বক্তা আর নাই। উনি অনায়াসে প্রাণত্যাগ বা অগ্নিপ্রবেশ করিতে পারেন; তথাপি অধর্ম্ম ব্যবহারে কদাচ প্রবৃত্ত হন না এবং কিছুতেই অপ্রিয় সহ্য করিতে পারেন না। উনি আর্য্যা কুন্তীর প্রাণপ্রিয় পুত্র এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে একান্ত নিরত।

যেমন অর্ণবমধ্যে বস্তুপরিপূর্ণ নৌকা মকরপৃষ্ঠে আহত হইলে চূর্ণ ও বিকীর্ণ হইয়া যায়; এক্ষণে আমি সৈন্যগণমধ্যে তদ্রূপ বিক্ষোভিত ও অসহায় হইয়াছি। তুমি মোহাবেশপরবশ হইয়া যাঁহাদিগকে এইরূপ অবমামনা করিতেছ; সেই পাণ্ডবেরা তোমারে অবিলম্বে ইহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিবেন কিন্তু অদ্য যদি তুমি ইহাঁদিগের নিকট পরিত্রাণ প্রাপ্ত হও; তাহা হইলে তোমার পুনর্জ্জন্ম লাভ হইবে, সন্দেহ নাই।"*

ক্রমশঃ।

সম্পাদকীয় উক্তি।

দেবীবর ঘটক বিষয়ে যে প্রবন্ধ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল, তাহা শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত "সম্বন্ধনির্ণয়" নামক উৎকৃষ্ট অভিনব পুস্তকের এক অংশ। ঐ পুস্তক প্রকাশের পূর্ব্বে বিদ্যানিধি মহাশয় তদংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভাদ্র মাসে ঐ প্রবন্ধটি যন্ত্রস্থ হইয়া প্রস্তুত ছিল, কিন্তু নানা বিঘ্ন বশতঃ বঙ্গদর্শন প্রচারে বিলম্ব হইল। ইতিমধ্যে মূল পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে।

* এই প্রবন্ধ যাহা মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করাগিয়াছে, তাহা কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত হইতে।

চৈতন্য।

প্রথম অধ্যায়।

(চৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অবস্থা।)

মানব সমাজের প্রকৃতি মানবদেহের ন্যায়। দেহ যেরূপ প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে—প্রাচীন মাংস, রক্ত, মজ্জা, অস্থি, শিরা ধমনী ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে ও নূতন মাংস, রক্ত, মজ্জা, অস্থি, শিরা ও ধমনী তৎস্থলাভিষিক্ত হইতেছে, মানব সমাজও সেইরূপ প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে—প্রাচীন আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, কৌশল, পরিচ্ছদ ও ধর্ম্ম উঠিয়া যাইতেছে ও নূতন আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, কৌশল, পরিচ্ছদ ও ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইতেছে। তোমার অদ্য যে দেহ দৃষ্ট হইতেছে সাত বৎসর পরে তাহার কিছুই থাকিবে না কিন্তু তুমি পরিণতবয়স্ক, তোমার আকারগত অনেক বৈলক্ষণ্য হইয়াও এত সৌসাদৃশ্য থাকিবে যে তোমাকে চিনা যাইবে; কিন্তু তুমি যে ভাগিনেয়ের মুখে অন্নপ্রাশন কালে অন্ন দিয়াছিলে, দশ বৎসর পরে তাহাকে দেখিলে কি চিনিতে পার? মানবসমাজ সম্বন্ধেও অবিকল ইহাই ঘটিয়া থাকে। বর্দ্ধিত অর্থাৎ সভ্যসমাজ যদিও পরিবর্ত্তশীল, তথাপি ২।১ শতাব্দীর মধ্যে তাহার গঠনগত বিশেষ রূপে পরিবর্ত্তন হয় না। পক্ষান্তরে অসভ্য অথবা অর্দ্ধসভ্য সমাজে কোন বিশেষ উন্নতির কারণ নূতন প্রবর্ত্তিত হইলে, স্বল্পকাল মধ্যে উক্ত সমাজকে এত বিপর্য্যস্ত করে যে ঐ সমাজের সঙ্গে পূর্ব্বতন সমাজের কোনই সৌসাদৃশ্য থাকে না। ভারতের আধুনিক অবস্থা প্রথমোক্ত স্থলের উদাহরণ এবং ইদানীন্তন জেপান সাম্রাজ্য শেষোক্ত স্থলের উদাহরণ।

মানব সমাজের এই রূপ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন ব্যতীত সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ কারণে শরীরের ব্যাধিগত পরিবর্ত্তের ন্যায় একএকটী বিশেষ পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে ব্যাধিগত শারীরিক পরিবর্ত্ত নিরবচ্ছিন্ন মন্দ, আর এইরূপ সামাজিক বিপ্লবঘটিত পরিবর্ত্তে সমাজ সময়ে সময়ে যেজন্য অপকৃত হয় আবার সময়ে সময়ে সেজন্য উপকৃতও হইয়া থাকে।

যেমন শরীরে অদ্য যে ব্যাধি অনুভূত হয়—অনুসন্ধান করিলে জানা যায় তাহার কারণ অনেক পূর্ব্বে (হয়ত জন্ম কালেই) উদ্ভাবিত হইয়াছে। সেই রূপ ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেও জানাযায়, যে বিপ্লব অদ্য সমাজকে আলোড়িত ও বিপর্য্যস্ত করিতেছে তাহার কারণ সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে উদ্ভাবিত হইতেছিল। বাস্তবিক বিবেচনা করিলে বুদ্ধদেব

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তক নহেন। যে দিন ব্রাহ্মণগণ ভারতে একাধিপত্য করিলেন, ভারতের মান মর্য্যাদা, বিদ্যা বুদ্ধি, সুখসম্পত্তি এবং পরিণামে ধর্ম্ম পর্য্যন্ত একচাটিয়া করিয়া লইলেন, সেই দিনই ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের সূত্রপাত হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছিল, মহাত্মা শাক্যসিংহ সেই সকল অগ্নি একত্রিত করিয়া তাহাতে নবীন আহুতি দিয়া যে অগ্নি জ্বালিলেন তাহা সমুদয় ভারত, সমুদয় আসিয়া আলোকিত করিল।

এই সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া আমরা কোনমতে চৈতন্যদেবকর্ত্তৃক বঙ্গসমাজের পরিবর্ত্তন হঠাৎ অর্থাৎ কোন বিশেষ কারণমূলক নহে একথা বলিতে পারি না। দৃষ্টি-নিরপেক্ষ যুক্তিতে ও অতীত কালের দৃষ্টান্তে যাহা যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে বঙ্গ সমাজের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেও তাহাই জাজ্বল্যমান প্রমাণিত হইবে। এই আন্দোলনের কারণও বহুকালহইতে সঞ্চিত হইতেছিল।

সাধারণতঃ লোকে মনে করিয়া থাকে, চৈতন্যদেব কেবল মাত্র ধর্ম্ম সংস্কার করিয়া ছিলেন। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ কখন বা জ্ঞানকাণ্ড কখন বা কর্ম্মকাণ্ড প্রধান হইয়াছিল; কিন্তু তিনি বঙ্গের সমুদয় নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে ভক্তির বীজ বপন করিয়াছিলেন। সত্য বটে ভক্তি মাহাত্ম্য প্রচারই চৈতন্যদেবের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা বঙ্গের কি সামাজিক অবস্থা, কি সাহিত্য, কি গার্হস্থ সকল বিষয়কেই নব আলোক ও নব জীবনে রঞ্জিত করিয়াছিল। জাতিভেদ রহিত, অসবর্ণে বিবাহ, ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি যে সমুদয় সামাজিক পরিবর্ত্তনের* জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারকগণ সর্ব্বদা চীৎকার ও অনেক "টেবল থাবড়াইয়াও," সত্য বলিলে, কিছুই করিতে পারিতেছেন না; চৈতন্য এ সকল কর্ত্তব্যবিশেষের জন্য কিছুমাত্র যত্ন না করিয়া একমাত্র ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়া ছিলেন।

চৈতন্যদেব কর্ত্তৃক বঙ্গসমাজের আন্দোলন ধর্ম্মমূলক হইয়াও কেবল মাত্র ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আন্দোলন নহে। এই জন্য উক্ত আন্দোলনের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে বঙ্গসমাজের সকল শাখা প্রশাখার অবস্থাই পর্য্যালোচন আবশ্যক।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গীয় আর্য্যোপনিবেশী দিগের স্বাধীনতা সূর্য্য অস্তে যায়। শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজকর্ম্মচারী, সৈনিক পুরুষ প্রভৃতি অনেকেই হিন্দু ছিলেন। দাস-

* ইহার সকল গুলিনকে আমরা প্রকৃত উন্নতি জ্ঞান করি না এই জন্য উন্নতি আখ্যা প্রদান না করিয়া পরিবর্ত্তন মাত্র বলিলাম। শ্রীকৃ——

রাজের সেনাপতি বখ্‌তিয়ার বঙ্গে প্রবেশ করিলে, রাজসভাসদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রোদ্ঘাটন করিয়া রাজাকে বলিলেন, "বঙ্গে যবনাধিকার অনিবার্য্য যে হেতু শাস্ত্রে লেখা আছে।" বখ্‌তিয়ার ১৭ জন মাত্র অশ্বারোহী লইয়া রাজধানী প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কি হইবে শাস্ত্রের বচন অখণ্ড্য। রাজা যুদ্ধ করিলে নিশ্চয় পরাজয় হইবে স্থির বুঝিয়া বিজ্ঞের কার্য্য করিলেন—সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে পলায়ন করিলেন। আজন্ম অশীতি বৎসর রাজত্ব করিয়া রাজত্বের প্রতি মমতা এতাধিক!! বঙ্গ দেশাধিপতির এত বীর্য্য ও তেজস্বিতা!! পৃথিবীর ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে এরূপ হাস্যজনক রাজপরিবর্ত্ত আর প্রায় দেখা যায় না। যে দেশে এত নিস্তেজ ও আত্মাভিমানশূন্য রাজা নিরাপদে রাজত্ব করিতে পারেন, তথাকার অধিবাসিগণ কত দুর্ব্বলপ্রকৃতি ও অভিমানশূন্য তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

তেজস্বিতাশূন্য জাতির উচ্চাভিলাষ বা ঐহিক মান সম্ভ্রমের প্রতি বিশেষ আস্থা নাই, পক্ষান্তরে মানবমন কদাপি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। এই জন্য যে মনুষ্যের অথবা যে জাতির মান সম্ভ্রম প্রভৃতি বীরজনোচিত গুণ না থাকে তাহারা স্বতঃই ধর্ম্মপরায়ণ অথবা সামাজিক আন্দোলনপ্রিয় হইয়া উঠে। বঙ্গদেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে কৌলীন্য প্রথা প্রচলন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার, বৌদ্ধধর্ম্ম দূরীকরণে তান্ত্রিক মত প্রচার, বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার প্রভৃতি ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

১২০৬ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পরেই বঙ্গদেশ যবন শাসনাধীন হইল। এই সময়ে কঠোর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম লোকের পদকে দৃঢ় নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ব্রাহ্মণ নামে ধর্ম্মযাজক কিন্তু কার্য্যে সর্ব্বে সর্ব্বা। বিদ্যা তাঁহার, বুদ্ধি তাঁহার, ভোগ তাঁহার, ক্ষমতা তাঁহার, মান তাঁহার, সমুদয় দান তাঁহার, নিমন্ত্রণে অগ্রে আহার তাঁহার, ধর্ম্ম তাঁহার, ঈশ্বর তাঁহার। শূদ্র তাঁহার দাস, বৈশ্য তাঁহার কৃষক, বৈদ্য তাঁহার চিকিৎসক। এরূপ উপদ্রব লোকে কয়দিন সহ্য করিতে পারে? নিতান্ত অক্ষম না হইলে কে চিরকাল কাহার দাস হইয়া থাকিতে বাসনা করে? এতদিন কতক ধর্ম্ম শাসনে ও কতক রাজশাসনে ব্রাহ্মণগণ আপনাদের কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু রাজপরিবর্ত্ত হইল। যবন সিংহাসনাধিরূঢ় হইল। আর সে প্রাধান্য কোথায়? লোকের মন বহুকাল যে নিগড়ে আবদ্ধ ছিল, রাজবল দূর হইলে, আপনা হইতে তাহা ভাঙ্গিতে উদ্যত হইল। হিন্দুধর্ম্ম ক্রমশঃ নিস্তেজ হইতে লাগিল। জাতিভেদের বন্ধন শিথিল হইল। ব্রাহ্মণ শূদ্র অনেকাংশে সমান হইল। তখন বঙ্গবাসিগণ দেখিল

পৃথিবী কেবল তাহাদিগের দৃষ্টি মধ্যগত নহে—ইহার আরও অনেক বিস্তৃতি আছে—এমন অনেক লোক আছে যাহারা তাঁহাদিগের ন্যায় পরলোকের চিন্তা করে কিন্তু ধর্ম্ম শাস্ত্রের দ্বারা তেমন জ্বালাতন হয় না, ধর্ম্মের জন্য ঐহিকের সুখে একেবারে জলাঞ্জলি দেয় না, প্রতি পাদবিক্ষেপে—আহারে, বিহারে, শয়নে, উত্থানে, প্রতি মুহূর্ত্তে শাস্ত্রের ব্যবস্থা লইয়া চলে না, স্বেচ্ছানুরূপ অনেক সুখ সম্ভোগ করিতে পারে অথচ পরলোকের হানি হয় না। এই সকল দেখিয়া কেহ কেহ প্রকাশ্যে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল এবং পরোক্ষে জাতিসাধারণের অনেকে ক্রমশঃ স্বধর্ম্মের প্রতি গতরাগ হইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মের সত্য বিশেষের পক্ষপাতী হইতে লাগিল।

যবনাধিকারে বঙ্গদেশে যেমন এই সুফল উৎপন্ন হইয়াছিল, সেইরূপ আবার তাহাদিগের বিলাসপ্রিয়তা, সুখলিপ্সা ও ব্যভিচার অনেক পরিমাণে লোককে পাপে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল।

একদিকে জাতিভেদ রহিত ও বিলাস বাসনার চরিতার্থতা এবং অপরদিকে আর্য্যজাতির বহুকাল বর্দ্ধিত ঈশ্বরস্পৃহা পরলোকভীতি যখন মনুষ্যের মনকে আকর্ষণ করিতেছিল তখনই তন্ত্রের মত ক্রমশঃ উদ্ভূত হইল। ষোড়শ শতাব্দীর কিছু পূর্ব্বে সর্ব্ববিদ্যা (১) উপাধিধারী জনেক ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব বঙ্গে আবির্ভূত হইয়া অসাধারণ ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্য বলে বঙ্গদেশের অনেক স্থলে তন্ত্রের মত প্রচার করিলেন। তন্ত্র যদিও হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত শিবের উক্তি বলিয়া প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু এ বিষয় নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে তন্ত্রোক্ত আবরণ দ্বারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বন্ধন অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়াছিল; এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বন্ধন কথঞ্চিৎ শিথিল না হইলে তন্ত্র কখন রচিত হইতে পারিত না।

প্রবৃত্তে ভৈরবী চক্রে সর্ব্বে বর্ণা
দ্বিজোত্তমাঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবী চক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্
পৃথক্॥

ইত্যাকার তন্ত্রোক্ত বচনোচিত আচরণ যে জাতিভেদ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল এবং ইত্যাকার বচন যে জাতিভেদ প্রথা কথঞ্চিৎ শিথিল না হইলে রচিত হয় নাই এ কথাতে কে সন্দেহ করিবে?

সামাজিক পরিবর্ত্ত ক্রমশঃ ও অননুভূত। মনুষ্য হঠাৎ চির অভ্যস্ত প্রথার বিপরীত আচরণ করিতে বা চির সংস্কারের বিপরীত বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। অদ্য আমার যে আচরণ বা সংস্কার আছে আমার বিজ্ঞতা অনুযায়ী অল্প অধিক

† অবশ্য এ স্থলে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের বিষয় বিবেচনা করা যাইতেছে না।

(১) ইহার নাম আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারি নাই।

বা অনেক অধিক দিবসে তাহা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। সুতরাং তন্ত্রের দ্বারা জাতিভেদ প্রথা কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল না হইলে চৈতন্য কদাপি এক জীবনে আচণ্ডাল‡ ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিতে পারিতেন না এবং

চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-
পরায়ণঃ।
হরিভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বাপদাধমঃ॥

এইরূপ পুরাণোক্ত বচন কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন না।

যদিও বঙ্গদেশের শেষ রাজা লক্ষ্মণসেন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু অনতি দীর্ঘকাল পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় নরপতিগণ বঙ্গের সিংহাসনাধিরূঢ় ছিল। ইহাদিগের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম সমধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। হিন্দুধর্ম্ম এতদূর নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হইয়াছিল যে পরবর্ত্তী সেনবংশীয় আদি ভূপতি আদিশূর কোন যাজ্ঞিক কার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য কান্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কুলকালিমার গ্রন্থকার ও আধুনিক কোন কোন পণ্ডিত বল্লালসেন প্রভৃতি সেনবংশীয় কোন কোন ভূপতিকেও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বর্ণন করেন। বল্লাল বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন কি না—তদ্বিষয় অনুসন্ধান করার আবশ্যক নাই। "তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন" ইহার কথঞ্চিৎ প্রমাণ থাকাতেই অনুভূত হয় সেনবংশীয় ভূপতিদিগের সময়েও এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে অপ্রচলন হয় নাই। কালে ভারতবিখ্যাত পরিব্রাজক শঙ্করাচার্য্য ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি দার্শনিকগণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধ মত বিচারে পরাভূত ও সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রভ হইলে ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় তাহা বঙ্গদেশ হইতে একেবারে তিরোহিত হয়। বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম দূর হইল, তথাপি লোকের আচার আচরণ ও সংস্কারের উপর তাহার বহুশতাব্দী ব্যাপক ফল কোথায় যাইবে? অদ্যপর্য্যন্ত অনেক বাঙ্গালির মুখে শুনা যায় অহিংসা পরমো ধর্ম্ম। কেহ ভ্রমেও একথা মনে করেন না, এবাক্য হিন্দু শাস্ত্রে নাই, বৌদ্ধ শাস্ত্রে আছে। যদিও চৈতন্য দেবের জন্মের কিছুদিবস পূর্ব্বে বৌদ্ধমত বঙ্গ হইতে উঠিয়া গিয়াছিল, তথাপি বহুকাল প্রচলিত থাকায় লোকে

যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা যজ্ঞার্থে পশুঘাতনং।
অত স্ত্বাং ঘাতয়িষ্যামি তস্মাদ্যজ্ঞে বধো-
ঽবধঃ॥

প্রভৃতি শাস্ত্রীয় মতের উপর গতরাগ হইয়াছিল এবং সর্ব্বজীবে সমদয়া প্রভৃতি নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। সত্যবটে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য সময়ে পান ভোজন সম্বন্ধে যারপর নাই প্রতিবন্ধক ছিল; এবং তাহার অভ্যুদয় হইলে, ধর্ম্মাচরণ ভাণে লোকে স্বতঃই অপরিমিতাচারী হইয়া

‡ কেবল চণ্ডাল কেন চৈতন্য সকলকেও স্বমতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

উঠিয়াছিল। (এই জন্যই তন্ত্রে ঈদৃশ ব্যভিচারের আধিক্য দৃষ্ট হয়।) তথাপি সর্ব্বজীবে সমদয়া প্রভৃতি বৈষ্ণব দিগের প্রধান নীতি† বঙ্গে একদা বৌদ্ধমতাধিক্য থাকার অন্যতর ফল।

যখন বঙ্গদেশের একদিকে পৌত্তলিকতা,* অপরদিকে ইস্লাম ধর্ম্মের একেশ্বর বাদ লোকের মনকে আকর্ষণ করিতেছিল এবং দাক্ষিণাত্য ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বৈষ্ণব মতাবলম্বী রামানুজ আচার্য্য সংস্থাপিত শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় বহুকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমধিক প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, যখন বঙ্গে একদিকে বৌদ্ধ মত প্রচলন থাকার ফলস্বরূপ অনেক উচ্চ নীতি প্রচার হইতেছিল, অপর দিকে মুসলমানদিগের দৃষ্টান্তে ও তন্ত্রের উপদেশে লোকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশতঃ ব্যভিচার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল, তখনই বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মত সূক্ষ্ম ভাবে দুই এক জনের মনে উদয় হইতেছিল। ক্রমে উহা তাঁহাদিগের মনে দৃঢ় হইল এবং তাঁহারা তৎপ্রচার জন্য যত্নশীল হইলেন। কয়েক জন কবি (জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস) এই মতের পক্ষপাতী হইয়া কৃষ্ণ রাধার প্রেম (১) বর্ণন করিতে লাগিলেন। এই সকল কবির লেখা লোকের চিত্তকে বিগলিত করিল। আরও অনেক লোক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। এইরূপে কিছুদিন চলিয়া আসিতে আসিতে, ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য দেবের জন্মের কিছু পূর্ব্বে অনেক প্রকৃত বৈষ্ণব বঙ্গের বিবিধ স্থান বিশেষতঃ নবদ্বীপ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী শান্তিপুর প্রভৃতি আলোকিত করিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতের গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন;

আগে অবত বিলা যে গুরু পরিবার,
সংক্ষেপে কহি যে কহা না যায় বিস্তার।
শ্রীশচী জগন্নাথ শ্রীমাধব পুরী, কেশব
ভারতী আর শ্রীঈশ্বর পুরী ॥

অদ্বৈত আচার্য্য আর পণ্ডিত শ্রীবাস।
আচার্য্য রত্ন বিদ্যানিধি ঠাকুর হরিদাস ॥
শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রী উপেন্দ্র মিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্গুণ প্রধান ॥
সপ্ত মিশ্র তার পুত্র সপ্ত ঋষীশ্বর।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর ॥
জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী পুরন্দর।
নন্দ বসুদেব পূর্ব্বে সদ্গুণ সাগর ॥
তাঁর পত্নী শচী নাম পতিব্রতা সতী।
যাঁর পিতা নীলাম্বর নাম চক্রবর্ত্তী ॥

* হিন্দু ধর্ম্মে একেশ্বর বাদও আছে, কিন্তু তাহা তৎকালে বঙ্গে প্রচলিত ছিল না।

† সংক্ষেপতঃ ঈশ্বরে প্রেম ভক্তি ও জীবে দয়া।

(১) বৈষ্ণবদিগের মূলগ্রন্থ ভাগবত, এ গ্রন্থে কৃষ্ণ রাধিকার প্রেমচ্ছলে ভক্তি-মাহাত্ম্য বর্ণন আছে। অনেক বৈষ্ণব তাহার নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে না পারিয়া কৃষ্ণ রাধার প্রেম বর্ণন শ্রবণই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ জ্ঞান করিল।

রাঢ় দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত গুপ্ত মুরারি মুকুন্দ ॥
অসংখ্য ভক্তের করিয়া অবতার।
শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্র কুমার ॥*

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যখনই কোন দেশে কোন নবীন সত্য প্রচার হয়, বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই তত্তৎ দেশে তাহার সূত্রপাত হয়। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, বিজ্ঞান, রাজনীতি, ধর্ম্ম, সকল বৈষয়িক সত্য প্রচারই এই সাধারণ নিয়মান্তর্গত। ইসার জন্মের পূর্ব্বে জোহান প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রচারক, মার্টিন লুথারের পূর্ব্বে উইক্লিফ প্রভৃতি সংস্কারক, পূর্ব্বসংস্কার যুক্ত স্বাধীনচেতা পণ্ডিত পার্কারের পূর্ব্বে রামমোহনরায় প্রভৃতি আত্মপ্রত্যয় মূলক ধর্ম্ম বাদী এবং চৈতন্যের পূর্ব্বে অদ্বৈতাচার্য্য, ভারতী গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ভূমণ্ডলকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী মহাত্মা যে সত্য প্রচার করিবেন তাহার পথ কথঞ্চিৎ পরিস্কার করিয়া ছিলেন। কেবল ধর্ম্মে কেন? বিজ্ঞানেও অবিকল সেইরূপ হইয়াছে। নিউটানের বহুকাল পূর্ব্বেই লোকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আভাস বুঝিয়াছিলেন। নিউটনের জন্মের পূর্ব্বেই পণ্ডিতবর গালিলীও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়মাদি পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তবে ঐ নিয়ম যে বিশ্বব্যাপী অর্থাৎ যে নিয়মে বৃক্ষ হইতে পত্র স্খলিত হইলে ভূপতিত হয় সেই নিয়মেই সমুদয় বিশ্বের গ্রহ উপগ্রহ যথা স্থানে রক্ষিত হয় একথা নিউটনের পূর্ব্বে কেহ গ্রহণ করিতে পারে নাই। বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটিয়াছিল।

ইহার কারণ কি? কোন মতের প্রথম উদ্ভাবক বা প্রবর্ত্তক কেন তাহা প্রতিপালন করিতে বদ্ধপরিকর হন না? কিজন্য উইক্লিফ রাজা কর্ত্তৃক ধৃত হইলে আপনার মত পোপের বিরোধী নহে এরূপ স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন? পক্ষান্তরে কি জন্য পরবর্ত্তী ঐ মতাবলম্বী কাল্বিন ক্রাম্মোর প্রভৃতি সংস্কারকগণ কোনরূপ অত্যাচারেও পোপের অধীনতা স্বীকার করেন নাই? ইহার কারণ এই যে যখন কেহ প্রথমতঃ কোন নবীন সত্য আবিষ্কার করে, প্রথম সময়ে তাহা তাঁহার মনে অপরিস্ফুট ভাবে অবস্থান করে হয়ত পক্ষাবলম্বী লোক একটীও থাকে না। সুতরাং তদনুযায়ী আচরণ করিতে হইলে; লোকের প্রতিকূলাচরণ একাকী সহ্য করিতে হয়। এদিকে উক্ত সত্য চিরপ্রসিদ্ধ মতবিরোধী হওয়ায় সাধারণ লোকে তৎপ্রতিপালকের উপর যারপর নাই অত্যাচার করে। কিন্তু ঐ সত্য কিছুকাল প্রচারিত হইলে অনেকে উহার উৎকৃষ্টতা অনুভব করিয়া তন্মতাবলম্বী হয় এবং জনসাধারণও স্বাভাবিক সত্যানুরাগবশতঃ কিয়দংশে

* কৃষ্ণ। ইঁহাকে বৈষ্ণবগণ পূর্ণব্রহ্মের অবতার বলেন।

তাহার পক্ষগত হয়। এইজন্য কোন নবীনসত্য প্রচারের কিছু কাল পরে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিলে কৃতকার্য্য হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ, কালে যে রূপ উৎপীড়নের গুরুত্ব ও উৎপীড়কের সংখ্যার হ্রাস হয়, সেই রূপ তন্মতাবলম্বীর সংখ্যা বৰ্দ্ধিত হওয়ায় অনেকে একত্র হইয়া উৎপীড়ন সহ্য করে সুতরাং তাহার ভার অপেক্ষাকৃত লঘু হয়। (একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে দুঃখ ভার একক বহন করা অপেক্ষা দশজনে একত্র হইয়া বহন করা সহজ।) এই জন্যই যথার্থ প্রচারকের পূর্ব্বে তন্মতাবিষ্কারক ও উদ্ভাবক জন্ম পরিগ্রহ করেন।

বস্তুতঃ বিধাতা তাঁহাদিগকে তদ্রূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট করেন না, কিন্তু দেশকাল ও পাত্রানুযায়ী প্রথম উদ্ভাবক আপনার মত সম্যক্‌রূপে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না এবং তাঁহার পর বর্ত্তী শিষ্য সেইমত অশেষবিধ অত্যাচার ও ত্যাগস্বীকার সহ্য করিয়াও জীবনে পরিণত করে। এই জন্য কোন ধৰ্ম্ম সংস্কারক অথবা কোন নবধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের আবির্ভাবের আবশ্যক হইলে, অগ্রে কয়েক জন সাধারণ অথবা সাধারণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ প্রধান লোক জন্মপরিগ্রহ করিয়া তত্তৎ সত্য কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। পরিশেষে একজন অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়া তাহা সাধারণ্যে বিশেষরূপে প্রকাশ করে। পূর্ব্বে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতির জন্ম ও পরে চৈতন্যের জন্ম দ্বারা এই সত্য বিশেষরূপে সপ্রমাণ হইতেছে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শ্রীহট্টে উপেন্দ্র মিশ্র পুরন্দর নামক জনৈক বৈদিক শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার তনয় জগন্নাথ মিশ্র স্বীয় পত্নী শচীর সহিত নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের ক্রমে আট কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া গতাসু হয়। তৎপরে বিশ্বরূপ নামক এক পুত্র জন্মে। বিশ্বরূপের পর শচী আর এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন—ঐ সন্তানই অদ্যকার শিরোণামাঙ্কিত মহাত্মা চৈতন্যদেব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাল্যকাল।

চৈতন্য ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

চৌদ্দশত সাত শকে মাস ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈলা শুভক্ষণ॥
সিংহরাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব শুভক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন॥
এত জানি চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে ভাসে ত্রিভুবন॥
জগত ভরিয়া লোকে করে হরি হরি।
সেইক্ষণে গৌরচন্দ্র ভূমি অবতরি॥

চৈতন্য চরিতামৃত।

চৈতন্যের জন্মকালে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল সুতরাং ভারতের চিরপ্রসিদ্ধ প্রথানুযায়ী জনসাধারণ হরিনাম কীর্ত্তন, ও হরি! হরি! ধ্বনি ও নানারূপ দানধর্ম্ম ও জপ তপ অনুষ্ঠান করিয়াছিল। যদিও এই সকল অনুষ্ঠান অন্য কারণে হইয়াছিল, শিশুর আত্মীয়গণ মনে করিল এরূপ পবিত্র সময়ে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে অবশ্য কোন শাপভ্রষ্ট মহা পুরুষ হইবেক। কালে হয় ত ইহাও চৈতন্যের জীবনকে বিশেষরূপে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। বস্তুতঃ দশ জনে একজন লোকের সুখ্যাতি করিলে, তাঁহার প্রশংসিতগুণ থাক বা না থাক, অন্ততঃ প্রশংসাকারীদিগের সম্মুখে ভাল করিয়া বলা মনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ। অনেক স্থলে প্রশংসিত লোক বস্তুতঃ সে সকল গুণ জীবনে পরিণত করেন। সুতরাং চৈতন্য কালে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে লোকমুখে এই সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া তাহার সার্থকতার জন্য যত্নশীল হইয়াছিলেন তাহাতে বিচিত্র কি? পক্ষান্তরে যাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। একান্ত হৃদয়ে যত্ন করিতে করিতে যথার্থই মানবসমাজে একজন মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি?

অতি প্রাচীনকাল হইতেই, জীবনচরিত লেখকগণ আলোচ্য ব্যক্তির জন্ম মৃত্যু, বাল্যাবস্থা প্রভৃতি ঘটিত নানা রূপ অলৌকিক ঘটনা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যের জীবনচরিত লেখক বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজও এই চিরন্তন পদ্ধতি অতিক্রম করিয়া চলেন নাই। চৈতন্যকে তাঁহার মাতা ত্রয়োদশমাস গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। চৈতন্য ভূমিষ্ঠ হইবার সময়

হরি বলি নারীগণ দেয় হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতূহলী॥
প্রসন্ন হইল দশদিক্ নদীজল।
স্থাবর জঙ্গম * হৈল আনন্দে বিহ্বল॥

চৈতন্য চরিতামৃত।

কথিত আছে শৈশবাবস্থায় চৈতন্যের হস্তপদে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন ছিল। এই সকল চিহ্ন মহাপুরুষের লক্ষণ।

বৈষ্ণবগণ তাহা দেখিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহিণী লক্ষ্মীদেবী নবদ্বীপে আসিয়া এরূপ সুলক্ষণাক্রান্ত শিশু দর্শন করিয়া পরমানন্দিতা হইলেন এবং দীন দুঃখীদিগকে বিস্তর অর্থদান করিলেন। লক্ষ্মীদেবী শিশুর নাম নিমাই রাখিলেন। ডাকিনীর হস্তহইতে শিশুর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত এইরূপ কুৎসিত নাম† রাখা হইয়াছিল।

বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যের বাল্যাবস্থা ঘটিত বিস্তর অলৌ

* কালিদাসকৃত কুমারসম্ভব কাব্য হইতে এই ভাব লওয়া।

† অদ্যাপি অস্মদ্দেশীয় অনেক স্ত্রীলোক মৃত বৎসার সন্তানের এইরূপ শ্রুতিকটু নাম রাখেন।

কিক ঘটনা বর্ণন করিয়াছেন। শৈশবাবস্থায় একদা চৈতন্য গৃহাভ্যন্তরে ক্রীড়া করিতে করিতে মাটি খাইতেছিলেন, ইহা দেখিয়া শচী তাঁহাকে অনুযোগ করিলেন। শিশু বলিল "সমুদয় বস্তুই মাটি, যে হেতু মাটি বিকৃত হইয়া উদ্ভিদাদি হয়। সুতরাং উদ্ভিদাদির ন্যায় মাটি আহার করায় দোষ কি?" শচী বলিলেন "বস্তু মাত্রের স্বাভাবিক ও বিকৃতাবস্থা সমগুণ বিশিষ্ট নহে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া চৈতন্য দৌড়িয়া মাতার অঙ্কে উঠিয়া বলিলেন "মা! আর আমি মাটি খাইব না, আমি তোমার স্তন্যপান করিব।" অন্য দিন এক জন ব্রাহ্মণ জগন্নাথের আলয়ে অতিথি হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ভক্ষ্য দ্রব্য রন্ধন করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া দিলেন, নয়নোন্মীলন করিয়া দেখেন, নিমাই আহার করিতেছেন। জগন্নাথ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পুত্রকে নানারূপ তাড়না করিয়া গলবস্ত্রে ব্রাহ্মণকে পুনর্ব্বার রন্ধন করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া পুনর্ব্বার রন্ধন করিলেন। রন্ধনান্তে যখন পুনর্ব্বার বিষ্ণুকে নিবেদন করিতে বসিয়া চক্ষুমুদিত করিলেন, অমনি নিমাই পুনর্ব্বার আহার করিতে বসিলেন। পুনঃ পুনঃ এইরূপ হওয়ায় ব্রাহ্মণ পরিণামে বুঝিতে পারিলেন নিমাই সামান্য শিশু নহে—বিষ্ণুর অবতার। তখন সানন্দচিত্তে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া ও নিমাইকে নানারূপ স্তবস্তুতি করিয়া বিদায় হইলেন।‡

চৈতন্য বাল্য কালে বড় দুর্দ্দান্ত ছিলেন। স্নান করিতে গিয়া ঘাটে বয়স্যদিগের সহিত কলহ করিতেন ও কুমারী দিগের আনীত দেবপূজার্থ নৈবেদ্যাদি অপহরণ করিয়া আহার করিতেন।

ক্রমে চৈতন্যের বিদ্যারম্ভের কাল উপস্থিত হইল। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে নবদ্বীপনিবাসী প্রসিদ্ধ অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে প্রেরণ করিলেন। তথায়, চৈতন্য স্বাভাবিক বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে অত্যল্পকালেই ব্যাকরণ সমাধা করিলেন।

এদিকে জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈতন্যের অগ্রজ বিশ্বরূপ কৌমারাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। জগন্নাথ বিশ্বরূপের বিবাহের জন্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিশ্বরূপ সংসারে যারপর নাই নির্লিপ্ত ছিলেন এবং সর্ব্বদা মনে২ সন্ন্যাস ধর্ম্মের উৎকর্ষ চিন্তা করিতেন। পিতা বিবাহ দেওয়ার উদ্যোগ করিতেছেন জানিতে পারিয়া, বিশ্বরূপ নিভৃতে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া, জনক জননীকে ত্যাগ করিয়া, আত্মীয় বন্ধু ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত

‡ ভাগবতে কৃষ্ণের বাল্য কাল ঘটিত এইরূপ একটি বর্ণন আছে। হয়ত বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের প্রাধান্য বিস্তার জন্য তাহারই অনুকরণ করিয়াছেন।

হইলেন। বৃদ্ধ জনক জননী অপত্য-বিরহে অনেক রোদন করিলেন। হাঃ! নিষ্ঠুর বিধাত! তোমার অন্তর পষাণ ময়! অন্যথা সৃষ্টিতে কিজন্য একজনের কর্ম্মফল অন্য জনে ভোগ করে; এক জনের কৃত অপরাধ জন্য অন্য জনে দণ্ড পায়।

বৃদ্ধ জনক জননী অনেক রোদন করিলেন। কিন্তু তাহাতে কি হইল? তাঁহাদিগেরই শরীর শুষ্ক হইতে লাগিল। কাল সর্ব্বসংহর্ত্তা। কালে যেমন সুরম্য হর্ম্ম্য ভগ্ন হইয়া ধূলিসাৎ হয়, দিগন্ত-ব্যাপী বৃহৎ রাজ্যের নাম লোপ পায়, সেইরূপ আবার মরুময় স্থান বৃহৎ অট্টালিকাশোভিত হয় এবং অপত্যবিরহ-বিধুর অনেক পরিমাণে শোক বিস্মৃত হইয়া শান্তি লাভ করে। যদি প্রিয়জনবিরহ-শোকের তীব্রতা কালে লঘু না হইত তাহা হইলে সংসারে আর কে সুখ পাইত? কেই বা তাদৃশ শোকভারবাহী জীবনভার বহন করিতে পারিত। কারণ কে না প্রিয়জন হারাইয়াছে? এই কালের মোহিনী শক্তিতে জগন্নাথ ও শচী চৈতন্যের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া বিশ্বরূপের কথা কিয়দংশে ভুলিয়া গেলেন। কেনই বা না ভুলিবেন, চৈতন্যের ন্যায় গুণবান্ এক পুত্র সহস্র পুত্র অপেক্ষা প্রার্থনীয়। এদিকে বালস্বভাব চৈতন্য অপত্য-বিরহবিধুর-জনক-জননীর দুঃখ দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। নানা রূপ সান্ত্বনা বাক্য বলিতে লাগিলেন। এবং স্বয়ং যাবজ্জীবন তাঁহাদিগের চরণ সেবা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

চৈতন্যের বিদ্যাভ্যাস সমাধা হইতে না হইতে জগন্নাথ মিশ্র মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

পিতৃবিয়োগের এক বৎসর পর একদা চৈতন্য চতুষ্পাঠী হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছিলেন এমন সময়ে পথিমধ্যে বল্লভাচার্য্যের কন্যা পরম রূপবতী লক্ষ্মী দেবীকে নয়নগোচর করিয়া বিমোহিত হইলেন। দৈবে বনমালী ঘটক (ইনি বোধ হয় নবদ্বীপে আধুনিক ঘটক দিগের ন্যায় বিবাহের ঘটক ছিলেন) সেই পথে গমন করিতে ছিলেন। ঘটকবর সহজেই চৈতন্যের প্রণয়লক্ষণ বুঝিতে পারিলেন এবং উভয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে উক্ত সংবাদ জ্ঞাত করাইলেন। ত্বরায় মহানন্দে চৈতন্যদেব লক্ষ্মী দেবীর‡ সহিত পরিণয়পাশে বদ্ধ হইলেন।

গুণবতী লক্ষ্মী দেবীকে গৃহে আনিয়া চৈতন্য পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

‡ বৈষ্ণবেরা বলিয়া থাকেন লক্ষ্মী রাধার অবতার স্বরূপ।

ভাবী বসুমতী।

বিশ্ব বিভিন্ন অংশে বিভক্ত অথচ কয়েকটী সাধাবণ নিয়মান্তর্গত। পবিবর্ত্তনশীলতা সাধাবণ নিযম। এই প্রকাণ্ড বিশ্বেব যে দিকেই নেত্রপাত কব এমন কিছুই দেখিতে পাইবে না যাহা এই নিয়মাতীত; তোমার সম্মুখে যে বস্তু বহিয়াছে, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছ, ক্ষয অথবা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। তোমাব সম্মুখে যাহা নাই তাহাবও এই দশা। যদি বল একথাব প্রমাণ কি? সহস্র সহস্র বৎসর সহস্র সহস্র মনুষ্য এইরূপ দেখিযাছে—কেহই ইহাব ব্যভিচাব দেখে নাই, অথবা শুনে নাই। তুমিও আজীবন ইহাই দেখিযাছ এবং শুনিযাছ এবং কখন ইহাব ব্যভিচাব দেখ নাই, অথবা শুন নাই। সুতবাং যাহা কদাপি হব নাই বিশ্বেব নিযন পবিবর্ত্ত না হইলে তাহা কিরূপে হইবে?

তোমাব দেহ প্রতিনিয়ত ক্ষযপ্রাপ্ত হইতেছে, শতবৎসরে আব কিছুই থাকিবে না; তোমাব গৃহ প্রতিনিয়ত ক্ষয প্রাপ্ত হইতেছে, কযেক বৎসরে জীর্ণতানিবন্ধন ভগ্ন হইয়া যাইবে। কেবল সামান্য সামান্য পদার্থ কেন জ্যোতির্ব্বিদেবা অনেক গ্রহ উপগ্রহেরও গতি পরিবর্ত্তন ও ধ্বংস।র্শন কবিযাছেন। আমাদিগেব শাস্ত্রকর্ত্তাবা এই প্রলয়েব কথা অনেক বলিযাছেন। তাহ্রদি গব মতে বসুমতীর প্রলয় হইবে এবং প্রলয় কালে দ্বাদশাদিত্য উদয় হইবে। তোমরা উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত; এ সকল হুট করিয়া উড়াইয়া দেও। যদি শাস্ত্রেব কথা শুনিতে ইচ্ছা না কব, শ্রবণ কব, বিজ্ঞান কি বলে। "নাক্ষত্রিক প্রলয প্রত্যক্ষ বিষয়। কাল্পনিক বা আনুমানিক নহে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে হইতে হর্শেল সাহেব ৪২ বর্জিনিস্‌কে দেখিতে পান নাই। কখন কখন একেবাবে কতকগুলি তাবকা দৃষ্টিগোচর হইযা এক কালেই প্রলীন হইয়াগিয়াছে। এই সকল ব্যাপাব নূতন নহে। অতি প্রাচীন কালেও অনেক পণ্ডিত এরূপ নাক্ষত্রিক প্রলয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ১২০ খৃষ্টাব্দে হিপ্পর্কস এইরূপ একটী প্রলয় প্রত্যক্ষ কবিযাছিলেন। ৩৮৯খৃঃ অব্দে আলফা আকুইলি নামক নক্ষত্রেব নিকট আর এক অভিনব তাবকা হঠাৎ দেখা যায; তাহা তিন সপ্তাহ কাল শুক্রগ্রহেব ন্যায উজ্জ্বল ছিল পরে একেবাবে অদৃশ্য হইল। ১০৬ খৃঃ অব্দে ১০ই অক্টোবর তাবিখে স্বর্ণপুঞ্জেব মধ্যে এক অতীব উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়; তাহা এক বৎসব যাবৎ দেখা গিয়াছিল। ১৬৭০ অব্দে হংস্য পুঞ্জেব শীর্ষ দেশে এক অভিনব নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, তাহা কিছুদিন পরে অদৃশ্য হয়; পুনর্ব্বাব দেখা যায়।

তখন বিবিধরূপ আলোক পরিবর্ত্তন দেখাইয়া দুইবৎসর পরে যে কোথায় গিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই। এপর্য্যন্ত এইরূপে যত নক্ষত্রকে প্রলীন হইতে দেখা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ১৫৭২ খৃঃ অব্দে কাসীও পিয়া নক্ষত্র পুঞ্জের মধ্যে যে এক তারকা দেখা গিয়াছিল, তাহার বিবরণ অধিকতর বিস্ময়কর। সেই নক্ষত্র শীঘ্র শীঘ্র সমধিক ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিতে লাগিল—এমন কি শেষে বৃহস্পতি অপেক্ষাও উজ্জ্বল হইয়াছিল। ক্রমে তাহার জ্যোতির হ্রাস হইতে লাগিল। দাহ্যমান পদার্থের যে সকল বর্ণ পরিবর্ত্তন দেখা যায়, সেই সমস্ত পরিবর্ত্তনই উক্ত নক্ষত্রে ক্রমে ক্রমে লক্ষিত হইয়াছিল এবং একবৎসর চারিমাস পরে স্থান পরিবর্ত্তন না করিয়াই একেবারে অদৃশ্য হইয়াগেল। যে নক্ষত্রদাহন এতদূর হইতে এরূপ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় সে দাহন কিরূপ ভয়ঙ্কর আমাদিগের কল্পনাও তাহা ধারণা করিতে পারে না। আমাদিগের বৃহস্পতি ও মঙ্গল গ্রহদ্বয়ের কক্ষার মধ্যে, কতকগুলিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ আছে। অনেক বিজ্ঞানবিৎ অনুমান করেন, ধূমকেতুর আঘাতে কোন গ্রহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভগ্ন হওয়ায় এরূপ হইয়াছে।"

যখন আমরা বিশ্বের সমুদয় অংশই পরিবর্ত্তনশীল দেখিতেছি, তখন কি মনে করিতে পারি, আমাদিগের অধিষ্ঠানভূতা বসুমতীই এক মাত্র চিরকাল সমান থাকিবে। এই বসুমতীর অতীত কালের ইতিহাস † অনুসন্ধান করিলেও জানা যায় পৃথিবী সৃষ্ট হওয়া অবধি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পৃথিবীর যে আকার আমরা অদ্য দেখিতেছি, ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নিশ্চয় করিয়াছেন তাহা বহুকালে গঠিত হইয়াছে এবং সেই সকল কারণ অদ্যাবধি বিরাজিত থাকায় এক্ষণে যে আকার রহিয়াছে, নিশ্চয় অনুভব হয়, তাহা ভবিষ্যতে থাকিবে না। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ চির উষ্ণ তরল পদার্থের উপর দুগ্ধের সরের ন্যায় আবরণ নিরন্তর পুষ্ট হইতেছে এবং তজ্জন্য পৃথিবীর স্থলভাগও ক্রমশঃ পুষ্টতালাভ করিতেছে। ভূতত্ত্ববিদেরা আরও বলেন আদৌ ভূমণ্ডলে আগ্নেয় গিরির ‡ বহুল পরিমাণে আধিক্য ছিল। সেই সকল আগ্নেয়গিরিসমুত্থিত কর্দ্দম ও ধাতুনিস্রব হইতে স্থলবিভাগ পুষ্টতাপ্রাপ্ত হইয়াছে ও সাগর বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়াছে। পৃথিবী স্তরে স্তরে রচিত। বিভিন্ন স্তর বিভিন্নরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট। যে কারণে এক স্তরের উপর আর এক স্তর সঞ্চারিত হইয়াছে, সেই কারণ অদ্যাবধি বর্ত্তমান থাকায় নিশ্চয় অনু-

† ভূতত্ত্ব বিদ্যা।

‡ একথার প্রমাণ স্বরূপ আমরা এই বলিতে পারি অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে যত আগ্নেয়গিরি ছিল উনবিংশ শতাব্দীতে তাহার অধিকাংশই শীতল হইয়াছে।

ভব হয়, বসুমতীর বর্ত্তমানস্তরের উপর আর কত স্তর হইবে তাহার অন্ত নাই। বস্তুত: কারণের বিনাশ না হইলে কদাপি কার্য্যের বিনাশ হইবে না। সুতরাং এই সকল কারণ বর্ত্তমান থাকিতে কদাপি বসুমতীর পরিবর্ত্তনশীলতার অন্যথা হইবে না।

(২) সর্ব্বদেশ প্রচলিত জনশ্রুতি বলিয়া থাকে এক কালে পৃথিবী একেবারে জলমগ্ন হইয়াছিল। একথা সম্পূর্ণ অসম্ভব বোধ হয় না। যদি কোন কালে কোন কারণ বশতঃ এরূপ তাপাধিক্য হয় যে পৃথিবীতে যত তুহিন সঞ্চিত আছে তাহা এককালে বিগলিত হইয়া যায়, তাহা হইলে হয়ত পৃথিবীর অতি উচ্চতম স্থলভাগও জলমগ্ন হইয়া যাইবে। যদিও এরূপ তাপাধিক্যের কোনই সম্ভাবনা নাই যে হেতু তাপাধিপতি সূর্য্য প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী ক্রমশঃ শীতল হইতেছে। তথাপি ভবিষ্যতে ক্রমশঃ চাপ ও তদুপরি বর্ত্তমান সময়ের সূর্য্যরশ্মিপতন বশতঃ কোন বৃহৎ তুহিনখণ্ড বিগলিত হইয়া এক দেশ বা নগর ধ্বংস করিতে পারে একথাতে কিছুই বৈচিত্র্য নাই।*

(৩) হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বতোপরি অদ্যাবধি সাগরবাসী প্রাণীর অবশেষ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হওয়ায় বোধ হয় পৃথিবীর উচ্চতম প্রদেশ হিমালয়ও এক কালে সাগরগর্ভস্থিত ছিল। বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিৎ এমণ্ডিলক বলেন জলপ্লাবনে পৃথিবীর সকল অংশ জলমগ্ন হয় নাই, কেবল জলভাগ স্থল ও স্থল ভাগ জলে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

(৪) ভূমিকম্প অথবা কোন কারণ বশতঃ জোয়ারের আধিক্য হইলে সময়ে সময়ে সাগর এত স্ফীত হইয়া উঠে যে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম নগর সমুদয় ধ্বংস হইয়া যায়। এরূপেও এক্ষণে বসুমতীর যে আকার আছে তাহার অনেক পরিবর্ত্ত হইতে পারে।

বিশ্বের কোনই নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয়নাই সুতরাং একথা কিরূপে বলা যাইতে পরে এরূপ জলপ্লাবন আর হইবে না। যদি এরূপ জলপ্লাবন পুনর্ব্বার হয় তাহা হইলে বসুন্ধরার বর্ত্তমান অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হইবে।

(৫) যে বায়ু প্রবাহিত হয়, যে তুহিন সঞ্চিত হইয়া পরিণামে নদীরূপে পরিণত হয় অথবা বাষ্পাকারে আকাশে উড্ডীন হইয়া করকা বা বৃষ্টি রূপে ভূপতিত হয়, যে নদী নিম্নস্থ ও সম্মুখস্থ বালুকা ও কর্দ্দম আত্মসাৎ করিয়া ক্রমশঃ প্রবাহিত হইতে হইতে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়, যে তরঙ্গমালান্বিতা নদী প্রতিনিয়ত তীরকে সবেগে আঘাত ক-

* সারজন হর্শেলের পিতা পূর্ব্বসূর্য্যের তাপাধিক্য ছিল একথা বিশ্বাস করিতেন। পুত্রও বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগে পিতার বাক্য অসম্ভব নহে একথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন।

রিয়া † সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, তাহাতে প্রতিনিয়তই বসুমতীর এক স্থলের মৃত্তিকা অন্যস্থলগত হয়। কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বৃহৎ বৃহৎ নদীর তীরে এবং সাগরের তীরে এইরূপে কত পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে ‡ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বের বসুমতীসহ আধুনিক বসুন্ধরার তুলনা করিলে (এই সকল কারণ বশতঃ) অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। যদি প্রতিদিন বসুমতীর একএকতিল পরিবর্ত্ত হয়, কাল অনন্ত এবং বসুমতী সীমাবদ্ধ এই জন্য নিশ্চয়ই এক কালে বসুমতী সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইবে। এক দিন বা দুইদিনে হইবে না। এক সহস্র বা দুই সহস্র বৎসরে হইবে না। কিন্তু কোটি কোটি বৎসর গেলেও কালের সীমা হইবে না। সুতরাং এককালে বসুমতীর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত সম্ভব নয় *।

† এই জন্য পদ্মানদী প্রভৃতি বৃহৎবৃহৎ নদীর তীরে নিয়ত জমি পয়োস্থি ও শিকস্তি হয়।

‡ বাদা, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, প্রভৃতি ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

* ভাবী বসুমতীর জীব জন্তুর প্রকৃতি বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা থাকিল।

সূর্য্যমণ্ডল।

"—তৎ সবিতু র্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥"

অসীম বিশ্ব মণ্ডলে যতকিছু পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় চিত্তাকর্ষক আর কিছুই নাই। অতি প্রাচীন কালাবধি ইহা লোকের মনঃ ও নেত্র আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন আর্য্যগণ, প্রাচীন পারসিকগণ—প্রায় সমস্ত প্রাচীন জাতিই অত্যুজ্জ্বল প্রভাপুঞ্জ নিরীক্ষণ করিয়া ইহাকে ঈশ্বরের প্রতিরূপ স্বীকার করিয়া উপাসনা করিতেন। বাস্তবিক, যদি প্রাকৃতিক কোন পদার্থদ্বারা জগদীশ্বরের মহিমা ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা হয়, তবে সূর্য্যই সর্ব্বপ্রধান। সুতরাং সরলচিত্ত প্রাচীন লোকেরা সূর্য্যকে স্রষ্টার প্রতিরূপ কল্পনা করিয়া উপাসনা করিতেন, তাহা বড় বিস্ময়কর নহে।

এরূপ অতীব বিস্ময়কর সূর্য্য সম্বন্ধে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের মতানুসরণ করিয়া কতকগুলি কথা বলিব।

সুতপ্ত সোণার থালার ন্যায় গোল সূর্য্য প্রতি দিন আকাশমার্গে গমন করিয়া আমাদিগকে কিরণ দান করিতেছে, ইহা সকলেই দেখিতেছেন। এই সূর্য্য আয়তনে যে সৌরজগৎস্থ গ্রহ উপগ্রহগণ অপেক্ষা বড়, তাহা আজি কালি সামান্য পাঠশালার ছাত্রেরাও অবগত আছে। সূর্য্যের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাস অপেক্ষা ১১১গুণ বড়; অর্থাৎ তাহার পরিমাণ ৮৮২০০০ মাইল। এই পরিমাণের স্থান কতখানি, তাহা বোধ হয় এইরূপে সহজে বুঝা যাইতে পারে। কোন রেলগাড়ী যদি প্রতি ঘণ্টায় ৩০ মাইল হিসাবে চলে, তবে উক্ত গাড়ির সূর্য্যমণ্ডলের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত যাইতে তিনবৎসর সাতমাসেরও অধিক সময় লাগিবে। কিম্বা যদি পৃথিবীকে লইয়া সূর্য্যমণ্ডলের ঠিক মধ্যস্থলে রাখা যায়, তবে পৃথিবীর চারি পার্শ্বে সূর্য্যমণ্ডলের এতস্থান থাকিবে, যে এক্ষণে চন্দ্র পৃথিবী হইতে যত দূরে থাকিয়া পৃথিবীকে বেষ্টন করিতেছে, তত দূরে থাকিয়া বেষ্টন করিলেও, চন্দ্রের কক্ষার বহিঃস্থ স্থান, চন্দ্র হইতে পৃথিবীর দূরত্ব অপেক্ষা অতি অল্প কম হইবে।

সূর্য্য পৃথিবীর ন্যায় গোলাকার; কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক বড়। দূরবীক্ষণ সাহায্যে সূর্য্যের উপরিভাগে কতকগুলি অস্থির কৃষ্ণচিহ্ন দেখা যায়। সেগুলি সূর্য্যমণ্ডলের একপার্শ্ব হইতে অন্যপার্শ্বে গমনকরে। তাহাতে জানা যায়, যে গ্রহ উপগ্রহগণের ন্যায়, সূর্য্যও আপনার মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তন করে। এরূপ একবার আবর্ত্তন করিতে আমাদের ২৫দিন পরিমাণ সময় লাগে।

সূর্য্য তাপ আর আলোকের আকর। সূর্য্যমণ্ডল হইতেই সৌরজগৎস্থ গ্রহ ও চন্দ্রগণ তাপ আর আলোক পায়। পৃথিবীর যে পার্শ্ব যখন সূর্য্যাভিমুখে থাকে, তখন সেই পার্শ্ব তাপ আর আলোক পায়; আর তাহার বিপরীতদিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। এই আলোক ও অন্ধকারের নামান্তর দিন ও রাত্রি। সূর্য্য হইতে পৃথিবী উপরে নিপতিত তাপ আর আলোকের পরিমাণ নির্ণয় করিয়া একজন পণ্ডিত কহিয়াছেন, যে কোন স্থানে ৫৫৬৩টা মমবাতি একসঙ্গে জ্বালিলে, তাহার একফুট দূরে যত আলো হয়, সূর্য্য হইতে পৃথিবীর উপরে লম্বভাবে পতিত রশ্মির আলোক পরিমাণ তত। আর একটী মাত্র বাতি জ্বালিলে, তাহার ১২ফুট দূরে যে আলো হয়, চন্দ্রালোকের পরিমাণ তত; সুতরাং চন্দ্রালোক অপেক্ষা সূর্য্যালোক প্রায় ৩০০০০০ গুণ অধিক।

সূর্য্য অপরিমিত প্রচণ্ড তাপের আধার। সূর্য্যের হ্রাসবৃদ্ধি নাই; সূর্য্যমণ্ডলে দিবস রজনীরূপ আলোক ও অন্ধকারের পরিবর্ত্তন ঘটে না; ঋতু পরিবর্ত্তন নাই; এবং স্থল জলাদিরূপ কোন বিভাগ নাই। তাপের আধিক্য এত যে কোন প্রকার কঠিন পদার্থ, স্বীয় কাঠিন্য রক্ষা করিতে

পারে না। সোণা, প্লাটিনম, বা অন্য কোন কঠিন ধাতু সূর্য্যমণ্ডলে নীত হইলে, বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে। সূর্য্যমণ্ডলের প্রতিবর্গ ফুট হইতে এত তাপ নির্গত হয়, যে তাহা অতি প্রচণ্ডতম কৃত্রিম অগ্নিকুণ্ডের প্রতি বর্গফুট হইতে নির্গত তাপের সাতগুণ অধিক। পৃথিবী সূর্য্যাভিমুখে ১২ ঘণ্টা কাল মাত্র থাকে; আর বাকি ১২ ঘণ্টা শীতল হইতে থাকে; এবং সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় ৯৫,০০০০০০মাইল, (দূরত্ব অনুসারে তাপের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তাহা এস্থলে স্মরণ করা উচিত;) তথাপি পৃথিবীর উপরিভাগের প্রতিবর্গ ফুটে বার্ষিক এত তাপ পড়ে, যে সেই তাপে ৫৫০০ পাউণ্ড বরফ দ্রব হইতে পারে।

সূর্য্যের ভৌতিক রচনা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের নানা মতভেদ আছে। তাঁহাদের সেই মতগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—এক মতের প্রথম প্রচারক গালিলীয়, এবং প্রধান সমর্থনকারী কার্চহফ। আর দ্বিতীয় দলের প্রধান নেতা সার উইলিয়ম হর্শেল। আমরা এইক্ষণে বলিয়া রাখিব, যে অধুনাতন নব্যপণ্ডিতগণ পুনরায় সূর্য্যমণ্ডল বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া,উৎকৃষ্টতর যন্ত্রের সাহায্যে এবং উৎকৃষ্টতর গণনাদি দ্বারা যেসকল নূতন মত প্রচার করিতেছেন, তাহাতে ভবিষ্যতে উপরোক্ত দুইটীমতের একটীও যে প্রচলিত থাকিবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। যাহা হউক, আমরা সার উইলিয়ম হর্শেল প্রচারিত মতের কথাই সংপ্রতি বলিব। পরে নূতন যে সকল মত প্রচারিত হইতেছে, তাহারও কথা কিছু বলা যাইবে। সার উইলিয়মের মতে সূর্য্য তেজোময়; কিন্তু তদন্তর্গত সমুদায় পদার্থ তেজোময় নহে। স্থির হইয়াছে যে সূর্য্যের শরীর তেজোময় নয়; তাহা অন্ধকারসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ গোলক। তাহার দুইটী আবরণ আছে। তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ ঠিক সূর্য্য শরীরের উপরিভাগস্থ আবরণটীই তেজোময়। এই তেজোময় আবরণ কথন কথন ছিন্ন হইয়া যায়; সেই সময়ে সেই ছিদ্রান্তরাল দিয়া সূর্য্যের প্রকৃত কৃষ্ণবর্ণ শরীর দেখা যায়। এই কারণে সূর্য্যশরীরকে কৃষ্ণ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সূর্য্যের উপরিভাগে পরিদৃশ্যমান যে সমস্ত কৃষ্ণচিহ্নের কথা বলা গিয়াছে, সেগুলি সূর্য্যাবরণের ছিদ্রান্তরাল দিয়া দৃশ্যমান সূর্য্যশরীরের অংশ মাত্র। দূরবীক্ষণ দ্বারা সূর্য্যকে দেখিলে, তাহার উপরিভাগে এক অথবা ততোধিক কাল দাগ দেখা যায়। কথন২ এরূপ কতকগুলি দাগ একস্থানে পুঞ্জীকৃত দেখা যায়। তথন চাই কি সহজ চক্ষুতেও সেগুলিকে দেখা যাইতে পারে। একখণ্ড কাচকে দীপশিখাতে তাতাইয়া তাহাতে কালী পড়িলে, তাহার ভিতর দিয়াও সূর্য্যকে দেখা যাইতে পারে। অথচ চক্ষুর কোন কষ্ট হয় না। এই কৃষ্ণ দাগ সকলের

কৃষ্ণত্ব প্রায় মধ্যস্থলে সমান থাকে; কিন্তু তাহার পার্শ্বের কৃষ্ণত্ব তত থাকে না। যখন এই কাল ছিদ্রসকল সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যস্থলে দেখা যায়, তখন উক্ত ছিদ্র বেষ্টনকারী ঈষৎ কৃষ্ণস্থান সকলকে গোলাকার এবং সর্ব্বত্র সমবিস্তৃতি বিশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন সে গুলি সূর্য্যের পার্শ্বে গিয়া পড়ে, তখন সেই অল্প কৃষ্ণ পার্শ্বের বহির্দ্দেশ সুস্পষ্ট দেখা যায় না; এবং তাহার ছায়াতে কৃষ্ণতম অংশও আবৃত হইয়া পড়ে। সর উইলিয়ম হর্শেল এরূপ একটী কৃষ্ণ চিহ্ন দেখিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে এবিষয় ভালরূপ বুঝা যাইতে পারে;—"১৩ অক্টোবর ১৭৯৪। গত দিবস সূর্য্যমণ্ডলে আমি যে চিহ্নটী দেখিয়াছিলাম, অদ্য তাহা কিনারার এত নিকটস্থ হইয়াছে, যে তাহার পশ্চাদর্দ্ধের উচ্চদিকে সমস্ত কৃষ্ণতম অংশটুকুকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে; তবুও সেই গহ্বরটীকে দেখা যাইতেছে, এত সুন্দর দেখা যাইতেছে যে কৃষ্ণতম চিহ্নের নিম্নে এবং কালীম পার্শ্বদেশের উচ্চতা স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে।"

অপিতু এই ছিদ্র সমূহকে সূর্য্যমণ্ডলের একস্থানে সর্ব্বদা দেখা যায় না। তাহাদের স্থান পরিবর্ত্তন ঘটে। সূর্য্যের যে অংশ বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বে ৩০ ডিগ্রির মধ্যগত, সেই অংশেই এই চিহ্নগুলিকে সচরাচর দেখা যায়।—এই অংশের মধ্যে সেগুলি বিচলিত হইয়া বেড়ায়। অপর ইহারা সময়ে২ স্বস্ব আকারও পরিবর্ত্তন করে।—প্রতি ঘণ্টায় এপ্রকার আকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যেখানে দুঃসহ চাক্‌চিক্যময় জ্যোতিঃ পরিপূর্ণ ছিল, সেখানে হঠাৎ একটী ছিদ্র উৎপন্ন হয়। সেই ছিদ্র ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, পুনরায় কুঞ্চিত হইয়া ছোট হইয়া যায়; এবং শেষে অদৃশ্য হইয়া পড়ে। কখন কখন এইরূপ অদৃশ্য হইবার পুর্ব্বে একটী রন্ধ্র ভাঙ্গিয়া গিয়া, ছোট২ কতকগুলি রন্ধ্র হইয়া পড়ে। এইরূপ আকৃতিপরিবর্ত্তন দ্বারা এই অনুমান হয়, যে তাহারা তরল পদার্থ হইতে উৎপন্ন। কখন২ কোন ছিদ্রের সীমা বৃদ্ধি পাইয়া ১০০০ মাইল বেগে অন্য কোন রন্ধ্রের নিকটবর্ত্তী হয়। তরল পদার্থ নহিলে আর কোন পদার্থের এরূপ গতি অসম্ভব।

সূর্য্যের বিষুব রেখার উভয়পার্শ্বস্থ অংশে এইরূপ গোলমাল দেখিয়া এই অনুমান করা যায়, যে সূর্য্যের গতির সহিত উক্ত চিহ্ন সকলের উৎপত্তির অতি নিকট সংস্রব আছে। কেন না কোন আবর্ত্তনকারী গোলকের মধ্যস্থলের পদার্থ সকল সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলবেগে আবর্ত্তন করে। সুতরাং সেই আবর্ত্তনের ফল গোলকের মধ্যস্থলেই অধিক পরিমাণে দেখা যায়। এই জন্য এরূপ অনুমান করা যায়, যে পৃথিবীর উষ্ণ কটীবন্ধের অন্তর্গত প্রদেশসমূহ যেরূপ মধ্যে২ প্রচণ্ড বাত্যাতাড়িত হইয়া থাকে

সেইরূপ সূর্য্যেরও মধ্যস্থলে মহা প্রচণ্ড সৌরবাত্যা সকল উত্থিত হইয়া, তাহার (সূর্য্যের) উপরিভাগের আবরণকে স্থানে২ ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়; এবং সেই কারণে ঐসকল চিহ্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহাদের ভিতর দিয়া সূর্য্যের নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ শীতল শরীর দেখা যায় বলিয়া, ঐ ছিদ্রসকল কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বোধ হয়। পণ্ডিতেরা জ্যোতির্ম্ময় আবরণকে বাষ্পাকৃতি তরল পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন। সেই আবরণের উপরিভাগ সর্ব্বত্র সমানভাবে উজ্জ্বল নহে। রন্ধ্রস্থ স্থান সকল অধিকতর উজ্জ্বল রেখাদ্বারা পরিবেষ্টিত। এই রেখানিচয় আবার বক্রাকৃতি এবং শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। এই রেখাগুলিকে কেহ২ জ্যোতির্ম্ময় আবরণের প্রবলতর তরঙ্গমালা বলিয়া জ্ঞান করেন। সূর্য্যমণ্ডলে কি মহা প্রচণ্ড অদ্ভুত আন্দোলনই ঘটিয়াছে!!

পৃথিবী যেমন বায়ুরদ্বারা পরিবেষ্টিত, সূর্য্যও সেইরূপ আর একটী অসম্পূর্ণ স্বচ্ছ বাষ্পাকৃতি পদার্থ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই দ্বিতীয় আবরণটী প্রথম আবরণের উপরিভাগে থাকিয়া সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া আছে। তাহাকে "সৌরবায়ু" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সম্পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময় এই অর্দ্ধস্বচ্ছ সৌরবায়ু সূর্য্যের চারিদ্দিকে প্রতিভাত হয়। এই বায়ু আছে বলিয়াই, সূর্য্যের মধ্যস্থল অপেক্ষা চারিপার্শ্ব অপেক্ষাকৃত অল্প তেজোময় দেখায়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে কার্চ্চহফ উপরোক্ত মতের বিপরীতবাদী। তিনি বলেন, সূর্য্যের শীতল শরীর পরিবেষ্টন কারী এপ্রকার প্রচণ্ডতম উজ্জ্বল সৌর আবরণের অস্তিত্ব অনুমান করা, কেবল অলীক কল্পনা মাত্র; কেন না, তাহা ভৌতিক নিয়মের বিপরীত। তিনি আপনার মত সমর্থনের জন্য যাহা বলেন তাহার সারমর্ম্ম এই;—সৌর কৃষ্ণচিহ্ন সকলের উৎপত্তি আদির কারণ বুঝাইবার জন্য সূর্য্যের ভৌতিক রচনাসম্বন্ধে উপরোক্ত যে মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অভ্রান্ত ভৌতিক নিয়মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। এমন কি যদিও উপরোক্ত মতে কৃষ্ণচিহ্ন সকলের উৎপত্তি ভিন্ন অন্য কোন কারণ আমরা না দেখাইতে পারি, তথাপি সূর্য্যের ভৌতিক গঠন সম্বন্ধে উক্তমত কখনই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। উক্ত মতাবলম্বীদিগের কল্পিত জ্যোতির্ম্ময় আবরণ যদি বাস্তবিকই থাকে, তবে তাহার তেজঃ অবশ্য চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইবে; সূর্য্যের শীতল শরীরের দিকেও যেমন যাইবে, বহিঃস্থ সৌরজগতের দিকেও তেমনই ভাবে আসিবে। তাহা হইলে প্রকৃত সূর্য্য শরীর নিজে শীতল এবং যত অধিক কেন হউক না, শীতলতম আবরণে আবৃত থাকিলেও, কালে উক্ত আবরণ এবং সূর্য্যশরীর উত্তপ্ত হইয়া, তেজঃ এত অধিক হইবে, যে সূর্য্যশরীর জলদগ্নিবৎ

উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে। সুতরাং শীতল অন্ধকারময় সূর্য্যশরীর জলন্ত অনলবৎ তাপ আর আলোক বিকীরণ করিবে। ইহা অসম্ভব।

বড় বড় পণ্ডিতগণের এরূপ বিবদমান মত সমূহ পাঠ ও আলোচনা করিলে, মন কোনটী সত্য কোনটী মিথ্যা, তাহা ভাবিতে২ বিচলিত হয়। বাস্তবিকও আমাদের সৌরজগতের পরিচালক সূর্য্য অতি প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি সমভাবে বিস্ময়কর হইয়া রহিয়াছে। তাহার মধ্যে অত্যদ্ভুত কি সকল ভৌতিক কাণ্ড চলিতেছে এবং তাহার শারীরিক রচনাদি কি প্রকার, তাহার ধ্রুব ও অভ্রান্তমত অদ্যাপি প্রচারিত হয় নাই। উপরে যে দুই মতের কথা বলা গেল, সংপ্রতি আর একজন পণ্ডিত আবার সেই দুই মতই খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; এবং যদিও আধুনিক পণ্ডিতবর্গ প্রথমে তাঁহার নবপ্রচারিত মতে বিশ্বাস করিতে কিছু কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আবার অনেকে তাহাতে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছেন। পণ্ডিতবর ন্যাসমিথ বলেন, যে সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় আবরণ উইলো পত্রাকৃতি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থে বিরচিত। উক্ত পত্রাকৃতি পদার্থসকল অনবরত সূর্য্যশরীরের উপরিভাগে নৃত্য করিতেছে, এবং পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, সমস্ত সূর্য্যশরীরকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এই বিচিত্র পত্রাকৃতি পদার্থ গুলিকে, যেখানে আলোকরশ্মি কৃষ্ণচিহ্ন সকলের মধ্য দিয়া সেতু আকারে পড়িয়া থাকে, সেইখানে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। আবার সেগুলিকে অতীব বিস্ময়জনক প্রচণ্ডবেগে নাচিতে এবং পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইতে দেখা যায়। এই নূতন আবিষ্কৃত পদার্থসমূহের উৎপত্তি ও রচনা সম্বন্ধে কোন কথা কল্পনাও বলিতে সাহস করে না।†

† "Mr. Nasmyth (1862) described the spots as gaps or holes, more or less extensive in the luminous surface or photosphere of the sun. These exposed the totally dark bosom or nucleus of the sun. Over this appears the mist surface; —a thin, gauze—like veil spread over it. Then came the penumbral stratum, and, over all, the luminous stratum, which he had the good fortune to discover was composed of a multitude of very elongated, lenticular-shaped, or, to use a familiar illustration, willow-leafshaped masses, crowded over the photoshere, and crossing one another in every possible direction ......These elongated, lens-shaped objects he found to be in constant motion relatively to one another. They sometimes approached, sometimes receded, and sometimes they assumed a new angular position, by one end either maintaining a fixed distance or approaching its neighbour, while at the other end they retired from each other. These objects, some of which were as large in superficial area as all Europe, and some even as the surface of the whole earth, were found to shoot in thin streams across the spots,......sometimes by crowding in on the edges of the

সম্পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময় সূর্য্যমণ্ডলের বহির্দ্দেশে যে সুন্দর লোহিত বর্ণ উচ্চ প্রতিকৃতি সকল দেখা যায়, এবং যাহারা কখন কখন সূর্য্যের শরীরের উপরিভাগে ৪০ সহস্র মাইল পর্য্যন্ত উচ্চে উঠিয়া থাকে, সূর্য্যের ভৌতিক গঠন সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যত মত প্রচারিত হইয়াছে, উক্ত শোণিতবর্ণ আকৃতিসমূহের উৎপত্তির, সেই সকল মতের সহিত কোন রূপে সামঞ্জস্য হয় না। সূর্য্যমণ্ডল কত আশ্চর্য্য অপরিজ্ঞাত কাণ্ডেরই আকর!!

ক্রমশঃ

spot they closed it in, and frequently at length thus obliterated it. These objects were of various dimensions, but in length generally were from ninety to one hundred times as long as their breadth at the middle or widest part."—*Meeting of the British Association—1862.*

আত্মাভিমান।

আপনাকে বড় জ্ঞানই আত্মাভিমান। কেহবা আপনাকে ধনে বড় বিবেচনা করিয়া অভিমানী হয়েন; কেহবা আপনাকে মান সম্ভ্রমে বড় বিবেচনা করিয়া অভিমানী হয়েন; কেহবা আপনাকে বিদ্যা বুদ্ধিতে বড় বিবেচনা করিয়া অভিমানী হয়েন; কেহবা আপনাকে ক্ষমতাতে বড় বিবেচনা করিয়া অভিমানী হয়েন; কেহবা আপনাকে ধর্ম্মেতে বড় বিবেচনা করিয়া অভিমানী হয়েন; এবং কেহবা আপনাকে মদ্যপান অথবা অন্য কোন অসৎ কার্য্যে বড় বিবেচনা করিয়া অভিমানী হয়েন। লোকে যে রূপ সৎকার্য্যের জন্য অভিমানী হয় আবার সেই রূপ অসৎ কার্য্যের জন্যও অভিমানী হয়। আমাদিগের উপস্থিত প্রস্তাবে বিবেচ্য এই যে আত্মাভিমান হইতে কিরূপ ফলোৎপত্তি হয়—আত্মাভিমান কি সকল প্রসূ, অথবা আত্মাভিমান হইতে মনুষ্য জাতি অবনত হইতেছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে আপনাকে বড় জ্ঞানই আত্মাভিমান। আপনাকে বড় বিবেচনা করিলে, তদনুযায়িক আচরণ করিতে প্রয়াসী হওযা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। তবে যিনি যে বিষয়ের অভিমানী তিনি তদ্বিষয় রক্ষার্থেই চেষ্টা করেন।

১ ধনাভিমান।

ধনাভিমানী লোক কি রূপে আপনার ধন বৃদ্ধি হইবে তদ্বিষয়ে যত দূর যত্নশীল হয়েন বা না হয়েন কিরূপে ধনগৌরব বৃদ্ধি হইবে অর্থাৎ কিরূপ আচরণ করিলে লোকে ধনী বলিয়া গৌরব করিবে তাহার প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি করিয়া চলেন।

ধন শব্দের অর্থ কি। যত্নলব্ধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য অথবা যাহার বিনিময়ে যত্নলব্ধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাকে ধন বলে। কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত পর্য্যন্ত সমুদয়ই ধনসাপেক্ষ। এইজন্যই লোকে ধনের জন্য লালায়িত। পক্ষান্তরে যাহার অধিক ধন থাকে, লোকে ধনপ্রাপ্তি আশয়ে তাহার বশীভূত হয়। এতদ্ব্যতীত ধন থাকিলে লোকের গৃহাদির এরূপ শোভা হয় যে স্বতঃই তাহার বাহ্যিক সৌন্দর্য্য চিত্তকে হরণ করে। ধনশালী লোক যে যে কারণ বশতঃ লোকের প্রীতিভাজন হয়, তাহা ব্যয়মূলক। * লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইবার আশয়ে ধনাভিমানী লোক ব্যয়শীল হয় এবং তদ্দ্বারা দরিদ্র আত্মীয় বন্ধু, শিল্পী ভিক্ষুক এবং সময়ে সময়ে জন সাধারণে যারপর নাই উপকৃত হয়। বস্তুতঃ এই শ্রেণীস্থ লোক কখন নিতান্ত অসাধ্য না হইলে ব্যয়কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং জন সাধারণে তাঁহার হস্তে নানা রূপ উপকার লাভ করে। পৃথিবীতে যত সৎকার্য্য সংস্থাপিত † হইয়াছে তাহার অনেক কারণ সত্ত্বেও ধনাভিমান অন্যতর।

সংসারে সকল বস্তুরই দুই দিক আছে ধনাভিমানের অশেষগুণ সত্ত্বেও দুই একটী কুফল দৃষ্টি হয়;

(১) অবস্থাতীত ধনাভিমান বশতঃ অনেক সময়ে লোকে কুকর্ম্মাসক্ত হয়। এই জন্যই লোকে "গরু মেরে বামুনকে জুতো দান করে।" অভিমান বশতঃ লোকে কতকগুলিন কার্য্য অবশ্যকর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া, তদনুরূপ অবস্থা না থাকিলে, অর্থের জন্য প্রায় কোন রূপ অসৎ কার্য্য করিতেই কুণ্ঠিত হয় না। অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন জমিদারের বংশস্থ কেহ অপেক্ষাকৃত দুরবস্থাগ্রস্ত হইলে যে প্রজাপীড়ক হয়, ইহাই তাহার অন্যতর কারণ।

(২) ধনাভিমান জন্য অনেক সময়ে লোকে অবস্থাতিরিক্ত ব্যয় করে এবং ঋণগ্রস্ত হইয়া পরিণামে সর্ব্বস্বান্ত হয়। এইরূপে অস্মদ্দেশীয় কত ধনশালী পরিবার যে দরিদ্র হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বস্তুতঃ আমাদিগের দেশে যত ধনশালী বংশ দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই আধুনিক। প্রাচীন ধনী

* যাহার গৃহে ধন প্রোথিত থাকে, তাহার দ্বারা সমাজে কেহই উপকৃত হয় না। সে যেমন দানাদি করে না, সেইরূপ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ অথবা অন্য কোন শিল্পজাত পদার্থ দ্বারা গৃহ অথবা শরীরের শোভা সম্বর্দ্ধন জন্য যত্ন করে না। এরূপ প্রকৃতির লোক ধনের অভিলাষ করে না। লোকে তাহাকে ধনশালী বলিলে যারপর নাই চিন্তিত হয়, পাছে দরিদ্র আত্মীয় কুটুম্ব অথবা ভিক্ষুক ধন প্রার্থনা করে, কিম্বা চৌরাদি তাহা অপহরণ করিয়া লয়।

† এবিষয় যশোভিমান বর্ণন সময়ে সম্যক্ বিবৃত হইবে।

সন্তানগণ প্রায় দরিদ্র হইয়াছেন। ইহার অশেষ কারণ সত্বেও ধনাভিমানমূলক কার্য্য অন্যতর ও প্রধানস্থলীয়।* অধুনা আমাদিগের দেশে ইংরাজী সভ্যতার প্রভাবে ধনসহ প্রধানতঃ মান সম্ভ্রমাদি যুক্ত হওয়ায় লোকে আয়াতিরিক্ত ব্যয় করিয়া থাকে। এই জন্যই যাঁহার পিতা পিতামহ মাসিক একশত* টাকা আয় করিয়া ছয় আনার চটী ও চৌদ্দ আনার কাপড় পরিধান করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বাস করিতেন, তাঁহার পুত্র ৩।৪ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া আশৈশব বিংশতি বৎসর কালেজে ইংরাজি অধ্যয়ন করিয়া মাসে ৪০।৫০ টাকা আয় করেন এবং ৫৲ টাকা মূল্যের বিনামা ও দশ টাকা মূল্যের বস্ত্র পরিধান করিয়াও সন্তুষ্টচিত্ত হইতে পারেন না। এই জন্য বর্ত্তমান বংশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় কেহই সঞ্চয়শীল নহে, তন্নিবন্ধন অনেক সময়ে অনেক ক্লেশ ও যন্ত্রণা সহ্য করে এবং সঞ্চয়শীলতা হইতে যে মহান উপকার সকল সাধিত হয় তাহা হইতে একেবারে বঞ্চিত হয়। বস্তুতঃ বিবেচনা করিলে বর্ত্তমান বংশীয় লোক ধনগৌরব করিয়াই নষ্ট হইতেছে। আমাদিগের আয় অতি অল্প, তথাপি সাহেবদিগের সহিত বাহ্যিক আড়ম্বরে সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করি।

(৩) ধনাভিমানীর মনে সুখ নাই। সর্ব্বদা ধনগৌরব লাভের জন্য ব্যস্ত। এক দণ্ড সুখে কালাতিপাত করিতে পারে না। প্রচুর আয়বান্ না হইলে সর্ব্বদা ঋণগ্রস্ত থাকে এবং তন্নিবন্ধন অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করে। প্রাচীন ধন-শালী ভগ্নাবস্থ লোক ও আধুনিক শিক্ষিত যুবক উভয়েই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

(৪) এই ধনগৌরবাকাঙ্ক্ষা বশতঃ অনেক সময়ে আধুনিক লোকে, যেমন লোকের নিকট অধিক আয়বান্ বলিয়া পরিচয় দেওয়ার জন্য ঋণ করিয়াও বাহ্যাড়ম্বর করে, সেইরূপ আবার কখন কখন অবস্থা সম্বন্ধে অনৃত বাক্যও প্রয়োগ করে।

এইরূপ ধনাভিমানের যতই কেন দোষ থাকুক না, তাহা কেবল তাহার অযথা পরিমাণোৎপন্ন। পরিমিত সীমা অতিক্রম করিলে সকল বিষয় হইতেই কুফলোৎপত্তি হয়। দয়া মমতা প্রভৃতি মনুষ্য জীবনের ভূষণ—ইহলোকে দেবদুর্লভ গুণাবলীও যদি অযথাপরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহাহইলে যারপরনাই কুফলোৎপাদন করে। জগতে এমন কিছুই নাই যাহা নির্দ্দিষ্টসীমা অতিক্রম করিলে কুফল প্রসূ হয় না। এই জন্য ধনাভিমানের অযথা পরিমাণোৎপন্ন অনেক কুফল সত্বেও তাহা মানবসমাজের অপকারী না হইয়া উপকারী পদের বাচ্য।

যশোভিমান।

যশোভিমান মনুষ্যের মনে যার পর নাই প্রবল। জগতে যত সৎকার্য্য অনু-

* দ্রব্যাদির মূল্য বিবেচনা করিলে তৎকালীন একশত টাকা অধুনাতন ৩০০ টাকা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্।

ষ্ঠিত হয় তাহার অধিকাংশই ইহলোকে চিরস্মরণীয় হওয়ার উদ্দেশ্য মূলক—এ কথা বোধ হয়, যিনি মানব প্রকৃতি একটু মনোযোগ করিয়া অনুসন্ধান করিয়া থাকেন তিনিই স্বীকার করিবেন। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইয়া লোকের উপকারের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করে—এরূপ দেব প্রকৃতিক কয় জন লোক সংসারে দেখা গিয়া থাকে। দার্শনিকপ্রবর লক অথবা অগস্ত কোমৎ যাহাই কেন বলুন না, সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার কল্পনা-প্রধান বালকের স্বপ্ন ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারি না। অন্য কোন বিশেষ স্বার্থ বর্জ্জিত হইয়াও সুনাম লাভ আশায় লোকে সদনুষ্ঠান করিয়া থাকে। যদি সৎকর্ম্মশালী লোককে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট উচ্চ উপাধি দ্বারা সম্মানিত না করিতেন, তাহা হইলে, অস্মদ্দেশে কদাপি সদনুষ্ঠানের এত বাহুল্য হইত না—এত বিদ্যালয় এত চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়া লোকের অশেষ উপকার সংসাধিত হইত না, এত প্রশস্ত রাজবর্ত্ম প্রস্তুত হইয়া লোকের গতিবিধির ঈদৃশ সুবিধা হইত না।

কেবল সৎকার্য্যানুষ্ঠান নহে, যশোভিমানী লোক অনেক সময়ে সুনাম হানির অভিপ্রায়ে দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয়। কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন অভিমানী লোক প্রায়শঃ নীচপ্রকৃতি লোকের ন্যায় দুষ্কর্ম্মান্বিত নহে। আমাদিগের উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে পরলোক ভীতি ও পরমেশ্বরের উপর শ্রদ্ধার ভাগ পূর্ব্ববর্ত্তী বংশীয়দিগের অপেক্ষা নিতান্ত অল্প হইয়াছে, তথাপি কে না স্বীকার করিবেন বর্ত্তমান বংশীয়দিগের নীতি পূর্ব্ববর্ত্তী দিগের অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে। অনৃতাচার, অনৃত কথন, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি ঘৃণিত কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়াছে। ইহার অনেক কারণ সত্ত্বেও যশোভিমান অন্যতর।

এই ভাব লোকের মনে এতই প্রবল যে দার্শনিকবর বার্ণার্ড ডি মাণ্ডীবীল যশোভিমানই লোকের ন্যায়ান্যায় নির্ধারণের উপায় বলিয়া বর্ণন করেন। সকল সুনীতি এই অভিমান (১) অর্থাৎ লোকানুরাগ-প্রিয়তা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বর্ত্তমান দার্শনিক বেন বলেন, "মনুষ্য নিশ্চেষ্ট ও ভীরুপ্রকৃতিক—কোন বিশেষ ভাব প্রধান নহে। সুতরাং আত্মাভিমান না থাকিলে নিশ্চয়ই আদিম অবস্থা হইতে উন্নত হইতে পারিত না। তথাপি ধর্ম্মশাস্ত্র লেখকেরা আত্মাভিমানের উপর দোষারোপ করেন। অভিমান নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন। আমি বড় নিরভিমানী এই বলিয়াও সময়ে সময়ে অভিমান হয় এবং দুষ্কর্ম্ম করিয়াও লোকে সময়ে সময়ে অভিমানী হয়। আত্মাভিমান অনেক সময়ে মনুষ্যকে সৎকর্ম্মশালী

(১) "The Moral Virtues are the political offsprings which flattery begat upon pride." Mandeulle's Fable of the Bees.

করে। সতীর সতীত্ব ও বীরের বীরত্ব অভিমান মূলক।" (১)

আমরা মাণ্ডীবীল ও বেন সাহেবের সহিত অনেকাংশে ঐকমত্য প্রকাশ করি। যদিও এই পাপ পুণ্যময় সংসারে এমন অনেক লোক আছে ধর্ম্মই যাহাদিগের জীবনের একমাত্র ব্রত এবং পরলোক ভয়েই যাহারা সমুদয় সদনুষ্ঠান করে, তথাপি অধিকাংশ সৎকর্ম্মশালী লোকই যে সম্মান প্রত্যাশী এ কথাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

অস্মদ্দেশে এই ভাব এতাধিক প্রবল যে অখ্যাতি হইবে দশ জনে হাঁসিবে বা দশ জনের কাছে মুখ থাকিবে না—এইরূপ বাক্য আবাল বৃদ্ধবণিতারমুখে সর্ব্বদাই শুনা যায়।

ধনাভিমানের ন্যায় যশোভিমানও অযথা প্রবল হইলে লোকে নানারূপ কুকর্ম্মাসক্ত হয়; যশোলাভ প্রত্যাশায় যারপর নাই অযশের কার্য্য করে। রাজপুত্রগণ একমাত্র বংশ মর্য্যাদা রক্ষা হেতুই অনেক স্থলে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই প্রাণবধ করে।

সময়ে সময়ে লোকে দুষ্কর্ম্মে খ্যাতিলাভের জন্যও ব্যস্ত হয়। মাতাল অধিক পরিমাণে মদ্যপান ও লম্পট ভুক্তিয়াতে চাতুর্য্যলাভ গৌরবের বিষয় মনে করে। এইরূপে যে যে কার্য্যে রত হয়, সে তাহাতেই বাহবা লাভের জন্য সমিচ্ছুক হয়। মহাবীর আলেকজণ্ডর একমাত্র সম্মান লাভাকাঙ্ক্ষায় লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন, ও শত শত নগর ও পল্লী লুণ্ঠন করিয়া নির্ধন ও নির্মনুষ্য করিয়াছেন। এবং কর্ত্তেজ, পিজারো মণ্টজুমার একমাত্র সম্মান লাভাকাঙ্ক্ষায় ধর্ম্মের নামে সহস্র সহস্র নিরপরাধী আমেরিকাবাসীর প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন। একমাত্র পৌত্তলিকতা বিনাশ সম্মানাকাঙ্ক্ষায়ই গজনীয় মহম্মদ সোমনাথের মন্দির জয় করিলে পাণ্ডাদিগের অনেক অনুরোধ ও অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি অগ্রাহ্য করিয়াও প্রতিমা ভগ্ন করিয়াছিলেন। এবং একমাত্র সম্মানাকাঙ্ক্ষায় কোন গ্রীক সম্রাট্ মক্ষিকা বধ জীবনের প্রধান কার্য্য করিয়াছিলেন।

সম্মানাকাঙ্ক্ষার এই সকল দোষ দেখিয়া কি আমরা তাহাকে মনুষ্যের অপকারী আখ্যা প্রদান করিব? আমরা এই মাত্র বলিতেছি যে সম্মানাকাঙ্ক্ষা লোককে কার্য্যে উৎসাহশীল করে। কিন্তু

(১) Man is naturally innocent, timid and stupid, destitute of strong passion or appetite, he would remain in his primitive barbarious state were it not for pride yet all moralists condemn pride, as a vain notion of our superiority. Is is a subtte possion not easy to trace. It is often seen in the humility of the humble and the shamelessness of the shamless. It stimulates charity; pride and vanity huve built more hospital than all the virtues togather. It is the chief ingridient in the chastity of women and in the courage of men."

Bain.

কার্য্য অন্য মূল হইতে উৎপন্ন হয়। যে যে বিষয় ভাল বুঝে যাহার কল্পনা যে বিষয়োৎপন্ন সুখ বার বার ধ্যান করিয়াছে সে সেই বিষয়েরই অনুসরণ করে। সুতরাং যাঁহারা সম্মানাকাঙ্ক্ষা বশতঃ নীচগামী হন তাঁহাদিগের বুদ্ধি ভ্রমজালে আবদ্ধ। সম্মানাকাঙ্ক্ষার কোনই দোষ নাই।

স্বাভাবিক বুদ্ধি অথবা বিদ্যাভিমান।

স্বাভাবিক বুদ্ধির নিমিত্ত অভিমানী লোক সর্ব্বদাই নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার অথবা নূতন মত প্রকাশ করিতে ব্যস্ত। বস্তুতঃ সংসারে এই সংখ্যক লোক যত অধিক হয়, মানব সমাজ ততই নূতন মত এবং নূতন তত্ত্ব জানিতে পারে। বুদ্ধির জন্য অভিমান না থাকিলে কে বহুকাল প্রচলিত সহস্র সহস্র পণ্ডিতানুমোদিত আপামর সাধারণের মতের বিরোধী কথা ব্যক্ত করিতে সাহসী হইত? জগতে এমন অনেক বুদ্ধিজীবী লোক আছেন, যাঁহারা অনেক নূতন বিষয়ের চিন্তা করেন, চিন্তা করিয়া অনেক সময়ে অনেক নূতন তত্ত্বও অবধারণ করেন কিন্তু অভিমান না থাকায় তাঁহারা জন সাধারণের বিশ্বাসাতীত মত প্রচার করিতে সাহস পান না। বস্তুতঃ নিরভিমান যে মানব সমাজকে কত নূতন মত সুতরাং তজ্জাত উপকার হইতে বঞ্চিত করিতেছে তাহা আমরা বলিতে পারি না।

পক্ষান্তরে স্বাভাবিক বুদ্ধির অভিমানী লোক অনেক সময়ে যথোচিত চিন্তা না করিয়াই নূতন মত ব্যক্ত করেন এবং তদনুসরণকারীকে যারপর নাই ক্ষতিগ্রস্ত করেন। অনেক সময়ে গ্রন্থাদি অধ্যয়ন, অর্থাৎ অন্যের মত গ্রহণ পক্ষে এত উদাসীন হয়েন যে, বিবেচ্য বিষয় সকল ভাবে বিচার করেন না। কিন্তু এজন্য আমরা অভিমানের উপর দোষারোপ করিতে পারি না। স্বাভাবিক বুদ্ধিজীবী লোক যদি অন্যের বুদ্ধি ও মত শুনেন, তাহা হইলে কদাপি তাঁহার বুদ্ধি মলিন হয় না, বরং প্রখর ও মার্জ্জিত হয়। বুদ্ধির নৈসর্গিক অবস্থা পুষ্পকোরকবৎ। যেরূপ সূর্য্য রশ্মি প্রভৃতির অভাবে কোরক প্রস্ফুটিত হইয়া পুষ্পে পরিণত হয় না, সেইরূপ উচিতরূপে চর্চ্চিত ও মার্জ্জিত না হইলে স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রস্ফুটিত হইয়া উচিতরূপে চিন্তা করিতে সক্ষম হয় না। তবে যে স্বাভাবিক বুদ্ধিজীবী লোক অন্যের মতাদি পক্ষে যার পর নাই উদাসীন হয় তাহা প্রকৃত অভিমানমূলক নহে—তাহা তাঁহাদিগের মনঃসংযোগাভাবের ফল।

বিদ্যাভিমানিলোক নিরন্তর গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন এবং তন্নিবন্ধন স্বয়ং অনেক উন্নতিলাভ এবং মানব সমাজকেও অশেষ ঋণে আবদ্ধ করেন। কিন্তু স্বাধীনচিন্তা বিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বদা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যক্ষমতা হারাইতে হয় এবং অস্মদ্দেশীয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়

দিগের ন্যায় সাধারণ বুদ্ধি হারাইয়া পশু বৎ হইতে হয়। অধুনা অনেক বিদ্বান্ লোক জন্ম পরিগ্রহ করিতেছেন। প্রাচীন কালাপেক্ষা বিদ্যালোক কত অধিক পরিমাণে বিকীর্ণ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যেক লোকেই স্বীকার করিবেন চিন্তাশীলতা ও মৌলিকতার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়াছে। প্রাচীন কালের শিক্ষিত ও চিন্তাশীলের অনুপাত অধুনাতন শিক্ষিত ও চিন্তাশীলের অনুপাত অপেক্ষা অনেক অধিক একথাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। বস্তুতঃ অধিক অধ্যয়ন ও অল্প চিন্তাবশতঃ এরূপ ঘটিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সমুদয় কুফল প্রত্যক্ষ করিয়াও আমরা বিদ্যাভিমানকে অপকারী বলিতে পারি না। যাঁহারা চিন্তা অপেক্ষায় অধিক অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা মনে করেন না যে তাহাতে বিদ্যার বৃদ্ধি হয় না। মূলে ভ্রান্তিমূলক মতই এই অনিষ্ট প্রসব করিতেছে। বিদ্যাভিমান কদাপি এরূপ করে নাই।

ধর্ম্মাভিমান।

ধর্ম্মাভিমান বশতঃ সংসারে অনেক সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও অনেক পরিমাণে অসৎ কার্য্যের নিবৃত্তি হয়। বস্তুতঃ অভিমান শূন্য প্রকৃত ধার্ম্মিক লোক হইতে সংসারে যত উপকার হয়, ধর্ম্মাভিমানী হইতে তদপেক্ষা অশেষ গুণে অধিক হইয়া থাকে একথা কে সন্দেহ করিবে? কারণ প্রকৃত ধার্ম্মিক লোকাপেক্ষা ধার্ম্মিকাভিমানীর সংখ্যা অশেষ গুণে অধিক। ধর্ম্মাভিমানীর মনে ঈশ্বর চিন্তা ও বিশ্বাস যত দূর প্রবল থাকুক বা না থাকুক সে অসৎ পথ হইতে নিবৃত্ত হয় ও তাহার সৎকর্ম্মানুষ্ঠানশীলতা প্রবল হয়। এবং তাহা হইতে জনসাধারণে অশেষ উপকার প্রাপ্ত হয়। অস্মদ্দেশে যত ক্রিয়া কলাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে দীন দুঃখী যে সাহায্য প্রাপ্ত হয়, তাহার অনেক কারণ সত্ত্বেও ধর্ম্মাভিমান অন্যতর। অস্মদ্দেশে অনেক দুষ্কিয়াম্বিত লোক একমাত্র ধর্ম্মাভিমান বশতঃ যার পর নাই সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, এবিষয় সর্ব্বদাই চাক্ষুষ করা যায়। যে মহাপাপী পরম স্বার্থপর বৃদ্ধ মাতা অথবা বনিতার ভরণ পোষণ ভার বহন করিতে অনিচ্ছুক সেও অনেক সময়ে সাধারণ হিতকর ব্যাপারে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। (১)এরূপ গর্হিত আচরণ আমাদিগের অনুমোদিত বিষয় বলিতেছি না। এস্থলে আমাদিগের বক্তব্য যে মহা পা

(১) আধুনিক নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। এরূপ একজন ব্যক্তির সহিত আমার একদিবস অনেক তর্ক বিতর্ক হয়। পরিশেষে তিনি বলিলেন "আমি ভগবানের একটি নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছি বটে কিন্তু তাহা না করিলে অর্থাৎ পরিবার প্রতিপালনে উচিত রূপ অর্থ ব্যয় করিলে আমি কদাপি ভারত মাতার দুঃখ নিবৃত্তি করিতে পারিব না।"

পীর মনেও ধর্ম্মাভিমান প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে কোন্ কোন স্থলে সৎকর্ম্মশালী করে।

ধনাভিমান, যশোভিমানের ন্যায় ধর্ম্মাভিমান বশতঃও লোকে অনেক সময়ে অনেক অসৎ কার্য্য ও উন্মত্তবৎ ব্যবহার করিয়া থাকে। ধর্ম্মের জন্য যে উৎপীড়ন হয় ধর্ম্মাভিমানই তাহার একমাত্র কারণ। নরশোণিততৃষ্ণাবিধুরা মেরী এক মাত্র ধর্ম্মাভিমান বশতঃই কএক বৎসর মধ্যে ২৭৭ জন পোপ-বিরোধী খৃষ্টানের প্রাণ বধ করিয়াছিলেন। বেকেট পোপের পদাভিষিক্তহইয়া স্বাভাবিক শম প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া তাৎকালীন ঐপদসুলভ দুর্দ্ধর্ষ ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। লুই একদিনে বহুতর লোকের রক্তপাত করিয়াছিলেন। অনেক রূমীয় সম্রাট্ প্রথমসাময়িক খৃষ্টানগণের পবিত্র শোণিতে বসুমতীকে কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ কত নির্দ্দোষী লোকের প্রাণ সংহার করিয়া আপনাদিগের চির কলঙ্ক ঘোষণা করিয়াছেন। ডামাস্কাস আক্রমণ কালে খালেড পবিত্র প্রণয়াবদ্ধ দম্পতির বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলেন। কত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী নরপতি নিরপরাধী বৌদ্ধদিগের প্রাণহানি ও অশেষ বিধ অত্যাচারে অত্যাচারিত করিয়াছিলেন। অধুনা হিন্দুগণ ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান দিগের উপর কত অকথ্য অত্যাচার করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মাভিমান বশতঃ কত লোক কত অমানুষী কঠোর করিয়া জীবন ক্লেশে অতিবাহন করিতেছেন। কেহবা উর্দ্ধহস্তে কেহবা অধোমুখে কেহবা শিত কালে বস্ত্রাভাবে, কেহবা দারুণ নিদাঘ সন্তপ্ত মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্য কীরণে যার পর নাই ক্লেশ সহ্য করিয়া ইহজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন! কেহবা অনশনে শরীর ক্ষয় ও (হয়ত) প্রাণত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্য লোকের দুঃখ যন্ত্রণা হইতে মুক্তহইয়া স্বর্গবাসী হইতেছেন!!

এই সকল দোষ সত্বেও ধর্ম্মাভিমান মনুষ্যের পরমোপকারী। এসকল ধর্ম্মাভিমানের দোষ নহে। লোকের অজ্ঞতার দোষ অর্থাৎ ভ্রান্তিমূলক অনৈসর্গিক বিষয় সহ ধর্ম্মাভিমান যুক্ত হইয়া এইরূপ কুফল উৎপাদন করে।

বীর্য্যাভিমান।

বীর্য্যাভিমান জাতিসাধারণের উন্নতির প্রধান কারণ। বীর্য্যাভিমানপরায়ণ জাতি কখন অন্যের অধীনতা স্বীকার করে না, শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আনন্দে প্রাণত্যাগ করে, তথাপি এক জনের দেহে প্রাণ থাকিতেও সমরানল নির্ব্বাণ হইতে দেয় না। যখন সিপীয় কার্থেজ আক্রমণ করিলেন, অধিবাসিগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং দেশের সমুদয় ধন নিঃশেষ হইলে যোষিৎ গণ আপনাদিগের গাত্রাভরণ ও মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া যুদ্ধোপকরণ যোগাইতে লাগিলেন। এই

বীর্য্যাভিমান আবার লোককে কত সময় কত নিরর্থক সমরে প্রবৃত্ত করায়; কত সময় কত নির্দ্দোষ লোকের প্রাণ হানি করে, কত সময় কত সাধুর সর্ব্বস্বান্ত করে, কত সময় কত নিরপরাধী জাতির জীবনের সারসর্ব্বস্ব স্বাধীনতা রত্ন অপহরণ করিয়া এবং কত সময় দুর্ব্বল ভ্রাতাকে পদে দলিত করিয়া মনুষ্য নামের কলঙ্ক ঘোষণা করে! কিন্তু এসমুদয় বীর্য্যের অযথা ব্যবহার হইতে উৎপন্ন। বস্তুতঃ নির্দ্দোষীর অনিষ্টসাধণ প্রকৃত বীরত্ব নহে। অত্যাচারীর হস্ত হইতে দুর্ব্বল ও আপনাকে রক্ষাই প্রকৃত বীরত্বের কার্য্য।

যথার্থ বীরপুরুষ অপমান সহ্য করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহার চরিত্র কদাপি নীচ হয় না। (পুনঃ পুনঃ অপমানিত হইলে যে হৃদয়ের মহৎ আশয়তা কিয়ৎ পরিমাণে অপনীত হয় তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না।) সুতরাং তাঁহার জীবনও প্রকৃত মনুষ্যের ন্যায় হয়। কিন্তু অজ্ঞতা বীর্য্যযুক্ত হইলে মনুষ্য উন্মাদের ন্যায় কার্য্য করে। এজন্য মধ্য সময়ে সিবাল রিয়াস নাইটগণ মনুষ্যের প্রকৃত উপকার সঙ্কল্প হইয়াও অনেক সময়ে যার পর নাই অত্যাচারী ও অনিষ্টকারী হইয়াছিলেন। এই জন্যই অনেক নাইট ডনকুই স্কটের সঙ্কেপাঞ্জার ন্যায় ক্ষিপ্তবৎ আচরণ করিয়া সংসারের বিস্তর অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা বীর্য্যাভিমানের দোষ নহে—অজ্ঞতার দোষ।

শ্মশানে ভ্রমণ।

এই খানে আসিলে, সকলেই সমান হয়। পণ্ডিত, মূর্খ; ধনী, দরিদ্র; সুন্দর, কুৎসিত্; মহৎ, ক্ষুদ্র; ব্রাহ্মণ, শূদ্র; ইংরেজ, বাঙ্গালি, এই খানে আসিলে সকলেই সমান। নৈসর্গিক, অনৈসগিক, সকল বৈষম্য এইখানে তিরোহিত হয়। শাক্যসিংহ বল, শঙ্করাচার্য্য বল, ঈশা বল, রুসোবল, রামমোহন রায় বল, কিন্তু এমন সাম্য-সংস্থাপক এ জগতে আর নাই। এ বাজারে সব এক দর—অতি মহৎ এবং অতি ক্ষুদ্র, মহাকবি কালিদাস এবং বটতলার নাটকলেখক, একই মূল্য বহন করে। তাই বলি, এ স্থান ধর্ম্মভাবপূর্ণ—এ স্থান সদুপদেশপূর্ণ—এস্থান পবিত্র।

এইখানে বসিয়া একবার চিন্তা করিতে পারিলে, মনুষ্যমহত্বের অসারতা বুঝিতে পারি, অহঙ্কার চূর্ণীকৃত হয়, আত্মাদর সঙ্কুচিত হয়, স্বার্থপরতার নীচতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হই। আজি হউক, কালি হউক, দশ দিন পরে হউক, সকলকেই আসিয়া এই শ্মশানমৃত্তিকা হইতে

হইবে। যে অমানুষবীর্য্য, যে অহঙ্কার আর পৃথিবী নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা এই মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে —তুমি আমি কে? যেউৎকট আত্মাভিমান ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে সাহঙ্কারে কর চাহিয়াছিল * তাহা এই মাটিতে বিলীন হইয়াছে--তুমি আমি কে? সে দিন যে চিন্তাশক্তি, ঈশ্বরকে স্বকার্য্য সাধনে অক্ষম বলিতে সাহস করিল, † তাহা এই মাটিতে মিশিয়াছে—তুমি আমি কে? যে রূপের অনলে ট্রয় পুড়িয়াছিল, যে সৌন্দর্য্যতরঙ্গে বিপুল রাবণবংশ ভাসিয়া গিয়াছিল, যে লাবণ্যরজ্জুতে জুলিয়স্ সিজর বাঁধা পড়িয়াছিল, যে পবিত্র সৌকুমার্য্যে এ পাপ হৃদয়ে কালানল জ্বলিয়াছে, সে সুন্দরী, সে দেবী, সে বিলাসবতী সে অনির্ব্বচনীয়া, এইমাটিতে পরিণত হইয়াছে,—তুমি আমি কে? কয় দিনের জন্য সংসার? কয় দিনের জন্য জীবন? এই নদীহৃদয়ে জলবিম্বের ন্যায়, যে বাতাসে উঠিল, সেই বাতাসেই মিলাইতে পারে। আজি যেন অহঙ্কারে মাতিয়া, একজন ভ্রাতাকে চরণে দলিত করিলাম, কিন্তু কালি এমন দিন আসিতে পারে, যে আমাকে শৃগাল কুক্কুরে পদাঘাত করিলেও আমি তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিব না। কেন অহঙ্কার? কিসের জন্য অহঙ্কার? এ অনন্ত বিশ্বে, আমি কে—আমি কত টুকু—আমি কি? এই মাটির পুতুলে, অহঙ্কার শোভা পায় না। আই বলিতেছিলাম, এই স্থান মনে উঠিলে সকল অহঙ্কার—বিদ্যার অহঙ্কার প্রভুত্বের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার, বুদ্ধির অহঙ্কার, প্রতিভার অহঙ্কার, ক্ষমতার অহঙ্কার, অহঙ্কারের অহঙ্কার—সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়। আর সেই দিন, তাহা অপরিহার্য্য—পলাইয়া রক্ষা নাই। যে ভীরুশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণসেন, জীবনের ভয়ে, যবনহস্তে জন্মভূমি নিক্ষেপ করিয়া মুখের গ্রাস ভোজন পাত্রে ফেলিয়া, তীর্থযাত্রা করিলেন, তিনি এড়াইতে পারিলেন না। শুনিয়াছি স্বর্গে বৈষম্য নাই—ঈশ্বরের চক্ষে সকলেই সমান। স্বর্গ কি, তাহা জানিনা —কখন দেখি নাই, কিন্তু শ্মশানভূমির এই উপদেশ জীবন্ত। এস্থান স্বর্গের অপেক্ষাও বড়। এ স্থান পবিত্র।

আর স্বার্থপরতার, তাহারও ক্ষুদ্রত্ব অনুমিত হয়। সম্মুখে, অসীম জলরাশি অনন্ত প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে; পদতলে, বিপুলা ধরিত্রী পড়িয়া রহিয়াছে; মস্তকোপরি, অনন্ত আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে; তাহাতে অসংখ্য সৌরমণ্ডল, অগণনীয় নাক্ষত্রিক জগৎ, নাচিয়াবেড়াইতেছে; সংখ্যাতীত ধূমকেতু ছুটাছুটি করিতেছে, ভিতরে, অনন্ত দুঃখরাশি, ক্ষুব্ধসাগরবৎ, মদমত্ত মাতঙ্গবৎ, দুলিতেছে। যে দিকে দৃষ্টি ফিরাও সেই দিকেই অনন্ত—আমি কত ক্ষুদ্র—

* See Lewes' History of Philosophy. Auguste Comte.

† See I. S. Mill's Three Essays on Religion.

কত সামান্য? এই সামান্যের, এই ক্ষুদ্রের, এই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রতরের জন্য এত আয়াস, এত যত্ন, এত গোল, এত বিভ্রাট এত পাপ!—বড় লজ্জার কথা। সেই ক্ষুদ্রকে কেন্দ্র করিয়া যে জীবন অতিবাহিত হইল, তাহার মহত্ত্ব কোথায়? কিন্তু তুমি আমি ক্ষুদ্র হইলেও মানবজাতি ক্ষুদ্র নহে। একটি২ মনুষ্য লইয়াই মনুষ্যজাতি, স্বীকার করি; কিন্তু জাতিমাত্রই মহৎ। বিন্দু২ বারি লইয়া সমুদ্র, কণা২ বাষ্প লইয়া মেঘ; রেণু২ বালুকা লইয়া মরুভূমি; ক্ষুদ্র২ নক্ষত্র লইয়া ছায়াপথ পরমাণু লইয়া এ অনন্ত বিশ্ব। একতাই মহত্ত্ব—মনুষ্যজাতি মহৎ, মহৎ কার্য্যে আত্মসমর্পণ করায় মহত্ত্ব আছে। স্বীকার করি, ব্যক্তিমাত্রের ন্যায় জাতিমাত্রেরও ধ্বংস আছে। এরূপ প্রমাণ আছে যে, একাল পর্য্যন্ত অনেক প্রাচীন জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে এবং অনেক নূতন জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমার ক্ষতি কি? যে দিন মনুষ্যজাতির লোপ হইবে, সে দিন আমিও তাহা দেখিতে থাকিব না, কেননা আমিও মনুষ্য—মনুষ্যজাতির অন্তর্গত। কিন্তু কি যে বলিতেছিলাম, ভুলিয়াগিয়াছি—

এইখানে আসিয়া সকল জিনিষের সমাধি হয়। ভাল, মন্দ, সৎ, অসৎ, সব এই পথদিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া যায়। এ সুখের স্থান। এইখানে শয়ন করিতে পারিলে শোকতাপ যায়, জ্বালা যন্ত্রণা ফুরায়, সকল দুঃখ দূর হয়—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, সকল দুঃখ দূর হয়।* আবার তাও বলি, এ দুঃখের স্থান। এইখানে যে আগুন জ্বলে, তাহা এ জন্মে নিবে না। তাহাতে সৌন্দর্য্য পোড়ে, প্রেম পোড়ে, সরলতা পোড়ে, ব্রীড়া পোড়ে, কোমলতা পোড়ে, পবিত্রতা পোড়ে, যাহা পুড়িবার নয় তাহাও পোড়ে—আর তার সঙ্গে সঙ্গে অপরের আশা, উৎসাহ, প্রফুল্লতা, সুখ, উচ্চাভিলাষ, মায়া, সব লুপ্ত হয়। তাই বলি এস্থান সুখেরও বটে, দুঃখেরও বটে—যে চলিয়া যায়, তার সুখ, যে পড়িয়া থাকে তার দুঃখ। এ সংসারেরই ঐ নিয়ম—সবই ভাল, সবই মন্দ। কুসুমে সৌরভ আছে, কণ্টকও আছে;

* দুঃখ ত্রিবিধ;—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দুই ভাগে বিভক্ত;—শারীর এবং মানস। বাতপিত্তশ্লেষ্মার বৈষম্য নিমিত্ত যে দুঃখ (রোগাদি) তাহার নাম শারীর দুঃখ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষ্যা, বিষাদ এবং বিষয় বিশেষের অদর্শন নিবন্ধন যে দুঃখ, তাহার নাম মানস দুঃখ। উভয় শ্রেণীরই এ সকল দুঃখ আভ্যন্তরীণ হেতুসমুদ্ভূত বলিয়া, ইহাদিগের নাম আধ্যাত্মিক দুঃখ। বাহ্য হেতুসমুদ্ভূত দুঃখও দ্বিবিধ;—আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক। মনুষ্য পশু পক্ষী সরীসৃপ এবং স্থাবর নিমিত্ত যে দুঃখ তাহাই আধিভৌতিক। যক্ষোরাক্ষস বিনায়ক এবং গ্রহাবেশ নিবন্ধন যে দুঃখ, তাহার নাম আধিদৈবিক দুঃখ।
সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী।

মধুতে মিষ্টতা আছে, তীব্রতাও আছে; সূর্য্যরশ্মিতে প্রফুল্লতা আছে, রোগজনন-প্রবণতাও আছে;† রমণীর চক্ষে সৌন্দর্য্য আছে, সর্ব্বনাশের মূলও আছে; রমণীর হৃদয়ে ভালবাসা আছে, প্রতারণাও আছে। ধনে ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, যৌন-নির্ব্বাচনের প্রতিবন্ধকতাও করে। * জগতে কোথাও নির্দ্দোষ কিছু দেখিতে পাইবে না। সকলই ভাল মন্দে মিশ্রিত। এই জন্য প্রকৃতি দেখিয়া কোন কোন পণ্ডিত বলেন এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের যে আদিকারণ, সেও ভাল মন্দে মিশ্রিত; অথবা দুইটি শক্তি হইতে এ জগৎ সমুৎপন্ন—সেই শক্তির, একটি ভাল, একটি মন্দ; একটি স্নেহ, একটি ঘৃণা; একটি অনুরাগ, একটি বিরাগ; একটি আকর্ষণ, অপরটি প্রতিক্ষেপ। † কিন্তু, কি বলিতে বলিতে কি বলিতেছি—

এই যে সংসার, ইহা এক মহা শ্মশান। চিরপ্রবহমান কালস্রোতঃ, দিনে দিনে দণ্ডে দণ্ডে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, পলকে পলকে, সব ভাসাইয়া লইয়াগিয়া বিস্মৃতির গর্ত্তে ফেলিতেছে। পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যাহা দেখিযাছ, উপস্থিত মুহূর্ত্তে আর তাহা নাই—প্রাণদিলেও আর তাহা ফিরিয়া আসিবে না। এইক্ষণে যাহা রহিয়াছে, পরক্ষণে আর তাহা থাকিবে না, অখিল সংসার খুঁজিয়া দেখিলেও, কোথাও পাইবে না। কোথায় যাইবে, কোথায় যায়, তাহা তুমিও যতদূর জান আমিও ততদূর জানি, এবং তুমি আমি যাহা জানি, তাহার অধিক কেহই জানে না। সবই যায়, কিছুই থাকে না—থাকে কেবল কীর্ত্তি। কীর্ত্তি অক্ষয়। কালিদাস গিয়াছেন, শকুন্তলা আছে। সেক্ষপীয়র গিয়াছেন, হামলেট্ আছে। ওয়াসিংটন গিয়াছেন, আমেরিকার স্বাধীনতার ধ্বজা

† Sunstroke. See Tanner's Practice of Medicine. vol. I. page 375.

* The Grecian poet, Theognis, who lived 550 B. C., clearly saw, that wealth of ten checks the proper action of sexual selection. He thus writes:

"But, in the daily matches that we make,
The price is every thing: for Money's sake,
Men marry: women are in marriage given;
The Churl or ruffian, that in wealth has thriven,
May match his offspring with the proudest race:
Thus every thing is mixed, noble and base!
If then in outward manner, form and mind,
You find us a degraded, motley kind,
Wonder no more, my friend! the cause is plain,
And to lament the Consequence in vain."

See Darwin's Descent of Man, Part I. chap II. Also Part III. Chap. XX.

যৌননির্ব্বাচন,—Sexual Selection.

† Attraction and Resistance of Matter. This theory originated with Laplace; it has been expounded by Herbert Spencer.

আজও উড়িতেছে। রূসো গিয়াছেন, সাম্যের দুন্দুভিনিনাদ আজও পৃথিবী ভরিয়া ঘোষিত হইতেছে। কীর্ত্তি থাকে। অকীর্ত্তিও থাকে। লোকের ভাল, লোকের মন্দ, লোকের সঙ্গে চলিয়া যায়; কীর্ত্তি এবং অকীর্ত্তি জগতে বিচরণ করিতে থাকে। ওয়াসিণ্টনের স্বদেশানুরাগ তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। সেক্ষপীয়রের চরিত্রদোষও তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। * কিন্তু তাঁহারা লোকের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহার সৌরভ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই বলি,

ভাল মন্দ দুই, সঙ্গে চলি যায়ব,
পর উপকার সে লাভ।

ইহাই জগতের সার তত্ত্ব—ধর্ম্মের মূলভিত্তি—পুণ্যের স্বর্ণ সোপান।

এই সংসার এক মহাশ্মশান। যে চিতানল ইহাতে গর্জ্জিতেছে, তাহাতে না পোড়ে এমন জিনিষ নাই। জড়প্রকৃতি কাহারও মুখ তাকায় না; যাহা সম্মুখে পড়ে তাহাই পোড়াইয়া, সমান জ্বলিতে জ্বলিতে, সমান হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়। ঐ যে নক্ষত্রনিচয় অন্ধকারে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, ও সকল এই বিশ্বব্যাপী মহাবহ্নির স্ফুলিঙ্গ মাত্র। এ সংসারে কোথায় অনল নাই? নির্ম্মল চন্দ্রিকায়, প্রফুল্ল মল্লিকায়, কোকিলের রবে, কুসুমের সৌরভে, মৃদুল পবনে, পাখীর কূজনে, রমণীর মুখে, পুরুষের বুকে—কোথায় অনল নাই? কিসে মানুষ পোড়ে না? ভালবাস, পুড়িতে হইবে; ভালবাসিও না, তদধিক পুড়িতে হইবে। পুত্রকন্যা না হইলে, শূন্য গৃহ লইয়া পুড়িতে হইবে; হইলে, সংসারজ্বালায় পুড়িতে হইবে। শুদ্ধ মনুষ্য কেন, সমস্ত জীবই পুড়িতেছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে পুড়িতেছে, যৌন নির্ব্বাচনে পুড়িতেছে, সামাজিক নির্ব্বাচনে পুড়িতেছে, পরস্পরের অত্যাচারে পুড়িতেছে। কে পোড়ে না? এ সংসারে আসিয়া, সুস্থমনে, অক্ষত শরীরে, কে গিয়াছে? আ-

* K. Villemain says:—"Every year, it is stated, he went during the summer to spend some of his time at Stratford, with his wife his children, and his aged father. Tha poet's taste for the beanties of nature, his vivid impression of the green landscapes of England would alone indicate that he was in the habit of seeking rural repose. In his own time, however, another motive was attributed for these frequent voyages; it has been stated that, upon the road to his native place, he was fond of stopping at the Crown in Oxford, the hostess of which, remarkable for her elegance and beanty, became the mother of the poet Davenant. Shakespeare, who was an intimate guest, was godfather to his child, who was said to belong to him by a closer tie, and who subsequently took a singular pride in boasting of this descent. We are better able to understand, after this, the zeal of the royalist Devenant for the republican Milton: it was doubtless in his eyes a double debt of poetic parentage."

See Alfonse de Lamartine's Biographies and Partraits of some Celebrated People. vol. I. Essay on Shakespeare & William Davenant

বার দুঃখের উপর দুঃখ এই যে, এ পাপ সংসারে সহৃদয়তা নাই, সহানুভূতি নাই, করুণা নাই। এই অনন্ত জীবসমূহ, এই মহাবহ্নিতে হাড়ে হাড়ে দগ্ধ হইতেছে;—জড়প্রকৃতি কেবল ব্যঙ্গ করে মাত্র। শশধরের সদা হাসি হাসি মুখে কখন কি বিষাদ চিহ্ন দেখিয়াছ? নক্ষত্র রাজির সোহাগের মৃদু কম্পনে কখন কি হ্রাসবৃদ্ধি দেখিয়াছ? কল্লোলিনীর কল নিনাদে কখন কি স্বরবিকৃতি দেখিয়াছ? নবকুসুমিতা ব্রততীর দোলনিতে কখন কি তালভঙ্গ দেখিয়াছ? আমরা পুড়িতেছি—কিন্তু ঐ দেখ, বৃক্ষরাজি করতালি দিয়া নাচিতেছে—ঐ শুন সমীরণ হাসিতেছে—হো—হো—হো।

হায়! এমন করিয়া আর কত দিন পুড়িব? কত দিনে এ যন্ত্রণা ফুরাইবে? আর কখন কি তোমায় পাইব না? আজি হউক, কালি হউক, দশদিন পরে হউক, জন্ম জন্মান্তরে হউক, যুগ যুগান্তরে হউক —আর কখন কি তোমায় পাইব না? না পাই, ভুলিতেও কি পাইব না?

মনে মনে একটা বিশ্বাস আছে যে, যে দিন এই সৈকতশয্যায় শেষনিদ্রায় নিদ্রিত হইব, সেই দিন হয় ত তাহাকে ভুলিতে পারিব—হয় ত এ সায়াহ্নসমীরণ থামিবে—হয় ত এ অনল নিবিবে—হয় ত তাহাকে ভুলিব। এইরূপ একটা বিশ্বাস আছে বলিয়া সময়ে২ মরিতে সাধ হয়। আবার তাও বলি, তাহাকে ভুলিতে হইবে, তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ মিটিবে, এইরূপ বিশ্বাস আছে বলিয়াই মরিতে পারি না। এজন্মের শোধ সে যে চক্ষের বাহির হইয়াছে, তাহাত জানি; কিন্তু অন্তরের অন্তরে ত জাগিতেছে। সে যেখানে আছে, সেস্থান পবিত্র—সে মন্দির সাধ করিয়া ভাঙ্গিব কেন? তাহা কি প্রাণ ধরিয়া ভাঙ্গা যায়? সে যতক্ষণ চিন্তার বিষয়, সেই যখন আমার একমাত্র চিন্তা, তখন চিন্তা থাক্। বড় যন্ত্রণা পাই, তা বলিয়া কি করিব? তাহার জন্য যদি যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিলাম, তবে মনুষ্য জন্মে ধিক্!—এ ছাই ভালবাসায় ধিক্! ধিক্ এ প্রাণে! ধিক্ এ ছার প্রণয়ে! ধিক্ পরিণয়ে! কিন্তু—

হয় ত আবার তাহাকে পাইব। হয় ত পরলোকে, তাহাতে আমাতে আবার এক হইব। জাগতিক পরিবর্ত্তন পারম্পর্য্যে, হয় ত সেই মাটিতে এই মাটিতে একত্রে মিশিতে পাবে—সেই ররবপুর পরমাণুর সঙ্গে, এই পোড়া মাটির পরমাণুর সঙ্গতি ঘটিতে পারে। দুই দেহের বিশ্লিষ্ট উপকরণের পুনঃসমবায় হইয়া, নূতন এক সত্তা সৃষ্ট হইতে পারে। পরলোকে তাহাতে আমাতে আবার হয় ত এক হইব। বম্ ভোলানাথ! তাহাতে আর আমাতে—প্রাণের যে প্রাণ, জীবনের যে জীবন, নয়নের যে নয়ন, হৃদয়ের যে হৃদয়, তাহাতে আর আমাতে— সংসারের যে কুহক, জীবনের যে ভেল্কি, গৃহের যে আকর্ষণী শক্তি, আমার যে

সেই, তাহাতে আর আমাতে—সংসারান্ধকারে যে চাঁদ, জীবন মরুভূমে যে ওয়েসিস্, ভবসাগরে যে তরণী, জীবনের পথে যে পান্থশালা, তাহাতে আর আমাতে—পৃথিবীর যে সার, স্বর্গের যে নমুনা, ইহ লোকের যে সর্ব্বস্ব, পরলোকের যে ততোধিক, তাহাতে আর আমাতে—গৃহকুঞ্জের সেই সুখলতা, চিন্তাসরোবরের সেই প্রফুল্ল নলিনী, আশালতার সেই সংশ্রয়তরু, তাহাতে আর আমাতে—সংসার প্রবাহের সেই স্নেহময়ী সঙ্গিনী, জীবন মরুভূমের সেই শীতল সরোবর, ভূতভবিষ্যতের অন্ধকারের সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র, হৃদয়কাননের সেই বিকচ কুসুম, তাহাতে আর আমাতে—আশায় যে বিশ্বাস, মায়ায় যে মোহ, ভালবাসায় যে কবিত্ব, দুঃখে যে সান্ত্বনা, সুখে যে সে-যা-তাই, তাহাতে আর আমাতে—হয় ত আবার মিলিত হইব। সে মরিয়া মাটি হইয়াছে, আমি মরিয়া মাটি হইব;—দুই মাটিতে এক হইবে। আমার দেহের পরমাণুতে, তাহার দেহের পরমাণুতে সংঘটন ঘটিবে। তাহাতে আমাতে এক হইয়া এক নূতন সত্তার অভ্যুদয় হইবে। যাহা হইবে, তাহা মন্দ সামগ্রী হইলে হইতে পারে, কিন্তু কি সুখের মিলন! কি সুখের সংঘটন! আদরের সেই আদরিণী, সোহাগের সেই সোহাগিনী, অতীতের কোমলাকাশের সেই ইন্দ্রধনু, উপস্থিতের আঁধার গগনের সেই সৌদামিনী—কেমন বুকভরা মিলন! দুইজনে এক হইয়া এক নূতন সত্তা হইব—আমরিরে! কি সুখের সমবায়! জীবের দেহান্তরপ্রাপ্তিতে কোন মূর্খ সন্দেহ করে? আত্মার শরীর পরম্পরাবস্থান অসম্ভব কিসে? পিথাগোরাস্ পূর্ব্বজন্মে এজাক্স্ ছিলেন, ইহা বিচিত্র কি? যে ভীরু বাঙ্গালি সাহস করিয়া দেশের বাহির হইতে পারে না, তাহার শরীরে একিলিস্ অথবা সেকেন্দরের, সিজর অথবা হানিবলের, নেপোলিয়ন অথবা ইপামিনণ্ডাসের, ব্রাসিডাস্ অথবা লাইসাণ্ডারের ভীমের অথবা অর্জ্জুনের দেহাংশ থাকিতে পারে। রামের শরীরে, হয় ত কালডেরন্ অথবা লোপ্‌ডি ভেগার, গেটে অথবা শীলারের, পিটার্ক অথবা ডান্টের, কর্ণেলি অথবা রেসাইনের, সেক্ষপীয়র অথবা কালিদাসের, হোমর অথবা বর্জ্জিলের, ব্যাস অথবা বাল্মীকির আত্মা আছে। এই হৃদয় যাহার জন্য লালায়িত, এই হৃদয়ে হয় ত সেই আছে। মনুষ্য দেহের আণবিক পরিবর্ত্তন প্রতিনিয়ত সংঘটিত হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি সাতবৎসরে নব কলেবর ধারণ করে। সেই নিয়ত প্রবহমান পরিবর্ত্তপ্রবাহে ভাসিয়া আসিয়া, হয় ত সেই দেহের পরমাণু এই দেহে মিশিতেছে। জগতে কিছুই আশ্চর্য্য নহে। জগতে সকলই আশ্চর্য্য। যে গিয়াছে বলিয়া জগৎসংসার আঁধার হইয়া গিয়াছে, সে আবার ফিরিয়া আসিতে

পারে—যুগ যুগান্তরে হউক, কল্প কল্পান্তরে হউক, সেই অকলঙ্ক চাঁদ আসিয়া আবার এ গগনে দেখা দিতে পারে। পুনর্জ্জন্ম অসম্ভব নহে। তাহাতে—সেই অমূল্য নিধিতে—যাহা যাহা ছিল, সে সকলই আছে। কিছুই একেবারে বিলুপ্ত হয় না। সবই আছে, কেবল একত্রে নাই। সেই সকল উপকরণ জগতে বিরাজমান রহিয়াছে; যেদিন তাহাদের একত্র সংঘটন ঘটিবে, সেই দিন—মনে করিতে হৃদয় নাচিয়া উঠে, প্রাণের ভিতর রোমাঞ্চ হয়—সেই দিন আবার সংসার মরুভূমে সেই সুকুমার, সেই মনোহর, সেই সুন্দর কুসুম ফুটিবে—দশদিক্ আলো করিয়া, জগৎ হইতে জগদন্তর পর্য্যন্ত সৌবভতরঙ্গ ছুটাইয়া, বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত পবিত্রতাস্রোতে ধৌত করিয়া, ফুটিয়া উঠিবে। পুনর্জ্জন্ম অসম্ভব নয়। জীবের দেহপরম্পরাশক্তি অসম্ভব নয়। হিন্দুধর্ম্মে এমন কোন কথা নাই, যাহা একেবারে ভ্রান্ত—এমন কোন মত নাই, যাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়। যে চিন্তাশীল সে চিরকাল বলিবে, হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যদি কোন ধর্ম্ম মানিবার উপযুক্ত হয় ত সে হিন্দুধর্ম্ম।

সে আবার আসিতে পারে। যে গিয়াছে—জগতের মাধুরি হরণ করিয়া, হৃদয়ের পরতে২ আগুন জ্বালিয়া দিয়া, সোণার সংসার ছারখার করিয়া দিয়া, সুখের পাত্রে গরল ঢালিয়া দিয়া, অন্তরে বাহিরে নৈরাশ্য মাখিয়া দিয়া, যে পলাইয়াছে, সে আবার ফিরিয়া আসিতে পারে। কিন্তু আমি কি পাগল হইলাম না কি? কোথায় সে? কোথায় আমি? কোথায় সে ভালবাসা? কোথায় সে সুন্দর সংসার? কোথায় সে চিরপ্রেমোচ্ছ্বাস পরিপ্লুত হৃদয়? হায়! কেন মরিলাম না? চক্ষে ধূলা দিয়া সে যখন পলাইল, কেন তাহার পশ্চাৎ২ ছুটিলাম না? যখন মৃত্যুর বিকট ছায়া সেই মুখে লাগিল, তখন, কেন গরল খাইলাম না? সেই যে চিতা, নৈশান্ধকার দগ্ধ করিয়া, ভাগীরথী সৈকত আলো করিয়া জ্বলিয়াছিল, কেন তাহাতে শুইলাম না? সেই সোণার দেহের দগ্ধাবশিষ্ট অস্থি যখন পাষাণে বুক বাঁধিয়া ভাসাইয়া দিলাম, তখন, সঙ্গে সঙ্গে কেন জলে ঝাঁপ দিলাম না? কেন উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলাম না?

হৃদয় মথিত হইল। চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। কাতরস্বরে উদ্ভ্রান্ত ভাবে ডাকিলাম,—"প্রাণাধিকে, কোথায় তুমি? আমার অন্তরের আলোক, আমার বাহিরের অন্তর, আমার নয়নের মণি, আমার সকলের সব, আমার সবের সকল—জীবনসর্ব্বস্ব তুমি আমার কোথায়?"—অপর পার হইতে কঠোর প্রতিধ্বনি কঠোর স্বরে, অমনি মুখের উপর ডাকিয়া বলিল—আর কোথায়। আকাশে সেই কঠোর স্বর নাচিয়া২ বলিল--আর কোথায়। দূরে সেই কঠোর স্বর মিলাইতে২ বলিল—আর কোথায়। স্তম্ভিত হইলাম।

মুহূর্ত্তেকের জন্য অন্তর্জ্জগতের অস্তিত্ব লোপ হইল। হায়! প্রতিধ্বনি সৃজন করিতে, পোড়া বিধাতাকে কে বলিয়াছিল?

ভাবী পতি রাজোন্নতি নিকেতন শ্রীল শ্রীযুক্ত যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স বাহাদুরের প্রতি

ভারতভূমির অভ্যর্থনা।

ভূমিকা।

"পঞ্চানা মপি ভূতানাম্ উৎকর্ষং
পুপুষু র্গুণাঃ।
নবে তস্মিন্ মহীপালে সর্ব্বং নবমিবাভবৎ।"
কালিদাস।

"নরেন্দ্র মূলায়তনাদনন্তরং।
তদাস্পদং শ্রীর্যুবরাজ সংজ্ঞিতম্॥
অগচ্ছ দংশেন গুণাভিলাষিণী।
নবাবতারং কমলাদিবোৎপলম্॥"
কালিদাস।

কে বলে ভারত-ভূমি বয়সে জরতী।
অপ্সরা আকারা নিত্য নবীন যুবতী॥
যথা কতশত গত দেব পুরন্দর।
একা শচী নিত্য নব, স্বর্গে নিরন্তর॥
মন্দার কুসুম সম লাবণ্য-নিলয়।
কাল কালসর্প শ্বাসে ম্লান নাহি হয়॥
আর যথা প্রভাতে প্রভাত কমলিনী।
প্রোষিতভর্ত্তৃকা সম প্রদোষে মলিনী॥
পুনরায় প্রভান্বিতা ভানুর উদয়ে।
ললিত লাবণ্যময়ী—তিমির অত্যয়ে॥
সেরূপ ভারতভূমি সময়ে সময়ে।
ম্লান মাত্র দুর্গতি-তামসী-তমোচয়ে॥
সুদিন উদয়ে পুন নব ভাবান্বিতা।
পুঞ্জ পুঞ্জ প্রমোদ-প্রভায় প্রভান্বিতা॥
ইংরাজের অভ্যুদয়ে বিভা-বিভাসিতা।
অদ্যাপি ছিলেন মাত্র অর্দ্ধবিকসিতা॥
যুবরাজ সমাগমে সীমা নাই সুখে।
আনন্দ মঙ্গলরব প্রস্ফুটিত মুখে॥

গীতি।

১

কহিছে ভারতভূমি, এসো এসো নাথ তুমি
মহামান্যা মহিষীর প্রথম নন্দন।
কিবা পিতা কিবা মাতা, কিবা পতি কিবা ভ্রাতা,
বহুদিন হেরে নাই দাসীর নয়ন॥
ওহে মম মনোচোর, তুমি ত হইবে মোর,
জাতি কুলধনমান প্রাণের ঈশ্বর।
এসো এসো হৃদে বস, হেরি মুখ তামরস,
সরস হউক মম মানস ভ্রমর॥
জরাজীর্ণ বটি আমি, তোমায় নিরখি স্বামি,
পুনরায় পাইলাম নবীন যৌবন।

পূর্ব্বাপূর্ব্ব রত্নাকর, আমার যুগল কর,
প্রসারিত পাইবারে প্রেম আলিঙ্গন॥
হের ওহে প্রিয়তম, হিমাদ্রি কপোলে মম,
ঝর ঝর আনন্দাশ্রু ঝরে অনুক্ষণ।
নিরখি তোমার মুখ, দূরে গেল সব দুখ,
করে বুক্ ধুক্ ধুক না সরে বচন॥
যত কুলবধূ ধনি, দেহ হুলাহুলী ধ্বনি,
করহ বিহিত মত মঙ্গলাচরণ।
ব্রাহ্মণ পড়হ বেদ, আর কি আমার খেদ,
না যাচিতে এসেছেন মম প্রাণধন॥
হৃদয়-রঞ্জন মম নয়ন-অঞ্জন।
দুর্গতি-গঞ্জন মম দাসীত্ব-ভঞ্জন॥

২

তুমি মম নহপর, গত শত সম্বৎসর,
তব মাতামহ কুলে পরিণীতা আমি।
তব অগ্রে যশোধন! মম পতি চারিজন,
একে একে সকলে হলেন স্বর্গগামী।
শোকানলে দহেগাত্র, পরিণীতা নামে মাত্র
দেখি নাই তাঁহাদের শ্রীমুখমণ্ডল।
পলাসীর যুদ্ধজয়, যেই দিবসেতে হয়,
সেই দিনে ভগ্ন মম দাসীত্ব-শৃঙ্খল॥
জয় ভেরী ঘোরধ্বনি, বিবাহ বাজনা গণি,
মম দেহে গোরোচনা যবন-রুধির।
কামান আতস-বাজী, বিজয়-পতাকা রাজী
প্রমোদ-পবনে কিবা হইল অস্থির॥
তার পর বারত্রয়, হইয়াছে পরিণয়,
হয় নাই কভু কিন্তু শুভ-দরশন।
সে আশা পূরিল আজ, এসো এসো যুবরাজ
লও হে প্রণয় পুষ্প ভকতি-চন্দন॥
যত কুলবধূ ধনি, দেহ হুলাহুলী ধ্বনি,
করহ বিহিত মত মঙ্গলাচরণ।
ব্রাহ্মণ পড়হ বেদ, আর কি আমার খেদ,
না যাচিতে এসেছেন মম প্রাণধন॥
হৃদয় রঞ্জন মম নয়ন-অঞ্জন।
দুর্গতি-গঞ্জন মম দাসীত্ব ভঞ্জন॥

৩

সুখের দিবস আজ, রোদনের কিবা কাজ
তবু কিছু শ্রীচরণে করি নিবেদন।
সত্যনিষ্ঠাতপোদানে; আর্জব অমিত জ্ঞানে,
ভূষিত ছিলেন মম পূর্ব্বপতিগণ॥
পুরূরবা কার্ত্তবীর্য্য, রাম নাম মহাবীর্য্য,
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিক্রম তপন।
তাঁহাদের নাম স্মরি, হৃদয় বিদরে মরি,
আর কি হইবে সেই সুদিন ঘটন॥
তার পর এলো কাল, এলো সে যবন কাল,
ঘোরী ঘোর শত্রু আর গজনীদুর্জ্জন।
মৎসরতা-মদে ভোর, রুধির শুষিল মোর,
নন্দন-নিকরে কত করিল নিধন॥
মধ্যে কিছুদিন ভাল, প্রসন্ন হইল ভাল,
রামরাজ্য আকবরের সুখের শাসন।
এসো এসো যুবরাজ, সে সুখ পেলাম আজ,
নিরখিয়া নাথ তব চারু চন্দ্রানন॥
যত কুলবধূ ধনি, দেহ হুলাহুলী ধ্বনী,
করহ বিহিত মত মঙ্গলাচরণ।
ব্রাহ্মণ পড়হ বেদ, আর কি আমার খেদ,
না যাচিতে এসেছেন মম প্রাণধন॥
হৃদয়-রঞ্জন মম নয়ন-অঞ্জন।
দুর্গতি-গঞ্জন মম দাসীত্ব ভঞ্জন॥

৪

শুন ওহে ভাবীবর, গুণের সাগরবর,
কৃতাঞ্জলি ভিক্ষা এই ও রাঙ্গা চরণে।

দীনা ক্ষীণা সুপ্রাচীনা, বলিয়া দাসীরে ঘৃণা,
করোনা করোনা প্রিন্স রেখোহে স্মরণে॥
ছেলেগুলি বটে কালো, কিন্তু পিতৃভক্তিআলো
সমুজ্জ্বল তাহাদের হৃদয় কমল।
কালো বলে অবহেলা, করনা প্রভুত্ব বেলা,
ক্ষুধা হলে খেতে দিও অন্ন আর জল॥
জননীর কাছে গিয়ে, বলিবে হে বিবরিয়ে,
ভকক্তিবৎসলা তিনি করুণার খনি।—
আমার যাতনা যত, সকলি ত অবগত
আছেন ইন্দিরারূপা ইণ্ডিয়াজননী॥

এককথা আছে বাকি, একথাটী সত্য নাকি,—
তুমি মোরে স্বপনে করিতে দরশন?
একথা শুনিয়া আর, সুখের নাহিক পার,
আনন্দের পারাবারে মগ্ন মম মন॥
এসো যত কুলবালা, সাজায়ে বরণ ডালা,
ঘন হুলাহুলী রবে ছাও হে গগন।
ব্রাহ্মণ পড়হ বেদ, আর কি আমার খেদ,
না যাচিতে এসেছেন মম প্রাণধন॥
হৃদয়রঞ্জন মম নয়নঅঞ্জন।—
দুর্গতিগঞ্জন মম দাসীত্বভঞ্জন॥

নৃত্য।

অনুপম বেশভূষায় অনুপমরূপিণী কত শত চাপল্যে নৃত্য করিতেছে; যেন আপনার সৌন্দর্য্যে আপনিই বিভোর হইয়া পরিবেষ্টমান অসংখ্য দর্শকদিগকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শোভা অকাতরে বিতরণ করিতেছে; যেন মুগ্ধা অসীমোৎসাহে নারী-সুলভ কৃপণতা হারাইয়াছে—বহুরূপিণী অসংখ্য চক্ষুগণে নিমেষ পরিবর্ত্তমান নবনব লক্ষচ্ছবি নিমেষে নিমেষে বিলাইতেছে—নানাভঙ্গী মধুর নানারূপের নানা জ্যোতি দেখাইতেছে—প্রফুল্ল উৎসের ন্যায় চারিদিকে সৌন্দর্য্য বর্ষণ করিতেছে। আসরের মধ্যস্থলে নর্ত্তকী: রমণীয় আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া চারিদিকে মণ্ডলাকারে লোকের শক্ত জমাট বাঁধিয়াছে। নর্ত্তকীর করদ্বয়ে ডমরু-বেণুরব-প্রোৎসাহিত গম্ভীর-ভুজঙ্গ-ফণায় ধীর মৃদুচাপল্য একবার অভিনীত হইল। পরক্ষণেই বাহুদ্বয়ে, উড্ডয়নচতুর ক্রীড়মান পক্ষীর পক্ষের নানা প্রকার লীলাবিধূনন অভিনীত হইতে লাগিল। উর্দ্ধাঙ্গে মন্দ বাতান্দোলিত বল্লবী গদ্গদ বিলাসে খেলিতে লাগিল। নর্ত্তকী কভু নারীর পুষ্পাবচয়ন অভিনয় করিল, কভু লজ্জাবতীর দেহের সলজ্জভাব, চরণের সলজ্জগতি, কভু যুবতীবিলাসিনীর বিলাস ভাব, বিলাসগতি, কভু খণ্ডিতার ক্রোধ কভু নবযৌবন চপলার নানা ছন্দে বক্ষলগ্ন করতল শয্যাশায়ী শিশুসোহাগ অভিনয় করিল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই কথাবিহীন ভঙ্গীজীবন মূকের অভিনয় তাললয়বদ্ধ, যেমন কথা-জীবন

কাব্য নাটক ছন্দে বদ্ধ। ভঙ্গী সকল তাল লয়ে আঁটা না হইলে ভাঁড়ের শিথিল ভাঁড়ামী হইত, নৃত্য হইত না। তাল লয়ের মধুর বন্ধনে বন্দিনী সুন্দরী নানাচ্ছন্দে নাচিতেছে; যেন ভুজঙ্গ বিলোল বিদ্যুচ্চপলার দেহের ভার নাই, মাংসাস্থি নাই; যেন জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ মাটি মাড়াইতেছে না, দর্শকদিগের নেত্রে নেত্রে নাচিতেছে। সাবাস্ সাবাস্! এইবার নর্ত্তকীর পৃথুল কলেবরের তরতর মণ্ডলগতি হইতেছে; যেন চতুর্দ্দিকের অসংখ্য চক্ষুতারকার আকর্ষণে, কামুকের ইহলোক বিপুল ভূমণ্ডল শন শন ঘুরিতেছে। এই কলেবর ঘূর্ণনের সৌন্দর্য্য কি? গমন কালে গজগামিনীর অঙ্গবিশেষ ধিকি ধিকি ঘুরিয়া থাকে, এই অঙ্গ দোলন মৃদুমন্থরচলন এতদ্দেশে বড়ই রমণীয় বলিয়া পরিজ্ঞাত; বাজারের প্রয়োজন বুঝিয়া মনোজ্ঞভঙ্গীসঙ্কলনকারী নৃত্য এই দোলনি অনুকরণ কবিতে শিখিল; অনুকরণে এই মন্দান্দোলন কেবল তাললয়ে বদ্ধ করা হইল না, আর বিস্তর পারিপাট্য বর্দ্ধিত করা হইল—স্বভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধিকি ধিকি ঘুরে, ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে নর্ত্তকীর মৃদুমন্থর গতিও হইতে থাকে, কিন্তু অনুকরণ নৃত্যে তত্তদঙ্গ শন শন ঘুরিতে লাগিল অথচ নর্ত্তকীর ঈষদপি গতি হইল না। অদ্বিতীয় ইন্দ্রজাল! অদ্বিতীয় নয়ন ছলনা! অতি দ্রুতগতিবোধক অঙ্গ ঘূর্ণন হইতেছে বস্তুতঃ কিন্তু গতি নাই—চমৎকার! চমৎকার!! স্বভাবকে অত্যন্ত চাঁচা ছোলা করিতে গেলেই এইরূপ বিকৃতি ঘটিয়া উঠে; কবির অতি নৈপুণ্যে নৈষধাদি কাব্যও এইরূপ বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছে;—আপাদ মস্তক মূর্চ্ছনালঙ্কৃত, গিটকারীতে বিভূষিত; যে অতিওস্তাদী দেখাতে যায় তাহার গীতও এইরূপ অতি ভূষণে কদাকার হইয়া পড়ে। নৃত্যকালে নর্ত্তকীকে পুরুষকর্কশা স্বৈরিণী জ্ঞান করিলে দর্শকের মনে মধুর ভাবতরঙ্গ উঠিতে পারে না, অভিনয়কালে শকুন্তলাকে যেমন ওপাড়ার বেহায়ে ছোঁড়া ভাবিলে ভ্রান্তিসুখের ব্যাঘাত পড়ে; কারণ নৃত্য, ভঙ্গীব্যক্ত অভিনয় বিশেষ, নৃত্যাভিনয়ে নারীর নানা মূর্ত্তি ক্রমান্বয়ে বিকসিত হইতে থাকে। উপরোক্ত নারী নৃত্যের গূঢ় সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে, কিন্তু সাদা চোকে সে সৌন্দর্য্য দেখা যায় না, কামমদোন্মত্ত চক্ষু চাই—করুণচক্ষে স্নেহচক্ষেও দেখিতে পাওয়া যায় না—জলাবষণে চক্ষু ঢাকিয়া আসে—সূক্ষ্মদৃষ্টি চলে না ॥

হায় নারি! তুমি এতগুণে গুণবতী বিশ্বার্দ্ধ হইয়াও গুণগ্রাহী পুরুষের কাছে তোমায় এত অপমান কেন? কামনয়নে তোমার দেখা আদর করা নয়, তোমার অপমান করা। তাল লয় শূন্য ভঙ্গী—ভাঁড়ামী, আবার মাতাল ভঙ্গী ব্যঞ্জনা বিহীন অর্থাৎ কোন প্রকার মনোভাব, মনোবৃত্তি ব্যঞ্জক না হইলে নৃত্য, ছন্দে গাঁথা কসূলৎ হইয়া পড়ে;—যেমন উড়িষ্যার "গুটি পোর" (একটি ছেলের) নাচ,

দেশীয় যাত্রায় ভিস্তীর নাচ, উপরোক্ত অতি নৈপুণ্যবিকৃত ঘূর্ণ্যমান নারীঅঙ্গ স্পন্দন।

এখনকার অনেক কাব্যও ছন্দে গাঁথা কসরৎ। মার্জ্জিতরুচি সহৃদয় দিগের মনোজ্ঞ হইতে নৃত্যের ভঙ্গী সকল সুপরিস্ফুটরূপে মনোভাব ব্যঞ্জক হওয়া আবশ্যক।

ব্যক্ত মনোবৃত্তির তারতম্যে দর্শকের আহ্লাদের তারতম্য হয়—লাস্যে নারীর কামোন্মাদ-সূচক ভঙ্গীগুলি অপেক্ষা লজ্জাবিনয় অমায়িকতা সূচক ভঙ্গীগুলি, সহৃদয়ের কাছে নিঃসন্দেহ অধিকতর মনোহর। এতদ্দেশীয় নৃত্যের প্রধান অভাব এই—বালক বালিকার নৃত্য নাই, পুরুষের নৃত্য নাই—বালক বালিকার নির্ম্মল কোমলানন্দ ভঙ্গীগুলি অভিনীত হয় না—পুরুষের দর্প, বীর্য্য, প্রেমাবেশ প্রভৃতি নানাভাবব্যঞ্জক কোন ভঙ্গীই অভিনীত হয় না। প্রাচীন নৃত্যের পুরুষনৃত্য তাণ্ডবভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে উর্দ্ধলাস্য ভাব আধমরা হইয়া আছে। এখন পুরুষকে নৃত্য করিতে হইলে নারী সাজিতে হয়,নহিলে পুরুষের ভাব ভঙ্গী অভিনয় অসংলগ্ন উপহাস ও বিরক্তিজনক হইয়া পড়ে।

বালিকা নর্ত্তকীর নৃত্য দেখিলে, এই ক্ষুদ্রপ্রাণী এত শিখিয়াছে ভাবিয়া বিরক্তি হয় না বটে, কিন্তু হাঁসিতে হাঁসিতে প্রাণ যায়,এমনি বয়স্থার উপযুক্ত অসঙ্গত অঙ্গভঙ্গী করে, যেন যুবতী দিগকে ব্যঙ্গ করিতেছে বোধ হয়। শেষে পাকামী আর সহে না বলিয়া উঠিয়া পলাইতে হয়। এতদ্দেশীয় নৃত্যের পুঁজিপাটা কেবল মাত্র কতিপয় স্ত্রীভঙ্গী। তাহাও অধিক নয় এবং তাহার অধিকাংশই বিলাস ভঙ্গী—অতি মাননীয় নারী চিত্তের স্বর্গীয় ভাবসূচক বিশুদ্ধ ভঙ্গী নাই বলিলেও বলা যায়। কেহ বলিতে পারেন জ্ঞান গম্ভীর্য্যের প্রতিকৃতি; পুরুষের নৃত্যই অসঙ্গত—নাচুক স্বল্পমতি বালক, নাচুক চপলতরল মতি রমণী, নাচুক শরীরসর্ব্বস্ব ইংরাজ, নাচুক মূঢ়মতি সাঁওতাল, তা বলিয়া কি মহামতি আর্য্যসন্তান নাচিবে? ভেলা, ডোঙ্গা, ডিঙ্গী স্বল্প তরঙ্গে নাচে সত্য, কিন্তু সময়েঃ মহত্তরঙ্গ ত উঠে; তখন ভাসমান গ্রামরূপী অর্ণব পোতেরাও নাচিতে থাকে। যোগি-শ্রেষ্ঠ, নির্ব্বিকার শূলপাণি নাচিতেন; তাঁরই নৃত্যের নাম তাণ্ডব। দিগ্বিজয়িজিৎ নিমাই পণ্ডিত, জ্ঞানপ্রতিম চৈতন্যদেবও সগণে সেদিন নাচিয়াছেন। মহোল্লাস স্রোতে সুস্থির থাকে কোন মর্ত্ত্যের সাধ্য? ইংরাজদের ন্যায় আবাল বৃদ্ধের নৃত্যশিক্ষা, নৃত্যচর্চ্চা অতি কর্ত্তব্য এত দূর প্রতিপন্ন করিতে আমরা এত কথা কহিলাম না—পুরুষের নৃত্য, পৌরুষেয় ভঙ্গী অভিনয় অসঙ্গত নয়, এই মাত্র আমাদের বলিবার অভিপ্রায়। যেমন নারীচিত্তের মধুর মার্দ্দব ব্যঞ্জক ভঙ্গীগুলি নটী তাললয়ে অভিনয় করে,তেমনি পুরুষের মধুর বীর্য্য গাম্ভীর্য্য ব্যঞ্জক ভঙ্গীগুলি নটে অভিনয় করিলে,

দেশীয় নৃত্যের সর্ব্বাঙ্গ সৌন্দর্য্য সাধিত হয়--আমাদের শেষ কথা গুলির এই মাত্র লক্ষ্য।

পুরুষের নৃত্য এত অসঙ্গত বোধ হইবার আর এক কারণ এই; আশৈশব দেখিয়া দেখিয়া নৃত্য নামের সঙ্গে আর হাত ঘুরাণ, অঙ্গ দুলান প্রভৃতির সঙ্গে মনে মনে যে দৃঢ় সম্বন্ধ বাঁধিয়া আছে, সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা, একটু স্থিরকল্পনার কাজ।

গ্রন্থে বর্ণিত কৃষ্ণনাচ, যাত্রার কৃষ্ণনাচ এবং আর অ'র কথা দ্বিতীয়বারে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

ক্রমশঃ

শৈশব সহচরী।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

স্বর্ণপ্রভা।

"আজ কেন আমার মন এত অস্থির হইয়াছে।" সুবর্ণ পুরের গগনস্পর্শী এক অট্টালিকার একটি সুসজ্জিত শয়নকক্ষে এক অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কোপরি বসিয়া একটি দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা পর্য্যঙ্কশায়ী একটি যুবা পুরুষের মুখ প্রতি চাহিয়া এই বাক্য বলিল, "আজ কেন আমার মন এত অস্থির হয়েছে।" শয়ন কক্ষে দীপালোক অতি ক্ষীণ জ্বলিতেছিল। রাত্রি ঘনান্ধকার, প্রায় দ্বিতীয় প্রহর; পৃথিবী নিশব্দ; কেবল নিকটস্থ জলাশয় হইতে বর্ষার অম্বুচরবর্গের কলরব, আর এই নিভৃত কক্ষে দুইটী স্ত্রীপুরুষের কথোপকথন হইতেছিল।

যুবক এই বাক্য শুনিবামাত্র উঠিয়া বসিয়া বাম হস্ত বালিকার বামস্কন্ধে আরোপণ করিয়া দক্ষিণহস্তে তাঁহার বদন ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কেন স্বর্ণ, কি জন্য তোমার মন এত অস্থির হইয়াছে?"

"তা জানিনে" বলিয়া স্বর্ণপ্রভা রজনীকান্তের বক্ষঃস্থলে মুখ লুকাইয়া ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

"কেন কেন, কি হইয়াছে?" রজনী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

স্বর্ণপ্রভা মুখ তুলিয়া রজনীর মুখপ্রতি দৃষ্টি করিয়া কাঁদিতে২ বলিলেন "কেবলই মনে হতেছে যেন আর তোমাকে দেখিতে পাইব না।" বলিয়া আবার রজনীর বক্ষঃস্থলে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দুই এক ফোঁটা নয়নবারি রজনীকান্তের চক্ষু হইতে আস্তে২ স্বর্ণপ্রভার গণ্ডদেশে পড়িল। অমনি স্বর্ণপ্রভা চমকিয়া উঠিয়া

রজনীর চক্ষে হস্তদিয়া পরীক্ষা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ রজনীর গলা ধরিয়া গদ্গদ স্বরে কহিলেন, "আমার মন সুস্থির হইয়াছে সব অসুখ সেরে গিয়াছে, আর কাঁদিব না।" এই বলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার রজনীর ক্রোড়ে অবোধ বালিকার ন্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। রজনী দুঃখিত হইয়া এই দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার অনুরাগ চিন্তা করিতেছিলেন। দুঃখিত হইবার কারণ এই যে, এই গাঢ় প্রেমের পরিবর্ত্তে স্বর্ণপ্রভাকে কেবল মাত্র তিনি কৃতজ্ঞতা দিতে পারিয়াছিলেন, তাহার প্রণয় দিতে অক্ষম হইয়াছিলেন, সে প্রণয় কেবল মাত্র তিনি কুমুদিনীর জন্য রাখিয়াছিলেন। এবম্বিধ চিন্তা করিতে২ রজনী অন্যমনস্ক হইলেন। পৃথিবী নিশব্দ, স্বর্ণপ্রভা নিঃশব্দে তাঁহার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া ক্ষীণ দীপালোকের প্রতি চাহিয়া আছেন। অকস্মাৎ রজনীকান্ত সাবধান সূচক রমণীকণ্ঠে "বিধু বিধু" বলিয়া খিড়কী দ্বার দেশে কে ডাকিতেছে, শুনিতে পাইলেন। রজনীকান্ত চমকিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন। স্বর্ণপ্রভাও রজনীর ক্রোড় হইতে মস্তক তুলিয়া রজনীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। পরে পুনঃপুনঃ উভয়েই সেই মৃদুস্বরে "বিধু বিধু" বলিয়া ডাকিতে শুনিতে পাইলেন। এই ভীষণগভীর তিমিরাবৃত যামিনীতে সেই স্বর শুনিয়া স্বর্ণপ্রভার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, বালস্বভাব সূচক উহাকে অনৈসর্গিক জ্ঞান করিলেন। রজনীকান্ত আস্তে২ উঠিয়া কক্ষদ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক ছাদের উপর আসিলেন। স্বর্ণপ্রভা দৃঢ় মুষ্টিতে রজনীর করধারণপূর্ব্বক সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। যে ছাদ হইতে খিড়কী দ্বার নিকট, উভয়ে সেই ছাদে আসিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না—অনন্ত অন্ধকারে পৃথিবী আচ্ছন্ন, গগনমণ্ডল অনন্ত মেঘান্ধকারে আবৃত, কেবল কোথাও দুই একটি বৃক্ষ, অসংখ্য খদ্যোতমালায় হীরকখচিত বৃক্ষের ন্যায় জ্বলিতেছিল, আর নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় হইতে বর্ষার অনুচরগণের কলরব শুনা যাইতেছিল। রজনীকান্ত খিড়কীর নিকটস্থ ছাদে আসিয়া পুনঃ২ সেই ডাক শুনিতে পাইলেন, কিন্তু মনুষ্যাবয়ব দেখিতে পাইলেন না। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি?" কোন উত্তর পাইলেন না—স্ত্রীলোক বোধ করিয়া স্বর্ণপ্রভা জিজ্ঞাসা করিলেন "কেগা তুমি?" স্ত্রীলোক উত্তর করিলেন "আমি কুমুদিনী। শিগ্গীর দোর খুলে দিতে বল।" স্বর্ণপ্রভা অতি কাতর স্বরে রজনীকে কহিলেন "ঐ দেখ আজ কি বিপদ্ ঘটিয়াছে। নহিলে দিদি কেনএতরাত্রে এখানে আসিবে।" তৎপরে বিধুকে জাগরিত করিয়া তাহাকে সবিশেষ অবগত করাইয়া খিড়কী দ্বার খুলিতে অনুমতি করিলেন। বিধু পূর্ব্বে স্বর্ণপ্রভার পিত্রালয়ের পরিচারিকা ছিল। এক্ষণে রজনীকান্তের সংসারে ঐ পদাভিষিক্ত। বিধু চক্ষু মুছিতে২ উঠিয়া "বড়দিদি এখানে

কেন” বলিতে২ খিড়কি দ্বার খুলিয়া দিল। কুমুদিনী অতি দ্রুত গৃহপ্রবেশ করিয়া বলিলেন, “বিধু, শীঘ্র আয়, স্বর্ণ কোথায়?”

বিধু। দিদি কি হয়েছে?

কুমু। “বল্‌চি, তুই শীঘ্র স্বর্ণ কোথা দেখাবি আয়।” দুই জনে অতি দ্রুত চলিলেন। বিধু খিড়কি দ্বার রুদ্ধ করিতে ভুলিয়া গেল, কিঞ্চিৎ দূরে স্বর্ণ প্রভার সহিত সাক্ষাৎ হইল। কুমুদিনী স্বর্ণপ্রভাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া কানে২ কি বলিলেন। স্বর্ণপ্রভা ওমা কি হবে বলিয়া, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে২ রজনীকান্তের নিকট গিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, “পলাও, ওগো পলাও।” রজনী বিস্মৃত হইয়া স্বর্ণের মুখপ্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “পলাইব কেন, কি হইয়াছে?” স্বর্ণপ্রভা তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে২ বলিলেন, “তোমায় খুন করিতে আসিতেছে—”

র। কে?

স্ব। তোমার শত্রু।

র। রতিকান্ত?

স্ব। হ্যাঁ।

র। তা ভয় কি, আসুক না কেন।

স্ব। সে অনেক লোক নিয়ে আসিয়াছে, ওগো পলাও।

র। ছি!

ইত্যবসরে উভয়েই রমণীকণ্ঠনিঃসৃত চীৎকার অতি নিকটে শুনিতে পাইলেন। রজনী স্বর্ণপ্রভার নিষেধ না শুনিয়া সেই দিকে আসিয়া দেখিলেন, যে দুইটি স্ত্রীলোক অচেতনপ্রায় প্রাঙ্গণে পতিত রহিয়াছে, এবং প্রাঙ্গণের দ্বার দিয়া অসংখ্য দস্যু একে একে প্রবেশ করিতেছে। যৌবন কালের উষ্ণ শোণিতের দুর্দ্দমনীয় বেগ প্রযুক্ত রজনীকান্ত নিকটস্থ দ্বার হইতে একটি অর্গল লইয়া পতঙ্গবৎ সেই অগ্নিতুল্য দস্যুদলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া প্রথম ব্যক্তিকে ভূমিশায়ী করিলেন। তৎপরে তিন চারিজন দস্যু কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া অনেকক্ষণ আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বর্ষাকালে প্রাঙ্গণ পিচ্ছিল হওয়াতে যেমন পদস্খলিত হইয়া ভূপতিত হইলেন অমনি এক জন দস্যু অসি নিষ্কোষিত করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিল। কিন্তু অসি তাঁহার অঙ্গ স্পর্শও করিল না, চকিতের ন্যায় পশ্চাৎ হইতে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া রজনীকান্তের দেহ আবরণ করিয়া আপনার অঙ্গে সেই অসির আঘাত গ্রহণ করিল, অমনি রজনী চীৎকার করিয়া বলিল “স্বর্ণ কি করিলি, আপনাকে নষ্ট করিলি।” অভাগিনী স্বর্ণ “এখনও শীঘ্র পলাও,” এই কথা বলিতে২ আর কথা কহিতে পারিল না। পাষণ্ড দস্যু এই ঘটনা দর্শন করিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া ছিল, তৎপরে যখন পুনরায় রজনীকে আঘাত অভিপ্রায়ে অসি উত্তোলন করিল। তখনি পশ্চাৎ হইতে দস্যুগণের মধ্যে ভীষণ চীৎকার শুনিতে পাইয়া সেইদিকে চাহিয়া দেখিল, বহুসংখ্যক পুলিষ কর্ম্ম

চারী ও রজনীর দ্বারবান্‌দিগের দ্বারায় দস্যুগণ বেষ্টিত হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে, এবং মুহূর্ত্তেক মধ্যে আক্রমণকারীর উত্তোলিত হস্ত দুই খণ্ড হইয়া এক খণ্ড অসিসহিত ভূপতিত হইল। রজনীকান্ত দেখিলেন যে, তাঁহার সমবয়স্ক অতিসুন্দর এক যুবাপুরুষ আসিয়া তাঁহার দ্বিতীয় বার প্রাণরক্ষা করিল। তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া আস্তে২ স্বর্ণপ্রভার দেহ বক্ষে করিয়া আপনার শয়নকক্ষে লইয়া গেলেন এবং সযত্নে সেই রক্তাক্ত দেহ আপন শয্যায় রক্ষণ করিয়া তাহার বদনচুম্বন করিলেন এবং দ্বারদেশে একজন পরিচারিকা রক্ষক রাখিয়া "স্বর্ণকে বুঝি হারাইলাম, কিন্তু কুমুদিনীকে যদি না বাঁচাইতে পারি তবে এ ছার জীবন রাখিয়া কি সুখ!" এই বলিয়া একখান তরবারি হস্তে লইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলেন যে, দস্যুরা পলায়ন করিয়াছে এবং পুলিষ কর্ম্মচারিগণ তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে, প্রাঙ্গণে কেবল মাত্র চারি পাঁচটি আহত ব্যক্তি আর দুইটি স্ত্রীলোক পতিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি স্ত্রীলোক পূর্ব্বস্থান হইতে অন্য এক স্থানে একটি যুবা পুরুষের বামহস্তে মস্তক রাখিয়া পতিত রহিয়াছে। রজনী চিনিলেন যে, স্ত্রীলোকটি কুমুদিনী, আর যুবা পুরুষটি তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা। একজন নিকটস্থ আহত পুলিষকে জিজ্ঞাসা করাতে জানিলেন, যে দস্যুরা পলায়ন সময়ে কুমুদিনীকে লইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে ঐ যুবক আসিয়া তাহাদিগের হস্ত হইতে কুমুদিনীকে উদ্ধার করেন, কিন্তু ঐ সময়ে দস্যুদিগের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় কুমুদিনীর সহিত ঐ স্থানে পতিত হইলেন। রজনী দ্রুত বারি আনিয়া কুমুদিনীর মুখে সিঞ্চন করাতে তিনি সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখে রজনীকে দেখিয়া মস্তকে অঞ্চল টানিতে২ অতি মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বর্ণ, স্বর্ণ কোথায়?" রজনী তদ্রূপ মৃদু স্বরে বলিলেন "স্বর্ণ শয়ন করিয়া আছে।"

রজনী জিজ্ঞাসা করিলেন "দস্যুরা আপনাকে কোনস্থানে কি আঘাত করিয়াছে?"

কু। না—কেবলমাত্র পড়িয়া যাওয়ায় মস্তকে আঘাত পাইয়াছি, তাহা কিছুই নয়। তৎপরে কুমুদিনী উঠিবার উপক্রম করিতে গিয়া দেখিলেন যে, এক যুবা পুরুষ তাহার নিকট পতিত রহিয়াছে এবং তাঁহার হস্তে মস্তক রক্ষা করিয়া তিনি পতিত ছিলেন। কুমুদিনী চমকিত হইয়া সলজ্জে উঠিয়া বসিলেন, এবং রজনীকান্তের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। রজনী বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "উনি কে, তাহা জানি না। কিন্তু দস্যুরা যখন তোমাকে লইয়া পলায়ন করে, তখন উনি তোমাকে পরিত্রাণ করিতে গিয়া তাহাদিগের দ্বারা আহত হইয়া, তোমাকে লইয়া এইস্থানে পতিত হয়েন।" তৎপরে কুমুদিনী প্রাঙ্গণ হইতে

উঠিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে দুই একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া সেই অপরিচিত যুবার মুখপ্রতি অবগুণ্ঠন হইতে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

আর স্বর্ণপ্রভা? সে ক্ষুদ্র প্রদীপের অল্প তৈল ফুরাইয়া আসিয়াছিল—আজিকার প্রচণ্ড বাত্যায় তাহা নিবিয়া গেল। সে ক্ষুদ্র ভেলা অগাধ সাগরে পড়িয়াছিল—এ ঘোর তরঙ্গে তাহা ডুবিল। আজিকার প্রচণ্ড তাপে স্বর্ণ কুসুম শুকাইল;—স্বর্ণসৌদামিনী মেঘে লুকাইল—ধুণ্ড বজ্রাঘাত রহিল। স্বর্ণ সেই অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল।

রজনী

পঞ্চম খণ্ড।

(লবঙ্গলতার উক্তি)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমি জানিতাম শচীন্দ্র একটা কাণ্ড করিবে—ছেলে বয়সে অত ভাবিতে আছে! দিদি ত একবার ফিরে চেয়েও দেখেন না--আমি বলিলে বিমাতা বলিয়া আমার কথা গ্রাহ্য করে না। ও সব ছেলেকে আঁটিয়া উঠা ভার। এখন দায় দেখিতেছি আমার। ডাক্তার বৈদ্য কিছু করিতে পারিল না—পারিবেও না। তারা রোগই নির্ণয় করিতে জানে না। রোগ হলো মনে—হাত দেখিলে, চোখ দেখিলে, জিহ্ব দেখিলে তারা কি বুঝিবে? যদি তারা আমার মত আড়ালে লুকাইয়া বসিয়া আড়িপেতে ছেলের কাণ্ড দেখ্‌ত, তবে একদিন রোগের ঠিকানা করিলে করিতে পারিত।

কথাটা কি? "ধীরে, রজনি!" ছেলে ত একেলা থাকিলেই এই কথাই বলে। রজনী কি করিয়াছে? তা জানি না, কিন্তু রজনীর সঙ্গে এ চিত্তবিকারের কোন সম্বন্ধ নাই কি? না থাকিলে সর্ব্বদা রজনীর নাম করে কেন? ভাল, রজনীকে একবার রোগীর কাছে বসাইয়া রাখিলে হয় না? কই, আমি রজনীর বাড়ী গিয়া-

ছিলাম সে ত, সেই অবধি আমার বাড়ী একবারও আসে নাই! তাহার যে অহ-ঙ্কার হইয়াছে, একথা সম্ভব নহে। বোধ হয়, লজ্জায় আসে না। ডাকিয়া পাঠাইলে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া আমি রজনীর গৃহে লোক পাঠাইলাম—বলিয়া পাঠাইলাম যে, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, একবার আসিতে বলিও।

দাসী ফিরিয়া আসিয়া বলিল রজনী গৃহে নাই। অনেক দিন হইল স্থানা-ন্তরে গিয়াছে। অমরনাথ বাড়ী আছে।

শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। স্থানান্তরে, কোথায় গিয়াছে, কবে আসিবে, দাসী তাহা কিছুই বলিতে পারিল না। পরের ঘরের কথা, অত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠা-ইতেও পারি না। মনেও বড় সন্দেহ হইল। স্থূল বৃত্তান্ত জানিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইলাম। কাহার নিকট জানিব?

স্বয়ং অমরনাথ ভিন্ন আর কাহার নিকট জানিব?

কিন্তু আমি স্ত্রীলোক, অমরনাথকে কোথায় পাইব? তাহার গৃহে স্ত্রীলোক নাই—আমি তাহার গৃহে যাইতে পারিব না। তবে কৌশলে অমরনাথকে আমা-দিগের গৃহে আনা যায়। সেই কৌশ-লের উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলাম।

মনে করিলাম,আগে একবার শচীন্দ্রের কাছে রজনীর কথা পাড়িয়া দেখি। তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের পীড়ার কোন সম্বন্ধ আছে কি না? সে সম্বন্ধ কি? বোধ হয়, আমাদিগের এই বর্ত্তমান দারিদ্র্য দুঃখ-জনিত মানসিক ক্লেশই শচীন্দ্রের এই মানসিক পীড়ার কারণ। রজনীই এই দারিদ্র্য দুঃখের মূল। অতএব রজনীর নাম শচীন্দ্রের মনে সর্ব্বদা জাগরূক হইবে বিচিত্র কি? যদি, এই সিদ্ধান্তই যথার্থ হয়, তবে অমরনাথকে ডাকাইয়া কি করিব?

অতএব প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য শচীন্দ্রের কাছে গিয়া বসিলাম। একথা ওকথার পর রজনীর প্রসঙ্গ ছলে পাড়ি-লাম। আর কেহ সেখানে ছিল না। রজনীর নাম শুনিবামাত্র বাছা অমনি, চমকিত হংসীর ন্যায় গ্রীবা তুলিয়া আমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। আমি যত রজনীর কথা বলিতে লাগিলাম, শচীন্দ্র কিছুই উত্তর করিল না, কিন্তু ব্যাকুলিত চক্ষে, আমার প্রতি চাহিয়া রহিল। ছেলে বড় অস্থির হইয়া উঠিল—এটা পাড়ে, সেটা ভাঙ্গে, এইরূপ আরম্ভ করিল। আমি পরিশেষে রজনীকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম; সে অত্যন্ত ধনলুব্ধা, আমাদিগের পূর্ব্বকৃত উপকার কিছুমাত্র স্মরণ করিল না। এইরূপ কথা-বার্ত্তা শুনিয়া শচীন্দ্র অপ্রসন্ন ভাবাপন্ন হইলেন, এমন আমার বোধ হইল, কিন্তু কথায় কিছু প্রকাশ পাইল না—শচীন্দ্র সে কথা ঢাকিয়া প্রসঙ্গান্তর উত্থাপিত করিলেন।

একটা কথা স্থির হইল—রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের মনের ভাব যাহাই হৌক—তাঁহার রাগ নাই। রাগ নাই, তবে কি—অনুরাগ? তাও কি সম্ভবে? অন্ধের প্রতি? আবার এত দিনের পর? যখন রজনী নিকটে ছিল—সুপ্রাপণীয়া ছিল, তখন ত ইহার কোন লক্ষণ দেখি নাই—এখন কেন হইবে?

যাহা হৌক, একবার রজনীকে, আনিয়া বাছাকে, দেখাইতে হইতেছে। উপায় কি? তখন, কর্ত্তার কাছে গেলাম। তাঁহাকে আমার মনের সন্দেহ সকল আভাস ইঙ্গিতে নিবেদন করিলাম। রজনীর যে সন্ধান করিয়া, অকৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহাও বলিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে উপায় কি? আমি বলিলাম "অমর নাথ ভিন্ন সবিশেষ সন্ধান আর কেহ বলিতে পারিবে না। তুমি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আন।" তিনি প্রথমে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু আমার কথা কতক্ষণ ঠেলিবেন? তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে স্বীকার করিলেন।

অমরনাথও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, যদি উকি ঝুকি মারিয়া আমাকে একবার দেখিতে পান, সে লোভ ছিল। পরদিন প্রাতে আসিয়া, অমরনাথ সশরীরে আমাদিগের ক্ষুদ্র গৃহে দর্শন দিলেন। আমি স্বামীকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার কাছে অনুমতি লইয়া অমরনাথের মনের সাধ পূরাইবার জন্য—তাহার আহারের নিকট পূতনা হইয়া বসিলাম। পূতনা—কেননা বিষপান করাইবার ইচ্ছা বিলক্ষণ ছিল। কিন্তু যেখানে বাক্য বিষ আছে সেখানে অন্য বিষের প্রয়োজন কি?

নারীজন্ম যেন কেহ গ্রহণ করে না। না করিতে হয় এমন কাজ নাই। যাহাতে মনের বড় বিরাগ, হাসিতে হাসিতে তাহাও করিতে হয়। বিষ, অমৃত উভয়ই প্রয়োগ করিতে হয়। সর্পী আমাদিগের অপেক্ষা ভাল—তাহার অমৃত নাই—কেবল বিষ আছে। সে ইচ্ছাধীন বিষপ্রয়োগ করে। লোকে সর্পীকে চিনে, তাহার নিকট দিয়া কেহ পথ হাঁটে না। নারী সর্পীর অমৃত আছে—সেই লোভে তাহার নিকটে আসিয়া, মূর্খ পুরুষ জাতি অনায়াসে দংশিত হয়—বিশ্বাসঘাতিনী নারী অনায়াসে দংশন করে। হায়! লবঙ্গসর্পীর কি হইবে?

রজনী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমি অমরনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রজনী কোথায়?"

এটি যেন দুম্ করিয়া কামান দাগিলাম। অমরনাথ বিত্রস্ত হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কথা কও না যে?"

অমর। এ কথা জিজ্ঞাসা কর কেন?

আমি। রজনীর সঙ্গে জানা শুনাছিল, তাহাকে ভাল বাসিতাম—না জিজ্ঞাসা করিব কেন?

অমর। স্ত্রী স্বামীর ঘরে থাকে, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ—সে কোথায় এ কথা জিজ্ঞাসা কেন?

আমি। রজনী তোমার ঘরে নাই, ইহা আমার কাছে বিশেষপ্রসিদ্ধ; কাল লোকের দ্বারা খবর আনিয়াছি, এজন্য জিজ্ঞাসা করি।

অমর। তবে সে স্থানান্তরে গিয়াছে।

আমি। কোথায় সে স্থানান্তর?

অমর। আমি যদি না বলি?

আমি। আমি যদি সকল কথা বলি?

অমর। তাহা হইলে আমার অনিষ্ট হইবে। তুমি এতদিন আমার যে অনিষ্ট কর নাই, এখন যে তাহা করিবে ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। তুমি আমাকে কেবল ভয় দেখাইতেছ, ইহা বুঝিয়াছি।

আমি। এখন তুমি আমার অনিষ্ট করিতেছ, আমি তোমার অনিষ্ট না করিব কেন?

অমরনাথ চমকিয়া উঠিল—"তোমার অনিষ্ট আমি কখন স্বপ্নেও কামনা করি না। তবে রজনীর বিষয়োদ্ধারের কথা যদি বল—"

আমি হাসিলাম। অমরনাথ বলিল, "তা জানি। সে অনিষ্টের জন্য তোমাদিগের রাগ নাই। তবে তোমার কি অনিষ্ট?"

আমি। আমার পুত্রের অনিষ্ট।

অ। শচীন্দ্র বাবুর? বিষয়ক্ষতি ভিন্ন আর কি অনিষ্ট করিয়াছি?

আমি। যদি তুমি মনোযোগ দিয়া সকল কথা শুন, তবে আমি বিশেষ বৃত্তান্ত বলি।

অ। এক্ষণে আহারে আমার বিশেষ মনোযোগ।

আমি। আমি যাহা বলিব তাহাতে তোমার আহার বন্ধ হইয়া যাইবে।

অ। এমন কথা কেন এখন বলিবে? নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আহারের বিঘ্ন করা অন্যায় কাজ হয়।

অমরনাথকে ব্যঙ্গপরায়ণ দেখিয়া আমি ক্রুদ্ধ হইলাম। বলিলাম, "আমিও রহস্য জানি। একটি রহস্যের কথা

বলি শুন। প্রথম যৌবনকালে লোকে আমাকে রূপবতী বলিত—”

অ। এটা যদি রহস্য তবে সত্য কোন্ কথা?

আমি। পরে শোন। সেই রূপ দেখিয়া এক চোর মুগ্ধ হইয়া, আমার পিত্রালয়ে, যে ঘরে আমি এক পরিচারিকা সঙ্গে শয়ন করিয়াছিলাম, সেই ঘরে সিঁধ দিল।

এই কথা বলিতে আরম্ভ করায়, অমরনাথ গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল। আহার ত্যাগ করিয়া বলিল, “ক্ষমা কর।”

আমি বলিতে লাগিলাম, “আহারে মনোযোগ কর না? সেই চোর সিঁধপথে, আমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল—আমি চোরকে চিনিলাম। ভীতা হইয়া পরিচারিকাকে উঠাইলাম। সে চোরকে চিনিত না। আমি তখন অগত্যা, চোরকে আদর করিয়া, আশ্বস্ত করিয়া পালঙ্কে বসাইলাম।”

অমর। ক্ষমা কর, সেত সকলই জানি।

আমি। তবু একবার স্মরণ করিয়া দেওয়া ভাল। ক্ষণেক পরে, চোরের অলক্ষ্যে আমার সঙ্কেতানুসারে পরিচারিকা বাহিরে গিয়া দ্বারবান্‌কে ডাকিয়া লইয়া সিঁধমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। আমিও সময় বুঝিয়া, বাহিরে প্রয়োজন ছলনা করিয়া, নির্গত হইয়া বাহির হইতে একমাত্র দ্বারের শৃঙ্খল বন্ধ করিলাম। মন্দ করিয়াছিলাম?

অমরনাথ বলিল, “এ সকল কথা কেন?”

আমি। পরে চোর নির্গত হইল কি প্রকারে বল দেখি? ডাকিয়া পাড়ার লোক জমা করিলাম। বড় বড় বলবান্ আসিয়া চোরকে ধরিল। চোর লজ্জায় মুখে কাপড় দিয়া রহিল, আমি দয়া করিয়া তাহার মুখের কাপড় খুলাইলাম না, কিন্তু স্বহস্তে, লোহার শলা তপ্ত করিয়া তাহার পিঠে লিখিয়া দিলাম,

“চোর!”

অমর বাবু অতিগ্রীষ্মেও কি আপনি গায়ের জামা খুলিয়া শয়ন করেন না?

অ। না

আমি। লবঙ্গলতার হস্তাক্ষর মুছিবার নহে। আজি আমার স্বামী চারিজন পাহারাওয়ালা আমার বাড়ীতে উপস্থিত রাখিয়াছেন; প্রয়োজন হয়, তাহারা আজ আমার হাতের লেখা পড়িবে।

অমর নাথ হাঁসিল এবং বলিল, “ধমক চমক কেন? কাজটা কি করিতে হইবে সহজে বলনা? রজনীর সন্ধান বলিয়া দিতে হইবে?”

আমি। তাহা হইলে এক্ষণে যথেষ্ট হইবে।

অমর। সহজ কথা; সে এক্ষণে কাশীবাস করিতেছে। বাঙ্গালিটোলা গোপাল অধিকারীর বাড়ীতে আছে।

আমি। একথা যদি মিথ্যা হয়?

অ। যদি মিথ্যা হয়, তবে তুমি আমার কি করিবে?

আমি। এই কলিকাতা নগর মধ্যে রাষ্ট্র করিব যে, অমর নাথ চোর—চোর বলিয়া তাহার পিঠে লেখা আছে। পুলিষ গিয়া, কামিজ খুলিয়া, পিঠ দেখিবে।

অ। তুমি কি তাহাতে রজনীকে পাইবে?

আমি। না।

অ। তবে?

আমি। তাইত! আহার কর।

অমরনাথ আহার সমাপন করিয়া আচমন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আচমনান্তে অমর নাথ বলিল, "সত্য কথা তোমাকে বলি নাই। ধমক চমকে সত্য কথা আমি বলিব না—তত কাপুরুষ নই। তুমি আমার অনিষ্ট করিতে পার সত্য; তাহাতে তোমার লাভ হইবে না—আমার ক্ষতি হইবে। সত্য২ তুমি আমার অনিষ্ট করিবে কি? একথা সত্য বলিও—আমি আন্তরিক সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি—তুমিও আন্তরিক সরলভাবে উত্তর দিও।"

অমরনাথ অতি বিনীতভাবে, সরল, মধুরভাবে এই কথা বলিল। আমিও আর কপটতা করিতে পারিলাম না—আমি বলিলাম,

"না—তোমার অনিষ্ট করিব না—অনেক অনিষ্ট করিয়াছি—একথা আন্তরিক বলিতেছি। তুমি আমার উপকার করিলে না—না কর, আমি তোমার অনিষ্ট করিব না।"

অমরনাথের চক্ষে জল আসিল। গদগদ স্বরে অমরনাথ বলিল, "লবঙ্গলতা, তুমিই জিতিলে। আমি আবার হারিলাম। আমায় বিশ্বাস কর। আমায় কি বিশ্বাস করিতে পার?"

সেত কঠিন কথা! যে তেমন গুরুতর অবিশ্বাসের কাজ করিয়াছিল, তাহাকে আবার বিশ্বাস করিব কি প্রকারে? কিন্তু সংসার অবিশ্বাসে চলে না। কেহ চিরদিন বিশ্বাসী নহে—কেহ চিরদিন অবিশ্বাসী নহে। কেন আবার অমরনাথকে বিশ্বাস করিব না? তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলাম—দেখিলাম সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সরল বিশ্বাসভূমি। আমি বলিলাম, "তোমায় বিশ্বাস করিব। শোন যাহা আমার বলিতে বাকি আছে, বলি।"

এই কথা বলিয়া আমি তখন শচীন্দ্রের এই রোগের বিবরণ আদ্যোপান্ত বলিলাম। শচীন্দ্র যে সর্ব্বদা প্রলাপ কালে রজনীর নাম করে, তাহাও তাহাকে বলিলাম। যে জন্য রজনীর সন্ধান করিতেছিলাম, তাহাও বলিলাম। বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

অমরনাথ অনেকক্ষণ নিরুত্তর হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল, "আজ আমি চলিলাম—আবার একদিন আসিতেছি, শীঘ্রই আসিব। আসিলে তোমায়

সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে ত?"

আমি। হইবে।

অমর। এইরূপ নির্জ্জনে?

আমি। যদি আবশ্যক হয়, তবে তাহাও পারি।

অমর। তাহাতে তোমার স্বামী তোমার প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না ত?

আমি চমকিয়া উঠিলাম। সন্দেহ? গুরুদেব জানেন! দ্রৌপদী সত্যভামাকে বলিয়াছিলেন, প্রদ্যুম্ন শাম্ব তোমার পুত্র সম্বন্ধ হইলেও স্বামীর অসাক্ষাতে তাহাদের কাছে থাকিও না—আমি অমরনাথের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ গোপনে সাক্ষাৎ করিলে তিনি অবিশ্বাস না করিবেন কেন? বিশেষ আমি সপত্নীর ঘর করি! আমি যুবতী, আমার স্বামী বৃদ্ধ, অমরনাথ যুবা, আবার পূর্ব্ব হইতে আমাতে অনুরক্ত—কেন সন্দেহ করিবেন না? আমি আপনিই কেন সন্দেহ করিতেছি না? অমরনাথ আজি আমার সমক্ষে চক্ষের জল ফেলিয়াছে—আমিও তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছি। দোষ নাই বটে, কিন্তু পাপ ছদ্মবেশেই প্রথম প্রবেশ করে। আমি কুলের বউ—ঘরের ভিতর থাকাই ভাল।

এই ভাবিয়া অমরনাথকে বলিলাম "যদি সে কথা মনে করিলে, তবে আমার সঙ্গে, তোমার আর সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল। যতদিন তোমাকে অবিশ্বাস করিয়াছি—ততদিন দেখা সাক্ষাতে ক্ষতি ছিল না—আজি তোমাকে বিশ্বাস করিয়াছি—আজি হইতে তোমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য নহে।"

এই কথা বলিয়া, আমি অমরনাথের মুখপানে চাহিয়া রহিলাম—মনে করিলাম বুঝি সে বলিবে, যে, "তোমার বিশ্বাস তুমি ফিরাইয়া লও।" অমরনাথ তাহা বলিল না—আমি সন্তুষ্ট হইলাম—এবং বুঝিতে পারিলাম যে, অমরনাথও আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইল।

অমরনাথ বলিল, "সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য নহে, আমি যেমন করিয়া হয়, তোমার কার্য্য সিদ্ধ করিব। তোমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব—আমার একটি ক্ষুদ্র ভিক্ষা আছে—এখন বলিব কি?"

আমি। কি?

অমর। না এখন না—আর একবার দেখা দিও—সেই সময় বলিব।

অমরনাথ প্রসন্নচিত্তে বিদায়গ্রহণ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন কোথা হইতে সেই পূর্ব্বপরিচিত সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, তিনি শচীন্দ্রের পীড়া শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন। কে তাঁহাকে শচীন্দ্রের পীড়ার সম্বাদ দিল তাহা কিছু বলিলেন না।

শচীন্দ্রের পীড়ার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনিলেন। পরে শচীন্দ্রের কাছে বসিয়া

নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রণাম করিবার জন্য আমি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। প্রণাম করিয়া, মঙ্গল জিজ্ঞাসার পর বলিলাম,

"মহাশয় সর্ব্বজ্ঞ; না জানেন, এমন তত্ত্বই নাই। শচীন্দ্রের কি রোগ, আপনি অবশ্য জানেন।"

তিনি বলিলেন, "উহা বায়ুরোগ। অতি দুশ্চিকিৎস্য।"

আমি বলিলাম, "তবে শচীন্দ্র সর্ব্বদা রজনীর নাম করে কেন?"

সন্ন্যাসী বলিলেন "তুমি বালিকা, বুঝিবে কি? (কি সর্ব্বনাশ, আমি বালিকা! আমি শচীর মা!) "এই রোগের এক গতি এই যে, হৃদয়স্থ লুক্কায়িত এবং অপরিচিত ভাব বা প্রবৃত্তি সকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং অত্যন্ত বলবান্ হইয়া উঠে। শচীন্দ্র কদাচিৎ আমাদিগের দৈববিদ্যা সকলের পরীক্ষার্থী হইলে, আমি এক বীজমন্ত্রাঙ্কিত যন্ত্র লিখিয়া তাঁহার উপাধানতলে রাখিয়া দিলাম, বলিয়া দিলাম যে, যে তাঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসে তিনি তাহাকে স্বপ্নে দেখিবেন। শচীন্দ্র রাত্রিযোগে রজনীকে স্বপ্নে দেখিলেন। স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে আমাদিগকে ভাল বাসে বুঝিতে পারি, আমরা তাহার প্রতি অনুরক্ত হই। অতএব সেই রাত্রে শচীন্দ্রের মনে রজনীর প্রতি অনুরাগের বীজ গোপনে সমারোপিত হইল। কিন্তু রজনী অন্ধ, এবং ইতর লোকের কন্যা, ইত্যাদি কারণে সে অনুরাগ পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। অনুরাগের লক্ষণ স্বহৃদয়ে কিছু দেখিতে পাইলেও শচীন্দ্র তৎপ্রতি বিশ্বাস করেন নাই। পরে অমরনাথের গৃহে রজনীকে যে অবস্থায় শচীন্দ্র দেখিয়াছিলেন, তাহাতেই সেই পূর্ব্বরোপিত বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। কিন্তু তখন রজনী পরস্ত্রী, শচীন্দ্র সে ভাবকে মনে স্থান দেন নাই। তাহার লক্ষণ দেখিবামাত্র দমন করিয়াছিলেন। ক্রমে ঘোরতর দারিদ্র্যদুঃখ তোমাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা শচীন্দ্রই তাহাতে গুরুতর ব্যথা পাইলেন। অন্য মনে, দারিদ্র্য দুঃখ ভুলিবার জন্য শচীন্দ্র অধ্যয়নে মন দিলেন। অনন্যমনা হইয়া বিদ্যালোচনা করিতে লাগিলেন। সেই বিদ্যালোচনার আধিক্য হেতু, চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। তাহাতেই এই মানসিক রোগের সৃষ্টি। সেই মানসিক রোগকে অবলম্বন করিয়া রজনীর প্রতি সেই বিলুপ্তপ্রায় অনুরাগ পুনঃপ্রস্ফুটিত হইল। এখন আর শচীন্দ্রের সে মানসিক শক্তি ছিল না, যে তদ্দ্বারা তিনি সেই অবিহিত অনুরাগকে প্রশমিত করেন। বিশেষ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই সকল মানসিক পীড়ার কারণ যেং গুপ্ত মানসিক ভাব বিকশিত হয়, তাহা অপ্রকৃত হইয়া উঠে। তখন তাহা বিকারের স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। শচীন্দ্রের সেইরূপ এ বিকার।"

আমি তখন কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, যে "ইহার প্রতীকারের কি উপায় হইবে?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি ডাক্তারি শাস্ত্রের কিছুই জানি না। ডাক্তরদিগের দ্বারা এরোগ উপশম হইতে পারে কি না তাহা বিশেষ বলিতে পারি না। কিন্তু ডাক্তারেরা কখন এ সকল রোগের প্রতীকার করিয়াছেন, এমত আমি শুনি নাই।

আমি বলিলাম যে, "অনেক ডাক্তর দেখান হইয়াছে, কোন উপকার হয় নাই।"

স। সচরাচর বৈদ্য চিকিৎসকের দ্বারাও কোন উপকার হইবে না।

আমি। তবে কি কোন উপায় নাই?

স। যদি বল, তবে আমি ঔষধ দিই।

আমি। আপনার ঔষধের অপেক্ষা কাহার ঔষধ? আপনিই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। আপনি ঔষধ দিন।

স। তুমি বাড়ীর গৃহিণী। তুমি বলিলেই ঔষধ দিতে পারি। শচীন্দ্রও তোমার বাধ্য। তুমি বলিলেই সে আমার ঔষধ সেবন করিবে। কিন্তু কেবল ঔষধে আরোগ্য হইবে না। মানসিক পীড়ার মানসিক চিকিৎসা চাই। রজনীকে চাই।

আমি। রজনী আসিবে, আমি এমত ভরসা পাইয়াছি।

স। কিন্তু রজনীর আগমনে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহাও বিবেচ্য। এমন হইতে পারে যে, রজনীর প্রতি এই অপ্রকৃত অনুরাগ, রুগ্নাবস্থায় দেখা সাক্ষাৎ হইলে বদ্ধমূল হইয়া স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরস্ত্রীর প্রতি স্থায়ী অনুরাগের অপেক্ষা কষ্টকর মহাপাপ আর কি আছে?

আমি। রজনীর আসা ভাল হউক মন্দ হউক তাহা বিচার করিবার আর সময় নাই। ঐ দেখুন রজনী আসিতেছে।

সেই সময়ে একজন পরিচারিকা সঙ্গে রজনী আসিয়া উপস্থিত হইল। অমরনাথ স্বয়ং তাহাকে সঙ্গে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন, এবং আপনি বহির্ব্বাটীতে থাকিয়া, পরিচারিকার সঙ্গে তাহাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

রজনী অনিষ্টকারিণী কি ইষ্টকারিণী হইয়া আসিল, তাহা বলিতে পারি নাই, কিন্তু আমি যে অমরনাথকে বিশ্বাস করিয়া ভুল করি নাই, ইহা বুঝিয়া আনন্দিত হইলাম।

অমরনাথ অবিশ্বাসী থাকিলেই আমার পক্ষে ভাল হইত? কোন্ মূর্খে একথা বলিবে? কন্দর্পের রূপ আর হরিশ্চন্দ্রের সত্যপরায়ণতা একত্রিত হইলেও লণিত লবঙ্গলতা লণিত লবঙ্গলতাই থাকিবে। ইহলোকে লবঙ্গলতার এই গর্ব্ব।

লজ্জা কেন করি।

কোপ ভয় প্রভৃতি অনুভবের ন্যায় লজ্জা সুখের অনুভব নয়, লজ্জা দুঃখময়ী। ক্রোধ ব্যতীত আর সকল প্রকার দুঃখের অনুভবে অনুভাবীর শরীর যেমন জড় সড় কুণ্ঠিত হয় সেইরূপ লজ্জারও বাহ্য লক্ষণ শরীরের জড়তা; বাড়ীর বাহিরে চলিতে হইলেই লজ্জাবতী কুলকামিনীর চরণে চরণ বাধে। লজ্জার প্রকোপে হেঁট মস্তক, বসিলে উঠা যায় না, উঠিলে চলা যায় না। কখন কখন লজ্জায় আমরা অতি তীব্র দুঃখ সহিয়া থাকি; ইচ্ছা হয় যে পৃথিবী দ্বিধা ভগ্ন হউক্ ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া লজ্জার উৎপীড়ন হইতে এড়াই; ইচ্ছা হয় সূর্য্য চিরদিনের জন্য নিবিয়া যাউক্, যেন কেহ মুখের এ কলঙ্ককালিমা না দেখিতে পায়। লজ্জা নম্রতা নয়, লজ্জা অনুভব বিশেষ, নম্রতা জ্ঞান বিশেষ। লজ্জায় নম্রতায় উভয় অবস্থায়ই মনুষ্যের দীনভাব বটে, কিন্তু সলজ্জাবস্থায় আমরা দুঃখী, নম্রতায় সুখী। অভিমানীর লজ্জা, নিরভিমানীর নম্রতা। লজ্জাগ্রস্ত লজ্জা ঝাড়িয়া ফেলিতে যত্নবান্ হন, বিনয়ী ঘোর আয়াসে নম্রতা ধরিয়া রাখেন। নম্রতায় দীক্ষিত হইয়াই ধার্ম্মিক সদানন্দ হইতে শিখেন, জ্বালাময় জগৎ রূপী রৌরবে থাকিয়াও চর্ম্ম দেহ অক্ষত রাখিতে পারেন, সশরীরে স্বর্গভোগ করেন। লজ্জা যদি নম্রতা না হইল, লজ্জায় যদি এত দুঃখ, তবে এ অনুভব চিরকালই এত লোক প্রিয় কেন? সমাজ-শাসন-বিধি দোষীর প্রিয় নয়, যাহাদের সুখের জন্য শাসন গুলি বিধি-বদ্ধ হইয়াছে তাহাদেরই প্রিয়। লজ্জা, লজ্জাবান্‌কে লোকের মন যোগাইয়া চালায়; বৈদিককালে ভীরু আর্য্যকে লজ্জা, অসিচর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে দিত না, এখন ভারতীয় আর্য্যকুলতিলক প্রখর বুদ্ধি বঙ্গীয় যুবক, মহোৎসাহে উৎসাহিত হইলেও লজ্জায় অসিচর্ম্ম ধরিতে পারেন না। লোকের মন যোগাইয়া চালাইলে, শুদ্ধ লোক-সামান্য প্রচলিত ধর্ম্ম রক্ষা হয়; অতএব অলোক-সামান্য অপ্রচলিত ভদ্রতানুশীলন করাইতে লজ্জা নিতান্ত অক্ষম; পবনসহায়ে পক্ষীর অনন্ত উন্নতি হয় না, যাবৎ পবনের প্রতাপ তাবৎ উঠিয়া থাকে।

লজ্জার শাসনে সম্পূর্ণ উপকার হয়ই না ত, সর্ব্বদা অপকারও হইয়া থাকে; নবীন সৌখীন ইয়ার ছিন্ন মলিনবসনে বাজারে যাইতে পারিলেন না, বর্ষীয়সী জননী সেদিন অনাহারে রহিলেন; কুম্ভীরে আসিয়া বঙ্গ-বধূর বসন ধরিল, ভয়ে বিহ্বলা হইয়া বধূ বস্ত্র ফেলিয়া নদীকূলে উঠিলেন, বিবসনা, উঠিয়াই দেখেন, সম্মুখে, ওপাড়ার পাঁচুঠাকুরপো, এবার লজ্জায় বিহ্বলা হইয়া সলিল-বসন

পরিবার জন্য লজ্জাবতী, জলে ঝাঁপ দিলেন; নক্র বলিল, " এ লজ্জা সলিল-বসনে ঢাকে না, এস, তোমায় উদরে লুকাইয়া রাখি।" দেখাগেল যে লজ্জার শাসন অসম্পূর্ণ আবার অপকারক; তবে লজ্জার এত আদর কেন? এখন প্রায় সর্ব্বলোকব্যাপী শাসন আর নাই বলিয়া। গর্ব্বের শাসন সর্ব্বব্যাপী হইলে কি হয়? ইহা অধিকতর অসম্পূর্ণ এবং অধিকতর অপকারক।

একমাত্র উৎকৃষ্ট শাসন, প্রেমানুভবের শাসন, কিন্তু এশাসন আজও সর্ব্বলোক-ব্যাপী হইয়া উঠে নাই; জগতের দুই চারিটি মাত্র লোক যথার্থ প্রেমিক, প্রেমের শাসনে শাসিত। সেই সকল কোন অপকর্ম্ম করিতে পারেন না কারণ, প্রেমে তিরস্কার করে, অন্যায় করিলেই প্রেমের তাড়নায় অস্থির হইয়া কাঁদিতে হয়। কবে যে প্রেমের শাসন সর্ব্বলোকব্যাপী হইবে বলা যায় না তবে এটি নিশ্চয় যে, সর্ব্বলোকে প্রেমানুভব বলবান্ হইয়া উঠিলে লজ্জার আর আদর থাকিবেনা। কবি আর* Fie! for Godly shame!" বলিয়া, লজ্জা-প্রভুর নামোল্লেখ করিয়া, লজ্জার ভয় দেখাইয়া কর্ত্তব্যে অনাবিষ্ট মনকে উৎসাহ দিবেন না। সৈন্যাধ্যক্ষ আর লজ্জার দোহাইদিয়া সেনাগণকে উত্তেজিত করিবেন না। উত্তেজিত করিবেন না—কারণ, যে হৃদয়ের অধিপতি প্রেম, সে হৃদয়ে লজ্জার প্রভুত্ব চলেনা। তখন সকলেই প্রেমের দোহাই দিবেন; আর সুষুপ্ত মন জাগিয়া নাচিয়া উঠিবে। লজ্জাবতীর অভিধানে তখন সুখ্যাতি করা হইবে না; নির্লজ্জ বলিলে তখন আর নিন্দা করা হইবে না। এই মহদ্বিপর্য্যয়ের কারণ আমরা ক্রমে পরিস্ফুট করিতেছি।

যীশু.খৃষ্ঠ, চৈতন্য, কবীর, সেণ্ট ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার, নানক প্রভৃতি প্রেমের দাস হইয়া অবধি লজ্জা খোয়াইয়াছিলেন। শুদ্ধ বাল্য লীলায় চৈতন্যদেবকে কখন কখন লজ্জিত হইতে দেখা যায়, আর নয়। কেহ বলিতে পারেন লজ্জার যন্ত্রণা ইহাদের কখন সহিতে হয় নাই, কারণ, কখন অন্যায় কাজ করেন নাই। একথা মিথ্যা; পুণ্যময় জগদীশ ব্যতীত অন্যায় সকলেই করিয়া থাকেন, তবে আমাদের অন্যায় একরূপ, এই সকল মনুষ্য দেবতাদের অন্যায় একরূপ। সেণ্ট জেভিয়ার ভাবিলেন—কি অন্যায় করিতেছি—পল্লীস্থ, গ্রামস্থ, দেশস্থ গুটিকতক মাত্র লোককে ঈশ্বরের মহিমা বুঝাইয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া আছি, আর এসিয়ার কোটি২ লোক আজ পর্য্যন্ত যীশু খৃষ্টের নামও শুনিল না; ধন-দাস পোর্ত্তুগিস্ বণিকেরা দস্যুভয় করিল না, কুৎসিত দেশের নারকীয় জল বায়ুর ভয় করিল না, আমি ঈশ্বরের দাস হইয়াভীত হইব! ছি! ছি! আমায় ধিক্! আমার ভণ্ড প্রেমে ধিক্! এই অন্যায় দেখিবার

* *Troilus and Cressida* Act II Scene II.

জন্য আজও আমাদের চোক্ ফুটে নাই। বস্তুতঃ অন্যায় দেখিবার চোক্ অনন্ত কাল পর্য্যন্ত পরিস্ফুট হইতে থাকে। ইহলোকে দর্পান্ধ হইয়া আমরা দুই চারিটি মাত্র অন্যায় দেখিতে পাই। যত ধার্ম্মিক হওয়া যায়, ততই পাপ দেখিবার চক্ষু ফুটে। রাম প্রসাদ যে গাইতেন "ওমা পাপ করেছি রাশি রাশি" এশুধু নম্রতার কথা নয়, রামপ্রসাদের হৃদয়ের কথা। তার পর, লজ্জার যন্ত্রণা সহিতে অন্যায়ই যে করিতে হয় এমন নহে, অন্যায় না করিয়াও লোকে লজ্জিত হয়; ঠাকুর-ঝি আসিয়া বলিলেন—বৌ তুমি নাকি আজ বড় গলা বার করে্য গান কবেছ? ওঁরা সর্ব্বাই বল্‌ছেন। বৌ যদি মুখরা গর্ব্বিতা হন তাহলে রাগ করিবেন, কোমোর বাঁধিয়া ঝগড়া করিতে ধাইবেন, আর, সুশীলা হইলে, "ওমা কোথায় যাবো আমি উঠিয়া পর্য্যন্ত ভাঁড়ারে" ইত্যাদি বলিবেন, আর সেদিন লজ্জায় কাহার ও সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিবেন না। মিথ্যাপবাদ শুনিয়াও লজ্জা হয়, কারণ, অভিমান সুখের অবসানে লজ্জা দুঃখের উদয়, এবং সুখ্যাতিই অভিমানের জীবন। যখন ধর্ম্মের ক, খ, গ ধরিলেই অভিমান প্রথমে ভাঙ্গিতে হয় তখন উপরোক্ত মনুষ্য-দেবতাদের লজ্জা থাকিবে কেন?

কবীরের দোঁহা—নিন্দুক্ বেচারা থা
ভলা মনকা ময়লা ধোয়।
অ্যায়সা ইয়ার মর্ গেয়া কবীর বৈঠকে
রোয়্।"

চৈতন্যের অহরহ জপ—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

যীশু কৃষ্ণের মুখের বুলি

"For the meek is the Kingdom of Heaven"

শুদ্ধ এঁদের কেন, ধার্ম্মিক মাত্রেরই এই এক বুলি। অতএব ধার্ম্মিক মাত্রেই নির্লজ্জ। কিন্তু প্রেমিক না হইয়া নির্লজ্জ হইলে দুই কুল যায়; উভয় শাসনের বহির্ভূত থাকিয়া, সমাজের কণ্টকস্বরূপ মহা অত্যাচারী হইয়া পড়িতে হয়। নির্লজ্জ হওয়া কেবল প্রেমিকদেরই সাজে, আত্মম্ভরি স্বার্থপরেব নয়। "মন বাক্সের লজ্জা তালা" খুলিযা লইতে হইলে অন্য আর একটি দৃঢ়তর তালা লাগান চাই। হৃদয় প্রেমাধিকৃত হইলে কোপ, ভয়, লজ্জা দর্প প্রভৃতি সকল অনুভবই অন্তর্হিত হয়; একেশ্বর হইয়া, হৃদয়ে প্রেম, রাজত্ব করিতে থাকে। যথার্থ প্রেমিক একানুভাবী প্রেমময় চৈতন্যের অর্থ, চৈতন্যের প্রেম ব্যতীত অন্য কোন অনুভব ছিল না; চৈতন্য প্রেমের প্রতিমা। কেহ বলিতে পারেন, যে চিত্তের এই একাবস্থতা বিকৃতিমাত্র। এখানে ইহার প্রতিবাদ করিতে গেলে মূলকথা ঢাকিয়া পড়ে, এই জন্য আমরা প্রবন্ধান্তরে ইহার খণ্ডন বরিব। বাইবেল বলেন, (3rd *Genesis—The punishment of Adam*) পাপরূপা লজ্জার সঞ্চার হইয়াই, আদম ইবের স্বচ্ছ হৃদয় প্রথম

কলুষিত হয়। কেন? মহাপুস্তক বাইবেল এমন অযৌক্তিক কথা কেন কহিলেন? লজ্জায় আবার দোষ কি? সে কি? খ্রীষ্টান কবি, খ্রীষ্টান সৈন্যাধ্যক্ষ, খ্রীষ্টান নারী, খ্রীষ্টান আবালবৃদ্ধ সকলেই যে, পদে পদে লজ্জার দোহাই দিয়া থাকেন, তবে লজ্জা কলঙ্কিনী কেন? সত্যসত্যই লজ্জা কলঙ্কিনী। যাঁদের উপাস্য পুস্তকে লজ্জা সর্ব্বনাশিনী বলিয়া বর্ণিত,তাঁরাই যে লজ্জার দোহাই দিবেন বিচিত্র নয়, কারণ, খ্রীষ্টানেরা খ্রীষ্টানী উপদেশ বত্নগুলি আজকাল চক্চকে বাইবেল-বাক্সে বন্ধ করিয়াই রাখেন, তবে, স্বার্থসাধন প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া কলাপের সময় কখন২ ব্যবহার করেন। বাইবেলের আদম ইবের উপকথা সমীচীন ইতিহাস জ্ঞান করিয়া আমরা বাইবেলের প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম না; কিন্তু গল্পটি সত্যমূলক অতি সুন্দর রূপক বলিয়া বিশ্বাস করি। বাইবেলের ইডেন নামক পার্থিব স্বর্গের বর্ণন; নির্ম্মাত,নিষ্পিত,অত এব জনকজননী-ঈশ্বরে নিতান্ত নির্ভর, অক্ষম, অহিংসক, কাল্পনিক আদি-জীব শৈশবের বর্ণন মাত্র; (কারণ প্রবীণ বিজ্ঞানের মতে প্রকৃত ঘটনার বর্ণন হইতে পারে না)। তখন, শার্দ্দূল শিশু, মেষ শিশু, মহিষ শিশু, মনুষ্য শিশু, সকল শিশুই সচ্ছন্দে একত্রে বাস করিতে পারে। তার পরই জ্ঞানসঞ্চার বর্ণিত হইয়াছে, সঙ্গে২ স্বাবলম্বন, স্বাধীনতা, অভিমান, লজ্জা, পাপ; শেষে পাপের তরঙ্গ দেখা দিল। শিশুর যেমন আত্মতা, স্বাধীনতা থাকে না, জনকজননীর যা ইচ্ছা শিশুরও সেই ইচ্ছা, ঈশ্বর ভক্তেরা আত্মতা স্বাধীনতা তেমনি বিসর্জ্জন দিয়া ঈশ্বরের কাছে শিশু হইতে চান। তাই, শৈশবের ছবি দেখিয়া, প্রায়ই স্বর্গের ছবি চিত্রিত হইয়া থাকে। লজ্জার মূল দূষিত; লজ্জা অভিমানপূর্ব্বা। জগতে দুঃখ মাত্রই পাপের ফল, লজ্জা দুঃখ, লজ্জাও পাপের ফল। লজ্জা অভিমান পাপের ফল। অভিমানে লজ্জায় আলোকান্ধকার সম্বন্ধ; একের আবির্ভাবে অপর অন্তর্হিত হয়। অভিমানে সুখের অনুভব; কিন্তু ক্ষণিক সুখ, স্থায়ী নয়, অভিমান ভগ্ন হইবেই হইবে। কেহ বলিতে পারেন—যদি অভিমানসুখের অন্তর্দ্ধানে লজ্জা দুঃখের উদয় হয়, তাহলে অভিমান যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হইতে পারে, সেই চেষ্টাই ধর্ম্ম। দিবার ন্যায় অভিমানকে ঘোর আয়াসেও বহুক্ষণ ধরিয়া রাখিবার যো নাই, অন্ধকার আসিবেই আসিবে; প্রতিদিন একথার পরীক্ষা হইতে পারে; শুদ্ধ তর্কেও ইহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়। তাই এই চির-অবিশ্বাসী মিত্রকে পরিত্যাগ করাই সুখ এবং ধর্ম্ম। তার পর, অভিমানে আত্মোন্নতি এবং পরোপকার দুই হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়, এবং সর্ব্বদাই অপকার ঘটিয়া থাকে।

প্রেমময়ী মিরাণ্ডার (Miranda) চরিত্র-বৈচিত্র্য, চরিত্রমাধুর্য্য এই, যে,

তাঁহাকে আশৈশব বনে রাখিয়া, সংসারের নানাপ্রকার অভিমান শিখিতে দেওয়া হয় নাই; অন্তর্যামী কবিও তাঁহাকে লজ্জাবিহীনা করিয়াছেন।

ঠকিয়া২ শেষ বেলায়, মানব কতক মত বুঝেন যে, অভিমানে পদে২ অনিষ্ট, পদে২ অসুখ। স্বভাব মত নিজ বিদ্যাবুদ্ধি ক্ষমতা মত চলাই সুখ। সূর্য্যকিরণ ধরিয়া চাঁদ সাজা, আর পরের সুখে সুখী হওয়া কিছুই নয়, বড় বিড়ম্বনা; বুঝিয়া বৃদ্ধ কতক মত নিলজ্জ হইয়া পড়েন নির্লাজ দেখিয়া, বৃদ্ধের তরুণ তরুণী স্বজনেরা সর্ব্বদা মনে২ বড়ই বেজার হইয়া থাকেন।

লজ্জার স্বরূপ পরিস্ফুট করিবার জন্য আমরা অভিমান সম্বন্ধে দুইচারি কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম। জ্ঞানে অভিমানের ধ্বংস, অজ্ঞানেই অভিমানের উদয়, স্থিতি, প্রাদুর্ভাব। ময়ূরপুচ্ছচূড়, উদ্ধিচিত্রিতানন অসভ্য দলপতি আহার্য্য অন্বেষণে দ্বীপের যে পর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া থাকেন, সেই কতিপয় যোজনমেয়া সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে কাহাকেও আপনার অপেক্ষা বলশালী দেখিতে পান না: অজ্ঞানময় দর্প কিয়ৎপরিমাণেও ভাঙ্গিবার জন্য দেশান্তরের শৌর্য্য অবিদিত; আবার, মনুষ্যমাহাত্ম্য মাপিতে বলবীর্য্য ব্যতীত, অন্যরূপ মানদণ্ডও যে হইতে পারে তাহাও অজ্ঞাত; অতএব, অসভ্য দলপতি অক্ষুণ্ণ-মহিষগর্ব্বে, অভগ্ন আশীবিষতেজে বিঘ্নকারী উগ্রগতি বায়ুকেও আক্রমণ করিতে তেজ করিয়া উঠেন। কুমারসম্ভবে, তারকাসুরের কথায়, এই আসুরিক গর্ব্বের অতি সুন্দর রূপক-বর্ণনা আছে। অবাধ্য হইলে এ গর্ব্ব বিষধর, পুত্রকেও হস্তী পদতলে নিক্ষেপ করেন; বরদ হইলে, অভীষ্ট দেবের পূজা করিবেন, বিঘ্নকারী হইলে, দেবতার প্রতিও রক্তচক্ষে খড়্গ হস্ত হইতে কুণ্ঠিত নন; শরীরের কোন অঙ্গও যদি অসুস্থ হইয়া কথা না শুনে, কোপোন্মাদে তাহাকেও কাটিতে উদ্যত; প্রশংসার জন্য লালায়িত হন। স্তুতিগীতে ইহাকে ঈষত্তুষ্ট করা যাইতে পারে, বাধ্য করা যাইতে পারে না। ভাবেন, স্তুতিগায়ক কর্ত্তব্যই করিতেছে, বাধ্য, চরিতার্থ হইব কেন? পর-প্রশংসা সহিতে পারেন না, শুনিলে, রাগে জ্বলিয়া উঠেন; নিজগর্ব্বানুভব সুখেই পরিতৃপ্ত, গদ্গদ; ইন্দ্রিয় আর দম্ভসুখ ব্যতীত অন্য সুখ জানেন না; আজ্ঞাকারী, সুখদ বলিয়া কন্যাপুত্র চান, ভৃত্য বলিয়া অপরকে চান। এই শুম্ভ নিশুম্ভ-কংস-রাবণ হিরণ্যকশিপুর রাক্ষসগর্ব্ব কদাপি ক্ষুণ্ণ হইলে লজ্জা হয় না, লজ্জা-দুঃখের পরিবর্ত্তে ক্রোধ দুঃখ হয়। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে২ এই আসুরিক দর্প সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইতে থাকে। সভ্য-সমাজ হইতে কিন্তু অদ্যাপিও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। তবে তমসাচ্ছন্ন অসভ্য সময়ের মত এখন তেমন

প্রচণ্ড নয়, আভাঙ্গা কেউটার মত তেমন ভীষণ নয়।

এখন এই গর্ব্ব, যৌগিক পদার্থের মূল ভূতের ন্যায় মিশ্রাবস্থায় নির্জ্জীব হইয়া আছে। জলীয় হইয়া পড়িয়াছে, তেমন খাঁটি দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনও কেহ২ দর্প ভাঙ্গিলে ক্ষণিক লজ্জা ভোগ করিয়াই কুপিত হয়। এখন ও কেহ২ পরপ্রশংসা শুনিলে গর্ব্ব নেশা ছুটিয়া যাইবার আশঙ্কায় বিরক্ত হন। অভিমান ক্ষয়ে লজ্জার উৎপত্তি, ইহা এই আসুরিক দম্ভ সম্বন্ধেই খাটে না। অভিধানে, অভিমান শব্দের প্রতিবাক্য গর্ব্ব, দম্ভ, হইলেও প্রচলিত প্রাকৃতে অভিমানের যেরূপ কোমল অর্থ, প্রায় সেইরূপ কোমল অর্থে আমরা এই প্রবন্ধে অভিমান কথাটি ব্যাহার করিয়াছি। সেন্টিগ্রেড্ চিত্তোত্তাপ-মানের (গরিমা-তাপমানের) শূন্য অংশে অভিমান, শততম অংশে আসুরিক গর্ব্ব। গর্ব্বিতের গর্ব্বক্ষয়ে ক্রোধ উপস্থিত হয়, অভিমানীর অভিমান ক্ষয়ে লজ্জা উপস্থিত হয়। গর্ব্ব অভিমান দুই সুখ, কোপ লজ্জা দুই দুঃখ। অভিমান মৃদুসামগ্রী, গর্ব্ব অতি তীব্র উগ্র পদার্থ। অভিমান লোকের কথা শুনিয়া লোকের মনোমত হইয়া চলে। পাছে কেহ অক্ষম, হীন, ছোট বলে, এইভয়ে গর্ব্ব, লোকের কথায় ভ্রূক্ষেপ করে না, সকল লোককে নীচ ভাবে, আপনার গুমারে গোঁ মত চলে। অভিমানী, আপন গুণ সংখ্যায় অসম্পূর্ণতা দেখিতে পান, দেখিয়া, হয় ঢাকিয়া রাখেন, নয় পরিপূরণ করিতে চেষ্টা করেন; গর্ব্বিত, আপন গুণসংখ্যার অসম্পূর্ণতা দেখিতে পান না। লজ্জা মনের লুক্কায়িত অভিমান দেখাইয়া দেয়, ক্রোধ লুক্কায়িত দম্ভ দেখাইয়া দেয়। ক্রোধ গর্ব্বের জ্বলন্ত চিহ্নস্বরূপ। সেই জন্য, কতক মত জ্ঞানবান্ হইলেই, আমরা পিতা মাতা গুরুজনের সমক্ষে সাধ্যমত ক্রোধ প্রকাশ করি না এবং প্রকাশিত কোপ লজ্জিত হইয়া সম্বরণ করিয়া লই। গুরুজনের সমক্ষে রাগ করিলেই গর্ব্ব দেখান হয়, গুরুজনের ক্ষমতা ঠেলিয়া ফেলিয়া আপন ক্ষমতা প্রকাশ করা হয়, গুরুজনকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়।

গড়ের মাঠের ইডেন পার্ককে কাননহইতে উঠাইয়া আনিবার সময়

বনস্থলীর প্রতি মিস্ ইডেনের উক্তি।

মরি কার নয়ন জুড়াইতে
এত রূপের ছড়াছড়ি——বনস্থলি!
যাই চল রাজ স্থানে,
নেচে বালক যুবতীযুবা সম্ভাষিবে গানেগানে
যাই চল রাজ স্থানে॥
বংশীধ্বনি উঠবে কত,
হেঁসে বালক যুবতী যুবা প্রদক্ষিণে যাবে যত
ভেরীধ্বনি উঠবে কত।
শুধু সঙ্গে নে তোর পাখীগুলি,
তোর হার্‌মোনিয়া মধুর-বুলি;
এমনি মাখবে তারা পুষ্পধুলি॥
শুধু সঙ্গে নে তোর গুল্ম গুলা,
যেন নানা রঙের ছত্র খুলা,
কিবা আপনি বাঁধা ফুলের তোড়া,
যেন পুষ্প ভরা সবুজ ঝোড়া॥
মরি সঙ্গে নে তোর পাদ্য-জল
তনু স্রোতস্বতী নিরমল,
চরণতলে সাপিনী ছলে
থাক্‌বে পোড়ে অবিরল,
যেন ভূমি-তড়িৎ অচঞ্চল॥

আরো সঙ্গে নে তোর তুঙ্গ শাখায়
গুচ্ছ ফুলের লাল চূড়া;
ও তোর লতায় গাঁথা ফুলের দড়া॥
শুধু সঙ্গে নে তোর ফল ফুল,
সেথা বসাইব অলিকুল॥
আমাদেরও শশী আছে—
দিন দিন ফুল ফলে সিনানিতে বিন্দুজলে;
আমাদেরও বায়ু আছে—
তোর পক্কপাতা পাকা চুলে তরেতরে ফেলবে [তুলে
আমাদেরও শশী আছে—
রাত্রে অলি জুটাইতে ফুল কুলে হাঁসাইতে;
আমাদেরও ভানু আছে—
বসাইতে শিশুফলে পড়াইতে পাখীদলে।
মরি কার নয়ন জুড়াইতে
এত রূপের ছড়াছড়ি বনস্থলি!
যাই চল রাজস্থানে,
নেচে বালক যুবতী যুবা সম্ভাষিবে গানেগানে
যাইচল রাজ-স্থানে॥

সাম্য।

তৃতীয় প্রস্তাব।—স্ত্রীজাতি।

মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকার বিশিষ্ট—ইহাই সাম্যনীতি। স্ত্রীগণ ও মনুষ্য জাতি, অতএব স্ত্রীগণ ও পুরুষের তুল্য অধিকার-শালিনী। যে২ কার্য্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই২ কার্য্যে অধিকার থাকা, ন্যায় সঙ্গত।

কেন থাকিবে না? কেহ কেহ উত্তর করিতে পারেন, যে স্ত্রী পুরুষে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে; পুরুষ বলবান্,স্ত্রী অবলা; পুরুষ সাহসী, স্ত্রী ভীরু; পুরুষ ক্লেশ সহিষ্ণু, স্ত্রী কোমলা; ইত্যাদি ইত্যাদি; অতএব যেখানে স্বভাবগত বৈষম্য আছে, সেখানে অধিকারগত বৈষম্য থাকাও বিধেয়। কেন না, যে যাহাতে অশক্ত, সে তাহাতে অধিকারী হইতে পারে না।

ইহার দুইটি উত্তর সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিলেই আপততঃ যথেষ্ট হইবে। প্রথমতঃ স্বভাবগত বৈষম্য থাকিলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাকা ন্যায়সঙ্গত, ইহা আমরা স্বীকার করি না। এ কথাটি সাম্য তত্ত্বের মূলোচ্ছেদক। দেখ, স্ত্রী পুরুষে যেরূপ স্বভাবগত বৈষম্য, ইংরেজ বাঙ্গালিতেও সেইরূপ। ইংরেজ বলবান্, বাঙ্গালি দুর্ব্বল; ইংরেজ সাহসী, বাঙ্গালি ভীরু; ইংরেজ ক্লেশসহিষ্ণু, বাঙ্গালি কোমল; ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি এই সকল প্রকৃতিগত বৈষম্য হেতু অধিকার বৈষম্য ন্যায্য হইত,তবে আমরা ইংরেজ বাঙ্গালি মধ্যে সামান্য অধিকার বৈষম্য দেখিয়া এত চীৎকার করি কেন? যদি স্ত্রী দাসী, পুরুষ প্রভু, ইহাই বিচার সঙ্গত হয়,তবে বাঙ্গালি দাস, ইংরেজ প্রভু, এটিও বিচার সঙ্গত হইবে।

দ্বিতীয় উত্তর এই, যে সকল বিষয়ে, স্ত্রীপুরুষে অধিকার বৈষম্য দেখা যায় সে সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষে যথার্থ প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখা যায় না। যতটুকু দেখা যায়, ততটুকু কেবল সামাজিক নিয়মের দোষে। সেই সকল সামাজিক নিয়মের সংশোধনই সাম্যনীতির উদ্দেশ্য। বিখ্যাতনামা জন ষ্টুয়ার্টমিলকৃত এতদ্বিষয়ক বিচারে, এই বিষয়টি সুন্দররূপে প্রমানীকৃত হইয়াছে। সে সকল কথা এখানে পুনরুক্ত করা নিষ্প্রয়োজন।*

স্ত্রীগণ সকল দেশেই পুরুষের দাসী। যে দেশে স্ত্রীগণকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া না রাখে, সে দেশেও স্ত্রীগণকে পুরুষের উপর নির্ভর করিতে হয়, এবং সর্ব্ব প্রকারে আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া মন যোগাইয়া থাকিতে হয়।

এই প্রথা সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে চিরপ্রচলিত থাকিলেও, এক্ষণে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে এক সম্প্রদায় সমাজতত্ত্ববিদ্ ইহার বিরোধী। তাঁহারা সাম্যবাদী। তাঁহাদের মত এই যে স্ত্রী ও পুরুষে সর্ব্বপ্রকারে সাম্য থাকাই উচিত। পুরুষগণের যাহাতে যাহাতে অধিকার, স্ত্রীগণের তাহাতে তাহাতেই অধিকার থাকাই উচিত। পুরুষে চাকরি করিবে, ব্যবসায় করিবে,স্ত্রীগণে কেন করিবে না? পুরুষে রাজসভায়, ব্যবস্থাপক সভায়, সভ্য হইবে, স্ত্রীলোকে কেন হইবে না? নারী পুরুষের পত্নী মাত্র, দাসী কেন হইবে?

আমাদের দেশে যেপরিমাণে স্ত্রীগণ পুরুষাধীন, ইউরোপে বা আমেরিকায় তাহার শতাংশও নহে। আমাদিগের

* *Subjection of Women.*

দেশ অধীনতার দেশ, সর্ব্বপ্রকার অধীনতা ইহাতে বীজমাত্রে অঙ্কুরিত হইয়া, উর্ব্বরা ভূমি পাইয়া বিশেষ বৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। এখানে প্রজা যেমন রাজার নিতান্ত অধীন, অন্যত্র তেমন নহে; এখানে অশিক্ষিত যেমন শিক্ষিতের আজ্ঞাবহ, অন্যত্র তেমন নহে; এখানে যেমন শূদ্রাদি ব্রাহ্মণের পদানত অন্যত্র কেহই ধর্ম্মযাজকের তাদৃশ বশবর্ত্তী নহে। এখানে যেমন,দরিদ্র ধনীর পদানত, অন্যত্র তত নহে। এখানে স্ত্রী যেমন পুরুষের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, অন্যত্র তত নহে।

এখানে রমণী পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী; যে বুলি পড়াইবে, সেই বুলি পড়িবে। আহার দিলে খাইবে, নচেৎ একাদশী করিবে। পতি অর্থাৎ পুরুষ দেবতা স্বরূপ; দেবতা স্বরূপ কেন, সকল দেবতার প্রধান দেবতা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। দাসীত্ব এতদূর, যে পত্নীদিগের আদর্শস্বরূপা দ্রৌপদী সত্যভামার নিকট আপনার প্রশংসা স্বরূপ বলিয়াছিলেন যে তিনি স্বামীর সন্তোষার্থ সপত্নীগণেরও পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন।

এই আর্য্য পাতিব্রত ধর্ম্ম অতি সুন্দর; ইহার জন্য আর্য্যগৃহ স্বর্গতুল্য সুখময়। কিন্তু পাতিব্রতের কেহ বিরোধী নহে; স্ত্রী যে পুরুষের দাসীমাত্র, সংসারের অধিকাংশ ব্যাপারে স্ত্রীলোক অধিকারশূন্যা, সাম্যবাদীরা ইহারই প্রতিবাদী।

অস্মদ্দেশে স্ত্রীপুরুষে যে ভয়ঙ্কর বৈষম্য তাহা এক্ষণে আমাদিগের দেশীয়গণের কিছু২ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং কয়েকটী বিষয়ে বৈষম্য বিনাশ করিবার জন্য সমাজমধ্যে অনেক আন্দোলন হইতেছে। সে কয়টি বিষয় এই—

১ম। পুরুষকে বিদ্যাশিক্ষা, অবশ্য করিতে হয়; কিন্তু স্ত্রীগণ অশিক্ষিতা হইয়া থাকে।

২য়। পুরুষের স্ত্রীবিয়োগ হইলে, সে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে অধিকারী। কিন্তু স্ত্রীগণ বিধবা হইলে, আর বিবাহ করিতে অধিকারিণী নহে; বরং সর্ব্বভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া চিরকাল ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে বাধ্য।

৩য়। পুরুষে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকে গৃহপ্রাচীর অতিক্রম করিতে পারে না।

৪র্থ। স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পরেও অন্য স্বামিগ্রহণে অধিকারী নহে, কিন্তু পুরুষগণ স্ত্রী বর্ত্তমানেই, যথেচ্ছা বহুবিবাহ করিতে পারেন।

১। প্রথম তত্ত্ব সম্বন্ধে,সাধারণ লোকেরও একটু মত ফিরিয়াছে। সকলেই এখন স্বীকার করেন, কন্যাগণকে একটু লেখাপড়া শিক্ষা করান ভাল। কিন্তু কেহই প্রায় এখনও মনে ভাবেন না, যে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণও নানাবিধ সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি কেন শিখিবে না? যাঁহারা, পুত্রটি এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে বিবপান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই কন্যাটি কথামালা

সমাপ্ত করিলেই চরিতার্থ হন। কন্যাটিও কেন যে পুত্রের ন্যায় এম, এ পাশ করিবে না, এপ্রশ্ন বারেক মাত্রও মনেস্থান দেন না। যদি কেহ, তাঁহাদিগকে এ কথা জিজ্ঞাসা করে তবে, অনেকেই প্রশ্নকর্ত্তাকে বাতুল মনে করিবেন। কেহ প্রতিপ্রশ্ন করিবেন, মেয়ে অত লেখা পড়া শিখিয়া কি করিবে? চাকরি করিবে না কি? যদি সাম্যবাদী সে প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলেন, "কেনই বা চাকরি করিবে না?" তাহাতে বোধ হয় তাঁহারা হরিবোল দিয়া উঠিবেন। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি উত্তর করিতে পারেন, ছেলের চাকরিই যোটাইতে পারি না, আবার মেয়ের চাকরি কোথায় পাইব? যাঁহারা বুঝেন, যে বিদ্যোপার্জ্জন কেবল চাকরির জন্য নহে, তাঁহারা বলিতে পারেন, "কন্যাদিগকে পুত্রের ন্যায় লেখা পড়া শিখাইবার উপায় কি? তেমন স্ত্রী বিদ্যালয় কই?"

বাস্তবিক, বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে বলিলেও হয়, স্ত্রীগণকে পুরুষের মত লেখা পড়া শিখাইবার উপায় নাই। এতদ্দেশীয় সমাজমধ্যে সাম্য তত্ত্বান্তর্গত এই নীতিটি যে অদ্যাপি পরিস্ফুট হয় নাই—লোকে যে স্ত্রীশিক্ষার কেবল মৌখিক সমর্থন করিয়া থাকে, ইহাই তাহার প্রচুর প্রমাণ। সমাজে কোন অভাব হইলেই তাহার পূরণ হয়—সমাজ কিছু চাহিলেই তাহা জন্মে। বঙ্গবাসিগণ যদি স্ত্রীশিক্ষায় যথার্থ অভিলাষী হইতেন তাহা হইলে তাহার উপায়ও হইত।

সেই উপায় দ্বিবিধ। প্রথম, স্ত্রীলোকদিগের জন্য পৃথক্ বিদ্যালয়—দ্বিতীয় পুরুষবিদ্যালয়ে স্ত্রীগণের শিক্ষা।

দ্বিতীয়টির নামমাত্রে, বঙ্গবাসিগণ জ্বলিয়া উঠিবেন। তাঁহারা নিঃসন্দেহ মনে বিবেচনা করিবেন, যে পুরুষের বিদ্যালয়ে স্ত্রীগণ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে, নিশ্চয়ই কন্যাগণ বারাঙ্গণাবৎ আচরণ করিবে। মেয়েগুলা ত অধঃপাতে যাইবেই; বেশীরভাগ ছেলেগুলাও যথেচ্ছাচারী হইবে।

প্রথম উপায়টি উদ্ভাবিত করিলে, এ সকল আপত্তি ঘটে না বটে, কিন্তু আপত্তির অভাব নাই। মেয়েরা মেয়ে কালেজে পড়িতে গেলে পর, শিশুপালন করিবে কে? বালককে স্তন্যপান করাইবে কে? গৃহকর্ম্ম করিবে কে? বঙ্গীয় বালিকা চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে মাতা ও গৃহিণী হয়। ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে যে লেখা পড়া শিখা যাইতে পারে তাহাই তাহাদের সাধ্য। অথবা তাহাও সাধ্য নহে—কেননা ত্রয়োদশ বর্ষেই বা কুলবধূ বা কুলকন্যা, গৃহের বাহির হইয়া বই হাতে করিয়া কালেজে পড়িতে যাইবে কি প্রকারে?

আমরা এ সকল আপত্তির মীমাংসায় এক্ষণে প্রবৃত্ত নই। আমরা দেখাইতে চাই, যে যদি তোমরা সাম্যবাদী হও, তাহা হইলে যতদিন না সম্পূর্ণরূপে সর্ব্ববিষয়ক সাম্যের ব্যবস্থা করিতে পার, তত

দিন, কেবল আংশিক সাম্যের বিধান করিতে পারিবে না। সাম্যতত্ত্বান্তর্গত সমাজনীতি সকল পরস্পরে দৃঢ় সূত্রে গ্রন্থিত, যদি স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বত্র সমাধিকার বিশিষ্ট হয়, তবে ইহা স্থির যে কেবল শিশুপালন ও শিশুকে স্তন্যপান করান স্ত্রীলোকের ভাগ নহে, অথবা একা স্ত্রীরই ভাগ নহে। যাহাকে গৃহধর্ম্ম বলে, সাম্য থাকিলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই তাহাতে সমান ভাগ। একজন গৃহ কর্ম্ম লইয়া বিদ্যাশিক্ষায় বঞ্চিত হইবে, আর একজন গৃহ কর্ম্মের দুঃখে অব্যাহতি পাইয়া বিদ্যাদিশিক্ষায় নির্ব্বিঘ্ন হইবে, ইহা স্বভাব সঙ্গত হউক বা না হউক, সাম্য সঙ্গত নহে। অপর পক্ষে পুরুষগণ নির্ব্বিঘ্নে যেখানে সেখানে যাইতে পারে, এবং স্ত্রীগণ কোথাও যাইতে পারিবে না, ইহা কদাচ সাম্য সঙ্গত নহে। এই সকল স্থানে বৈষম্য আছে বলিয়াই বিদ্যাশিক্ষাতেও বৈষম্য ঘটিতেছে বৈষম্যের ফল বৈষম্য। যে একবার ছোট হইবে, তাহাকে ক্রমে ছোট হইতে হইবে।

কথাটি আর এক প্রকার বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে।

স্ত্রীশিক্ষা বিধেয় কি না? বোধ হয় সকলেই বলিবেন "বিধেয় বটে।"

তার পর জিজ্ঞাসা, কেন বিধেয়? কেহ বলিবেন না যে চাকরীর জন্য।* বোধ হয় এতদ্দেশীয় সচরাচর সুশিক্ষিত লোকে উত্তর দিবেন, যে স্ত্রীগণের নীতিশিক্ষা জ্ঞানোপার্জ্জন এবং বুদ্ধি মার্জ্জিত করিবার জন্য, তাহাদিগকে লেখা পড়া শিখান উচিত।

তার পর, জিজ্ঞাস্য যে, পুরুষগণকে বিদ্যা শিক্ষা করাইতে হয় কেন? দীর্ঘ কর্ণ দেশীগর্দ্দভশ্রেণী বলিবেন, চাকরির জন্য, কিন্তু তাঁহাদিগের উত্তর গণনীয়ের মধ্যে নহে। অন্যে বলিবেন, নীতিশিক্ষা, জ্ঞানোপার্জ্জন, এবং বুদ্ধি মার্জ্জনের জন্যই পুরুষের লেখা পড়া শিক্ষা প্রয়োজন। অন্য যদি কোন প্রয়োজন থাকে তবে তাহা গৌণ প্রয়োজন, মুখ্য প্রয়োজন নহে। গৌণ প্রয়োজনও স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান।

অতএব বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই অধিকারের সাম্য স্বীকার করিতে হইল। এ সাম্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ উপরিকথিত বিচারে অবশ্য কোথাও ভ্রম আছে। যদি এখানে সাম্য স্বীকার কর, তবে অন্যত্র সে সাম্য স্বীকার করনা কেন? শিশুপালন, যথেচ্ছা ভ্রমণ, বা গৃহ কর্ম্ম সম্বন্ধে সে সাম্য স্বীকার করনা কেন? সাম্য স্বীকার করিতে গেলে, সর্ব্বত্র সাম্য স্বীকার করিতে হয়।

উপরে যে চারিটি সামাজিক বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয়। বিধবাবিবাহ ভাল কি মন্দ, এটি স্বতন্ত্র কথা। তাহার বিবেচনার স্থল এ নহে। তবে ইহা বলিতে

* সাম্যবাদী বলিবেন, চাকরীর জন্যও বটে।

পারি,যে কেহ যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, স্ত্রীশিক্ষা ভাল কি মন্দ ? সকল স্ত্রী লোক শিক্ষিত হওয়া উচিত কি না, আমরা তখনই উত্তর দিব,স্ত্রীশিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকর ; সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হওয়া উচিত ; কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আমাদিগকে কেহ সেরূপ প্রশ্ন করিলে আমরা সেরূপ উত্তর দিব না। আমরা বলিব, বিধবাবিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল। যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্ব্বপতিকে আন্তরিক ভাল বাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্ব্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না ; যে জাতিগণের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল জাতির মধ্যেও পবিত্রস্বভাববিশিষ্টা, স্নেহময়ী, সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না। কিন্তু যদি কোনবিধবা, হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়া হউন, পতির লোকান্তর পরে পুনঃপরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী। যদি পুরুষ পত্নী বিয়োগের পর পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে অধিকারী হয় তবে সাম্যনীতির ফলে স্ত্রী পতিবিয়োগের পর অবশ্য, ইচ্ছা করিলে, পুনর্ব্বার পতি গ্রহনে অধিকারিনী। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, "যদি" পুরুষ পুনর্ব্বিবাহে অধিকারী হয়, তবেই স্ত্রী অধিকারিণী, কিন্তু পুরুষেরই কি স্ত্রী বিয়োগান্তে দ্বিতীয় বার বিবাহ উচিত? উচিত, অনুচিত, স্বতন্ত্রকথা ; ইহাতে ঔচিত্যানৌচিত্য কিছুই নাই। কিন্তু মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার আছে, যে যাহাতে অন্যের অনিষ্ট নাই, এমত কার্য্যমাত্রই প্রবৃত্তি অনুসারে করিতে পারে। সুতরাং পত্নীবিযুক্ত পতি, এবং পতিবিযুক্ত পত্নী ইচ্ছা হইলে পুনঃপরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে। .

অতএব বিধবা, বিবাহে অধিকারিণী বটে। কিন্তু এই নৈতিক তত্ত্ব অদ্যাপি এদেশে সচরাচর স্বীকৃত হয় নাই। যাঁহারা ইংরেজি শিক্ষার ফলে, অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুরোধে, ইহা স্বীকার করেন, তাঁহারা ইহাকে কার্য্যে পরিণত করেন না। যিনি যিনি বিধবাকে বিবাহে অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ ব্যাকুলা হইলেও তাঁহারা সে বিবাহে উদ্যোগী হইতে সাহস করেন না। তাহার কারণ, সমাজের ভয়। তবেই, এই নীতি সমাজে প্রবেশ করে নাই। অন্যান্য সাম্যাত্মক নীতি সমাজে প্রবিষ্ট না হওয়ার কারণ বুঝা যায় ; বিধানের কর্ত্তা পুরুষ জাতি সে সকলের প্রচলনে আপনাদিগকে অনিষ্টগ্রস্ত বোধ করেন, কিন্তু এই নীতি এসমাজে কেন প্রবেশ করিতে পারে না, তাহা তত সহজে বুঝা যায় না। ইহা আয়াস সাধ্য নহে, কাহারও অনিষ্টকর নহে এবং অনেকের সুখবৃদ্ধিকর। তথাপি ইহা

সমাজে পরিগৃহীত হইবার লক্ষণ দেখা যায় না। ইহার কারণ, সমাজে লোকাচারের অলঙ্ঘনীয়তাই বোধ হয়৷

আর একটি কথা আছে। অনেকে মনে করেন, যে চিরবৈধব্য বন্ধনে, হিন্দু মহিলাদিগের পাতিব্রত্য এরূপ দৃঢ়বদ্ধ, যে তাহার অন্যথা কামনা করা বিধেয় নহে। হিন্দু স্ত্রীমাত্রেই জানেন, যে এই এক স্বামীর সঙ্গে২ তাঁহার সকল সুখ যাইবে, অতএব তিনি স্বামীর প্রতি অনন্ত ভক্তিমতী। এই সম্প্রদায়ের লোকের বিবেচনায় এই জন্যই হিন্দুগৃহে দাম্পত্য-সুখের এত আধিক্য। কথাটি সত্য বলিয়াই না হয় স্বীকার করিলাম। যদি তাই হয়, তবে নিয়মটি একতরফা রাখ কেন? বিধবার চিরবৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃতভার্য্য পুরুষের চিরপত্নীহীনতা বিধান কর না কেন? তুমি মরিলে, তোমার স্ত্রীর আর গতি নাই, এজন্য তোমার স্ত্রী অধিকতর প্রেমশালিনী; সেইরূপ তোমার স্ত্রী মরিলে, তোমারও আর গতি হইবে না, যদি, এমন নিয়ম হয়, তবে তুমিও অধিকতর প্রেমশালী হও। এবং দাম্পত্য সুখ, গার্হস্থ্য সুখ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তোমার বেলা সে নিয়ম খাটে না কেন? কেবল অবলা স্ত্রীর বেলা সেনিয়ম কেন?

তুমি বিধানকর্ত্তা পুরুষ, তোমার সুতরাং পোয়া বারো। তোমার বাহুবল আছে, সুতরাং তুমি এ দৌরাত্ম্য করিতে পার। কিন্তু জানিয়া রাখ যে এ অতিশয় অন্যায়, গুরুতর, এবং ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বৈষম্য।

৩য়। কিন্তু পুরুষের যতপ্রকার দৌরাত্ম্য আছে, স্ত্রীপুরুষে যতপ্রকার বৈষম্য আছে, তন্মধ্যে আমাদিগের উল্লিখিত তৃতীয় প্রস্তাব, অর্থাৎ, স্ত্রীগণকে গৃহমধ্যে বন্য পশুর ন্যায় বদ্ধ রাখার অপেক্ষা, নিষ্ঠুর জঘন্য, অধর্ম্মপ্রসূত, বৈষম্য আর কিছুই নাই। আমরা চাতকের ন্যায় স্বর্গমর্ত্ত্য বিচরণ করিব, কিন্তু ইহারা দেড় কাঠা ভূমির মধ্যে, পিঞ্জরে রক্ষিতার ন্যায় বদ্ধ থাকিবে। পৃথিবীর আনন্দ, ভোগ, শিক্ষা, কৌতুক, যাহা কিছু জগতে ভাল আছে, তাহার অধিকাংশে বঞ্চিত থাকিবে। কেন? হুকুম পুরুষের।

এই প্রথার ন্যায়বিরুদ্ধতা এবং অনিষ্টকারিতা অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তিই এক্ষণে স্বীকার করেন, কিন্তু স্বীকার করিয়াও তাহা লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত নন। ইহার কারণ অমর্য্যাদা ভয়। আমার স্ত্রী, আমার কন্যাকে, অন্যে চর্ম্মচক্ষে দেখিবে! কি অপমান! কি লজ্জা! আর তোমার স্ত্রী, তোমার কন্যাকে যে পশুর ন্যায় পশ্বালয়ে বদ্ধ রাখ, তাহাতে কিছু অপমান নাই? কিছু লজ্জা নাই? যদি না থাকে, তবে তোমার মানাপমান বোধ দেখিয়া, আমি লজ্জায় মরি!

জিজ্ঞাসা করি, তোমার অপমান, তোমার লজ্জার অনুরোধে, তাহাদিগের উপর পীড়ন করিবার তোমার কি অধি-

কার? তাহারা কি তোমারই মান রক্ষার জন্য, তোমারই তৈজস পত্রাদিমধ্যে গণ্য হইবার জন্য, দেহ ধারণ করিয়াছিল? তোমার মান অপমান সব, তাহাদের সুখ দুঃখ কিছু নহে?

আমি জানি, তোমরা বঙ্গাঙ্গনাগণকে এরূপ তৈয়ার করিয়াছ, যে তাহারা এখন আর এই শাস্তিকে দুঃখ বলিয়া বোধ করে না। বিচিত্র কিছুই নহে। যাহাকে অর্দ্ধভোজনে অভ্যস্ত করিবে, পরিশেষে সে সেই অর্দ্ধভোজনেই সন্তুষ্ট থাকিবে, অন্নাভাবকে দুঃখ মনে করিবে না। কিন্তু তাহাতে তোমার নিষ্ঠুরতা মার্জ্জনীয় হইল না। তাহারা সম্মত হৌক, অসম্মতই হৌক, তুমি তাহাদিগের সুখ ও শিক্ষার লাঘব করিলে, এজন্য তুমি অনন্ত কাল মহাপাপী বলিয়া গণ্য হইবে।

আর কতকগুলি মূর্খ আছেন, তাঁহাদিগের শুধু এইরূপ আপত্তি নহে। তাঁহারা বলেন, যে স্ত্রীগণ সমাজ মধ্যে যথেচ্ছা বিচরণ করিলে দুষ্টস্বভাব হইয়া উঠিবে, এবং কুচরিত্র পুরুষগণ অবসর পাইয়া তাহাদিকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবে। যদি তাঁহাদিগকে বলা যায় যে দেখ ইউরোপাদি সভ্য সমাজে কুলকামিনীগণ যথেচ্ছা সমাজে বিচরণ করিতেছে, তন্নিবন্ধন কি ক্ষতি হইতেছে? তাহাতে তাঁহারা উত্তর করেন, যে সে সকল সমাজের স্ত্রীগণ, হিন্দু মহিলাগণ অপেক্ষা ধর্ম্মভ্রষ্ট এবং কলুষিত স্বভাব বটে।

ধর্ম্ম রক্ষার্থ যে স্ত্রীগণকে পিঞ্জর নিবদ্ধ রাখা আবশ্যক, হিন্দু মহিলাগণের এরূপ কুৎসা আমরা সহ্য করিতে পারি না। কেবল সংসারে লোকসহবাস করিলেই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে, পুরুষ পাইলেই তাঁহারা কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তাহার পিছু পিছু ছুটিবে, হিন্দু স্ত্রীর ধর্ম্ম এরূপ বস্ত্রাবৃত বারিবৎ নহে। যে ধর্ম্ম এরূপ বস্ত্রাবৃত বারিবৎ, সে ধর্ম্ম থাকা না থাকা সমান—তাহা রাখিবার জন্য এত যত্নের প্রয়োজন কি? তাহার বন্ধন ভিত্তি উন্মূলিত করিয়া নূতন ভিত্তির পত্তন কর।

৪র্থ। আমরা যে চতুর্থ বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, অর্থাৎ পুরুষগণের বহু বিবাহ অধিকার, তৎসম্বন্ধে অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে বঙ্গবাসী হিন্দুগণ বিশেষ রূপে বুঝিয়াছেন, যে এই অধিকার নীতি বিরুদ্ধ। সহজেই বুঝা যাইবে যে এস্থানে স্ত্রীগণের অধিকার বৃদ্ধি করিয়া সাম্য সংস্থাপন করা সমাজ সংস্কারকদিগের উদ্দেশ্য হইতে পারে না; পুরুষগণের অধিকার কর্ত্তন করাই উদ্দেশ্য, কারণ মনুষ্যজাতি মধ্যে কাহারই বহু বিবাহে অধিকার নীতি সঙ্গত হইতে পারে না। * কেহই বলিবে না

* কদাচিৎ হইতে পারে বোধ হয়। যথা, অপুত্রক রাজা, অথবা যাহার ভার্য্যা কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত। বোধ হয়, বলিতেছি, কেননা ইহা স্বীকার করিলে রুগ্নের পত্নীর পক্ষেও সেই রূপ ব্যবস্থা করিতে হয়।

যে স্ত্রীগণও পুরুষের ন্যায় বহু বিবাহে অধিকারিণী হউন; সকলেই বলিবে, পুরুষেরও স্ত্রীর ন্যায় একমাত্র বিবাহে অধিকার। অতএব, যেখানে অধিকারটি নীতি সঙ্গত, সেইখানেই সাম্য অধিকারকে সম্প্রসারিত করে,যেখানে কার্য্যাধিকারটি অনৈতিক, সে খানে উহাকে কর্ত্তিত এবং সঙ্কীর্ণ করে। সাম্যের ফল কদাচ অনৈতিক হইতে পারে না। সাম্য এবং স্বানুবর্ত্তিতা এই দুই তত্ত্ব মধ্যে সমুদায় নীতি শাস্ত্র নিহিত আছে।

এই চারিটি বৈষম্যের উপর আপাততঃ বঙ্গীয় সমাজের দৃষ্টি পড়িয়াছে। যাহা অতি গর্হিত তাহারই যখন কোন প্রতিবিধান হইতেছে না, তখন যে অন্যান্য বৈষম্যের প্রতি কটাক্ষ করিলে কোন উপকার হইবে এমত ভরসা করা যায় না। আমরা আর দুই একটি কথার উত্থাপন করিয়া ক্ষান্ত হইব।

স্ত্রীপুরুষে যে সকল বৈষম্য প্রায় সর্ব্ব সমাজে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় বিধিগুলি অতি ভয়ানক ও শোচনীয়। পুত্র পৈতৃক সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ অধিকারী, কন্যা কেহই নহে। পুত্র কন্যা,উভয়েই এক ঔরসে, এক গর্ভে জন্ম; উভয়েরই প্রতি পিতা মাতার একপ্রকার যত্ন, একপ্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কিন্তু পুত্র পিতৃমৃত্যুর পর পিতার কোটি মুদ্রা সুরাপানাদিতে ভস্মসাৎ করুক, কন্যা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও তন্মধ্যে এক কপর্দ্দক পাইতে পারে না। এই নীতির যে কারণ হিন্দু শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, যে যেই শ্রাদ্ধাধিকারী, সেই উত্তরাধিকারী; সেটি এরূপ অসঙ্গত এবং অযথার্থ, যে তাহার অযৌক্তিকতা নির্ব্বাচন করাই নিষ্প্রয়োজন। দেখা যাউক, এরূপ নিয়মের স্বভাব সঙ্গত অন্য কোন মূল আছে কি না। ইহা কথিত হইতে পারে, যে স্ত্রী স্বামীর ধনে স্বামীর ন্যায়ই অধিকারিণী; এবং তিনি স্বামিগৃহে গৃহিণী, স্বামীর ধনৈশ্বর্য্যের কর্ত্রী, অতএব তাঁহার আর পৈতৃক ধনে অধিকারিণী হইবার প্রয়োজন নাই। যদি ইহাই এই ব্যবস্থানীতির মূল স্বরূপ হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে বিধবা কন্যা বিষয়াধিকারিণী হয় না কেন? যে কন্যা দরিদ্রে সমর্পিত হইয়াছে, সে উত্তরাধিকারিণী হয় না কেন? কিন্তু আমরা এ সকল ক্ষুদ্রতর আপত্তি উপস্থিত করিতে ইচ্ছুক নহি। স্ত্রীকে স্বামী বা পুত্র, বা এবম্বিধ কোন পুরুষের আশ্রিতা হইয়াই ধনভাগিনী হইতে হইবে, ইহাতেই আমাদের আপত্তি। অন্যের ধনে নহিলে স্ত্রীজাতি ধনাধিকারিণী হইতে পারিবে না—পরের দাসী হইয়া ধনী হইবে—নচেৎ ধনী হইবে না, ইহাতেই আপত্তি। পতির পদসেবা কর, পতি দুষ্ট হৌক, কুভাষী, কদাচার হৌক, সকল সহ্য কর—অবাধ্য, দুর্মুখ, কৃতঘ্ন, পাপাত্মা পুত্রের বাধ্য হইয়া থাক--নচেৎ ধনের সঙ্গে স্ত্রীজাতির কোন সম্বন্ধ নাই। পতি পুত্রে তাড়াইয়া দিল ত সব ঘুচিল। স্বাতন্ত্র্য

অবলম্বন করিবার উপায় নাই—সহিষ্ণুতা ভিন্ন অন্য গতিই নাই। এদিকে পুরুষ, সর্ব্বাধিকারী—স্ত্রীর ধনও তাঁর ধন। ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীকে সর্ব্বস্বচ্যুত করিতে পারেন। তাঁহার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে কোন বাধা নাই। এ বৈষম্য গুরুতর, ন্যায় বিরুদ্ধ, এবং নীতি বিরুদ্ধ।

অনেকে বলিবেন, এ অতি উত্তম ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা প্রভাবে স্ত্রী স্বামীর বশবর্ত্তিনী থাকে। বটে, পুরুষকৃত ব্যবস্থাবলির উদ্দেশ্যই তাই; যত প্রকার বন্ধন আছে, সকল প্রকার বন্ধনে স্ত্রীগণের হস্তপদ বাঁধিয়া পুরুষ পদমূলে স্থাপিত কর—পুরুষগণ স্বেচ্ছাক্রমে পদাঘাত করুক, অধম নারীগণ বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে না পাবে। জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রীগণ পুরুষের বশবর্ত্তিনী হয়, ইহা বড় বাঞ্ছনীয়, পুরুষগণ স্ত্রীজাতির বশবর্ত্তী হয়, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে কেন? যত বন্ধন আছে সকল বন্ধনে, স্ত্রীগণকে বাঁধিয়াছ, পুরুষজাতির জন্য একটি বন্ধনও নাই কেন? স্ত্রীগণ কি পুরুষাপেক্ষা অধিকতর স্বভাবতঃ দুশ্চরিত্র? না রজ্জুটি পুরুষের হাতে বলিয়া, স্ত্রীজাতির এত দৃঢ় বন্ধন? ইহা যদি অধর্ম্ম না হয়, তবে অধর্ম্ম কাহাকে বলে, বলিতে পারি না।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে কদাচিৎ স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী হয়, যথা-পতি অপুত্রক মরিলে। এইটুকু হিন্দু শাস্ত্রের গৌরব। এইরূপ বিধি দুই একটা থাকাতেই আমরা প্রাচীন আর্য্য ব্যবস্থা শাস্ত্রকে কোন কোন অংশে আধুনিক সভ্য ইউরোপীয় ব্যবস্থাশাস্ত্রাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলিয়া গৌরব করি। কিন্তু এটুকু কেবল মন্দের ভাল মাত্র। স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী বটে, কিন্তু দানবিক্রয়াদির অধিকারিণী নহেন। এ অধিকার কত টুকু? আপনার ভরণ পোষণ মাত্র পাইবেন, আর তাঁহার জীবন কাল মধ্যে আর কাহাকেও কিছু খাইতে দিবেন না, এইপর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার। পাপাত্মা পুত্র সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করুক, তাহাতে শাস্ত্রের আপত্তি নাই, কিন্তু মহারাণী স্বর্ণময়ীর ন্যায় ধর্ম্মিষ্ঠা স্ত্রী কাহারও প্রাণ রক্ষার্থেও এক বিঘা হস্তান্তর করিতে সমর্থ নহেন। এবৈষম্য কেন? তাহার উত্তরেরও অভাব নাই—স্ত্রীগণ অল্পবুদ্ধি, অস্থির মতি, বিষয় রক্ষণে অশক্ত। হঠাৎ সর্ব্বস্ব হস্তান্তর করিবে, উত্তরাধিকারীর ক্ষতি হইবে, এজন্য তাহারা বিষয় হস্তান্তর করিতে অশক্ত হওয়াই উচিত। আমরা এ কথা স্বীকার করি না। স্ত্রীগণ বুদ্ধি, স্থৈর্য্য, চতুরতায়, পুরুষাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। বিষয় রক্ষার জন্য যে বৈষয়িক শিক্ষা, তাহাতে তাহারা নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু সে পুরুষেরই দোষ। তোমরা তাহাদিগকে পুরমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া, বিষয় কর্ম্ম হইতে নির্লিপ্ত রাখ, সুতরাং তাহাদিগের বৈষয়িক শিক্ষা হয় না। আগে বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে দাও, পরে বৈষয়িক শিক্ষার প্রত্যাশা করিও। আগে

মুড়ি রাখিয়া পরে পাঁটা কাটা যায় না। পুরুষের অপরাধে স্ত্রী অশিক্ষিতা—কিন্তু সেই অপরাধের দণ্ড স্ত্রীগণের উপরেই বর্ত্তাইতেছে। বিচার মন্দ নয়!

স্ত্রীগণের বিষয়াধিকার সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ ব্যাপার মনে পড়িল। সম্প্রতি হাইকোর্টে একটি মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। বিচার্য্য বিষয় এই অসতী স্ত্রী,বিষয়াধিকারিণী হইতে পারে কি না। বিচারক অনুমতি করিলেন, পারে। শুনিয়া দেশে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। যা! এত কালে হিন্দুস্ত্রীর সতীত্ব ধর্ম্ম লুপ্ত হইল! আর কেহ সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিবেনা! বাঙ্গালি সমাজ পয়সা খরচ করিতে চাহে না—রাজাজ্ঞা নহিলে চাঁদায় সহি করে না, কিন্তু এ লাঠি এমনি মর্ম্মস্থানে বাজিয়াছিল যে হিন্দুগণ আপনা হইতেই চাঁদাতে সহি করিয়া, প্রিবিকৌন্সলে আপীল করিতে উদ্যত! প্রধান প্রধান সম্বাদ পত্র, "হা সতীত্ব! কোথায় গেলি" বলিয়া ইংরেজি বাঙ্গালা স্বরে রোদন করিয়া, "ওরে চাঁদা দে!" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। শেষটা কি হইয়াছে জানি না, কেন না দেশী সম্বাদপত্র পাঠ সুখে আমরা ইচ্ছাক্রমে বঞ্চিত। কিন্তু যাহাই হৌক, যাঁহারা এই বিচার অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমাদিগের একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। স্বীকার করি, অসতী স্ত্রী বিষয়ে বঞ্চিত হওয়াই বিধেয়, তাহা হইলে অসতীত্ব পাপ বড় শাসিত থাকে; কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি বিধান হইলে ভাল হয় না, যে লম্পট পুরুষ অথবা যে পুরুষ পত্নী ভিন্ন অন্য নারীর সংসর্গ করিয়াছে, সেও বিষয়াধিকারে অক্ষম হইবে? বিষয়ে বঞ্চিত হইবার ভয় দেখাইয়া স্ত্রীদিগকে সতী করিতে চাও—সেই ভয় দেখাইয়া পুরুষগণকে সৎপথে রাখিতে চাও না কেন? ধর্ম্মভ্রষ্টা স্ত্রী বিষয় পাইবে না ধর্ম্মভ্রষ্ট পুরুষ বিষয় পাইবে কেন? ধর্ম্ম ভ্রষ্ট পুরুষ,—যে লম্পট, যে চোর, যে মিথ্যাবাদী, যে মদ্যপায়ী, যে কৃতঘ্ন, সে সকলই বিষয় পাইবে,কেন না তাহারা পুরুষ; কেবল অসতী বিষয় পাইবে না, কেন না সে স্ত্রী! ইহা যদি ধর্ম্ম শাস্ত্র, তবে অধর্ম্মশাস্ত্র কি? ইহা যদি আইন, তবে বেআইন কি? এই আইন রক্ষার্থ চাঁদা তোলা যদি দেশবাৎসল্য, তবে মহাপাতক কেমন তর?

স্ত্রীজাতির সতীত্ব ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়, তাহার রক্ষার্থ যত বাঁধন বাঁধিতে পার, ততই ভাল,কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু পুরুষের উপর কোন কথা নাই কেন? পুরুষ বারস্ত্রীগমন করুক, পরদার নিরত হউক, তাহার কোন শাসন নাই কেন? ভূরি২ নিষেধ আছে, সকলেই বলিবে, পুরুষের পক্ষেও এ সকল অতি মন্দ কর্ম্ম, লোকেও একটু২ নিন্দা করিবে—কিন্তু এই পর্য্যন্ত। স্ত্রীলোকদিগের উপর যেরূপ কঠিন শাসন, পুরুষদিগের উপর সেরূপ কিছুই নাই।

কথায় কিছু হয় না; ভ্রষ্ট পুরুষের কোন সামাজিক দণ্ড নাই। একজন স্ত্রী সতীত্ব সম্বন্ধে কোন দোষ করিলে সে আর মুখ দেখাইতে পারে না; হয়ত আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে বিষ প্রদান করেন; আর একজন পুরুষ প্রকাশ্যে সেইরূপ কার্য্য করিয়া, রোশনাই করিয়া, জুড়ি হাঁকাইয়া রাত্রি শেষে পত্নীকে চরণরেণু স্পর্শ করাইতে আসেন; পত্নী পুলকিত হয়েন; লোকে কেহ কষ্ট করিয়া অসাধুবাদ করে না; লোক সমাজে তিনি যেরূপ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেইরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকেন, কেহ তাঁহার সহিত কোনপ্রকার ব্যবহারে সঙ্কুচিত হয় না; এবং তাঁহার কোন প্রকার দাবি দাওয়া থাকিলে স্বচ্ছন্দে তিনি দেশের চূড়া বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারেন। এই আর একটি গুরুতর বৈষম্য।

আর একটি অনুচিত বৈষম্য এই যে, সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক ভিন্ন, এদেশীয় স্ত্রীগণ উপার্জ্জন করিতে পারেন না। সত্য বটে, উপার্জ্জনকারী পুরুষেরা আপন২ পরিবারস্থা স্ত্রীগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন কিন্তু এমন স্ত্রী অনেক এদেশে আছে, যে তাহাদিগকে প্রতিপালন করে, এমত কেহই নাই। বাঙ্গালার বিধবা স্ত্রীগণকে বিশেষতঃ লক্ষ্য করিয়াই আমরা লিখিতেছি। অনাথা বঙ্গ বিধবাদিগের অন্নকষ্ট লোক বিখ্যাত, তাহার বিস্তারে প্রয়োজন নাই। তাহারা উপার্জ্জন করিয়া দিনপাত করিতে পারে না, ইহা সমাজের নিতান্ত নিষ্ঠুরতা। সত্যবটে, দাসীত্ব বা পাচিকাবৃত্তি করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই, কিন্তু ভদ্রলোকের স্ত্রীকন্যা এ সকল বৃত্তি করিতে সক্ষম নয়—তদপেক্ষা মৃত্যুতে যন্ত্রণা অল্প। অন্য কোনপ্রকারে ইহারা যে উপার্জ্জন করিতে পারে না, তাহারা তিনটি কারণ আছে। প্রথমতঃ তাহার দেশী সমাজের রীত্যানুসারে গৃহের বাহির হইতে পারে না। গৃহের বাহির না হইলে উপার্জ্জন করার অল্প সম্ভাবনা। দ্বিতীয়, এ দেশীয় স্ত্রীগণ লেখাপড়া, বা শিল্পাদিতে সুশিক্ষিত নহে; কোনপ্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত না হইলে কেহ উপার্জ্জন করিতে পারে না। তৃতীয়, বিদেশী উমেদওয়ার এবং বিদেশী শিল্পীরা প্রতিযোগী; এ দেশী পুরুষেই চাকরি, ব্যবসায়, শিল্প, বা বাণিজ্যে অন্ন করিয়া সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাহার উপর স্ত্রীলোক প্রবেশ করিয়া কি করিবে?

এই তিনটি বিঘ্ন নিরাকরণের একই উপায়—শিক্ষা। লোকে সুশিক্ষিত হইলে, বিশেষতঃ স্ত্রীগণ সুশিক্ষিতা হইলে, তাহারা অনায়াসেই গৃহ মধ্যে গুপ্ত থাকার পদ্ধতি অতিক্রম করিতে পারিবে। শিক্ষা থাকিলেই, অর্থোপার্জ্জনে নারীগণের ক্ষমতা জন্মিবে। এবং এদেশী স্ত্রীপুরুষ সকল প্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে, বিদেশী ব্যবসায়ী, বিদেশী শিল্পী, বা বিদেশী বণিক, তাহাদিগের অন্ন কাড়িয়া লইতে পারিবে না। শিক্ষাই

সকল প্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়।

আমরা যে সকল কথা এই প্রবন্ধে বলিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমাদিগের দেশীয়া স্ত্রীগণের দশা বড়ই শোচনীয়া। ইহার প্রতিকার জন্য কে কি করিয়াছেন? পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায় অনেক যত্ন করিয়াছেন—তাঁহাদিগের যশঃ অক্ষয় হউক; কিন্তু এই কয় জন ভিন্ন সমাজ হইতে কিছু হয় নাই। দেশে অনেক এসোশিয়েসন, লীগ, সোসাইটি, সভা, ক্লব ইত্যাদি আছে—কাহারও উদ্দেশ্য রাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য সমাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য ধর্ম্মনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য দুর্নীতি, কিন্তু স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য কেহ নাই। পশুগণকে কেহ প্রহার না করে, এজন্যও একটি সভা আছে, কিন্তু বাঙ্গালার অর্দ্ধেক অধিবাসী, স্ত্রীজাতি—তাহাদিগের উপকারার্থ কেহ নাই। স্ত্রীলোকদিগের উপকারার্থ একটি সম্প্রদায়, দলবদ্ধ হয় না কি? আমরা কয়দিনের ভিতর অনেক পাঠশালা, চিকিৎসাশালা এবং পশুশালার জন্য বিস্তর অর্থব্যয় দেখিলাম, কিন্তু এই বঙ্গ সংসাররূপ পশুশালার সংস্করণার্থ কিছু করা যায় না কি?

যায় না, কেন না তাহাতে রঙ্ তামাসা কিছু নাই। কিছু করা যায় না, কেন না, তাহাতে রায় বাহাদুরি, রাজা বাহাদুরি, ষ্টার অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি কিছু নাই। আছে, কেবল মূর্খের করতালি। কে অগ্রসর হইবে?

কোন "স্পেশিয়ালের" পত্র।

যুবরাজের সঙ্গে যেসকল "স্পেশিয়েল" আসিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে এক জন কোন বিলাতীয় সম্বাদপত্রে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, আমরা অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছি। সে বিলাতীয় সম্বাদপত্রের নামের জন্য যদি কেহ আমাদিগকে পীড়াপীড়ি করেন তবে আমরা নাচার হইব। সম্বাদ পত্রের নাম আমরা জানি না, এবং কোথায় দেখিয়াছিলাম তাহা স্মরণ নাই। পত্রখানির মর্ম্ম এই—

যুবরাজের সঙ্গে আসিয়া বাঙ্গালা দেশ যেরূপ দেখিলাম, তাহা এই অবকাশে কিছু বর্ণনা করিয়া আপনাদিগকে আপ্যায়িত করিব ইচ্ছা আছে। আমি এদেশ সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, অতএব আমার কাছে যেরূপ ঠিক সম্বাদ

পাইবেন এমন অন্যের কাছে পাইবেন না। এ দেশের নাম "বেঙ্গল।" এনাম কেন হইল, তাহা দেশী লোকে বলিতে পারে না। কিন্তু দেশীলোকে এদেশের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহে, তাহারা জানিবে কি প্রকারে? তাহারা বলে পূর্ব্বে ইহার এক প্রদেশকে বঙ্গ বলিত, তৎপ্রদেশের লোককে এখনও "বাঙ্গাল" বলে, এজন্য এদেশের নাম "বাঙ্গালা।" কিন্তু এদেশের নাম বাঙ্গালা নহে— ইহার নাম "বেঙ্গল"—তাহা আপনারা সকলেই জানেন। অতএব একথা কেবল প্রবঞ্চনা মাত্র। আমার বোধ হয় বেঞ্জামিন গল (Benjamin Gall) সংক্ষেপতঃ বেন্ গল্ নামক কোন ইং-রেজ এই দেশ পূর্ব্বে আবিষ্কৃত এবং অধিকৃত করিয়া আপন নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন।

রাজধানীর নাম "কালকাটা" (Calcutta) "কাল" এবং "কাটা" এই দুইটি বাঙ্গালা শব্দে এই নামের উৎপত্তি। এই নগরীতে কাল কাটাইবার কোন কষ্ট নাই, এই জন্যই ইহার নাম "কাল-কাটা"

এদেশের লোক কতকগুলি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, কতকগুলি কিঞ্চিৎ গৌর। যাহারা কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষে বোধ হয় আফ্রিকা হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছিল, কেননা সেই কৃষ্ণবর্ণ বাঙ্গালিদিগের মধ্যে অনেকেরই কুঞ্চিত কেশ; নরতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন, কুঞ্চিত কেশ হইলেই কাফ্রি। আর যাহারা কিঞ্চিৎ গৌরবর্ণ, বোধ হয় তা-হারা উপরিকথিত বেন্ গল্ সাহেবের বংশসম্ভূত।

দেখিলাম অধিকাংশ বাঙ্গালি মাঞ্চেষ্ট-রের তন্তুপ্রসূত বস্ত্র পরিধান করে। অতএব স্পষ্টই সিদ্ধান্ত হইতেছে, যে ভারতবর্ষ মাঞ্চেষ্টরের সংশ্রবে আসিবার পূর্ব্বে, বঙ্গদেশের লোক উলঙ্গ থাকিত; এক্ষণে মাঞ্চেষ্টরের অনুকম্পায় তাহারা বস্ত্র পরিয়া বাঁচিতেছে। ইহারা সম্প্রতি মাত্র বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিয়াছে, কি প্রকারে বস্ত্র পরিধান করিতে হয় তাহা এখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। কেহ২ আমাদিগের মত পেণ্টুলন পরে, কেহ কেহ তুর্কদিগের মত পায়জামা পরে, এবং কেহ কেহ কাহার অনুকরণ করিবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, বস্ত্রগুলি কেবল কোমরে জড়া-ইয়া রাখে।

অতএব, দেখ, ব্রিটিষ রাজ্য বেঙ্গল দেশে একশত বৎসর বুড়া হইয়াছে মাত্র, ইতিমধ্যেই অসভ্য উলঙ্গ জাতিকে বস্ত্র পরিধান করিতে শিখাইয়াছে। সুতরাং ইংলণ্ডের যে কি অসীম মহিমা এবং তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের যে কিপরিমাণে ধন এবং ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে তাহা বলিয়া উঠা যায় না। তাহা ইংরেজেই জানে। বাঙ্গালিতে বুঝিতে পারে, এত বুদ্ধি তাহাদিগের থাকা সম্ভব নহে।

দুঃখের বিষয় যে আমি কয়দিনে

বাঙ্গালিদিগের ভাষায় অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারি নাই। তবে, কিছু কিছু শিখিয়াছি। এবং গোলেস্তান্ এবং বোস্তান্ নামে যে দুইখানি বাঙ্গালা পুস্তক আছে তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়াছি। ঐ দুইখানি পুস্তকের স্থূল মর্ম্ম এই যে, যুধিষ্ঠির নামে রাজা, রাবণ নামে আর একজন রাজাকে বধ করিয়া তাহার মহিষী মন্দোদরীকে হরণ করিয়াছিল। মন্দোদরী কিছুকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে লীলা খেলা করেন। পরিশেষে, তাঁহার পিতা, কৃষ্ণের নিমন্ত্রণ না করায় তিনি দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করেন।

আমি কিছু২ বাঙ্গালা শিখিয়াছি। বাঙ্গালিরা হাইকোর্টকে হাই কোর্ট বলে, গবর্ণমেণ্টকে গবর্ণমেণ্ট বলে, ডিক্রীকে ডিক্রী বলে, ডিষমিষকে ডিষমিষ, রেলকে রেল, ডোরকে দোর, ডবলকে ডবল, ইত্যাদি ইত্যাদি বলে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে বাঙ্গালা ভাষা ইংরেজির একটি শাখা মাত্র।

ইহাতে একটি সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছে। যদি বাঙ্গালা ইংরেজির শাখাই হইল, তবে ইংরেজেরা এদেশে আসিবার পূর্ব্বে এদেশে কোন ভাষা ছিল কি না? দেখ, আমাদিগের খ্রীষ্টের নাম হইতে ইহাদিগের প্রধান দেবতা কৃষ্ণের নাম নীত হইয়াছে, এবং অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের* মতে ইহাদিগের প্রধান পুস্তক

* Dr. Lorinzer &c.

তৎপ্রণীত ভগবৎগীতা বাইবেল হইতে অনুবাদিত। সুতরাং বাইবেলের পূর্ব্বে যে ইহাদিগের কোন ভাষা ছিল না, ইহা একপ্রকার স্থির। তাহার পরে, কবে ইহাদিগের ভাষা হইল, বলা যায় না। বোধ করি, পণ্ডিতবর মক্ষমূলর, মনোযোগ করিলে, এবিষয়ের মীমাংসা করিতে পারেন। যে পণ্ডিত মীমাংসা করিয়াছেন যে অশোকের পূর্ব্বে আর্য্যেরা লিখিতে জানিত না, সেই পণ্ডিতই এ কথার মীমাংসায় সক্ষম।

আর একটি কথা আছে। সর উইলিয়ম জোন্স হইতে মক্ষ মূলর পর্য্যন্ত প্রাচ্যবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে এদেশে সংস্কৃত নামে আর একটি ভাষা আছে। কিন্তু এদেশে আসিয়া আমি কাহাকেও সংস্কৃত কহিতে বা লিখিতে দেখি নাই। সুতরাং এদেশে সংস্কৃত ভাষা থাকার বিষয়ে আমার বিশ্বাস নাই। বোধ হয়, এটি সর উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতির কারসাজি। তাঁহারা পশারের জন্য এভাষাটি সৃষ্টি করিয়াছেন।*

যাহা হৌক, ইহাদিগের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিব। তোমরা শুনিয়াছ, যে হিন্দুরা চারিটি জাতিতে বিভক্ত; কিন্তু তাহা নহে। ইহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি জাতি আছে, তাহাদের নাম নিম্নে লিখিতেছি;

* সাবধান, কেহ হাসিবেন না। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডুগাল্ড ষ্টুয়ার্ট যথার্থই এই মতাবলম্বী ছিলেন।

১। ব্রাহ্মণ

২। কায়স্থ

৩। শূদ্র

৪। কুলীন

৫। বংশজ

৬। বৈষ্ণব

৭। শাক্ত

৮। রায়

৯। ঘোষাল

১০। টেগোর

১১। মোল্লা

১২। ফরাজি

১৩ রামায়ণ

১৪। মহাভারত

১৫। আসাম গোয়ালপাড়া

১৬। পারিয়া ডগ্‌স

বাঙ্গালিদিগের চরিত্র অত্যন্ত মন্দ। তাহারা অত্যন্ত মিথ্যাবাদী, বিনা কারণেও মিথ্যা কথা বলে। শুনিয়াছি বাঙ্গালিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র। আমি অনেক গুলিন বাঙ্গালিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে তিনি কোন জাতি? সকলেই বলিল তিনি কায়স্থ। কিন্তু তাহারা আমাকে ঠকাইতে পারিল না, কেন না আমি সেই পণ্ডিতবর মক্ষ মূলরের গ্রন্থে* পড়িয়াছি, যে বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্রাহ্মণ। দেখা যাইতেছে, যে "Mit·a" শব্দ "mitre" শব্দের অপভ্রংশ, অতএব মিত্র মহাশয়কে পুরোহিত জাতীয়ই বুঝায়।

বাঙ্গালিদিগের একটি বিশেষ গুণ এই যে তাহারা অত্যন্ত রাজভক্ত। যেরূপ লাখে২ তাহারা যুবরাজকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল যে ঈদৃশ রাজভক্ত জাতি আর পৃথিবীতে কোথাও জন্মগ্রহণ করে নাই। ঈশ্বর আমাদিগের মঙ্গল করুন, তাহা হইলে তাহাদিগেরও কিছু মঙ্গল হইতে পারে।

বাঙ্গালিরা স্ত্রীলোকদিগকে পরদা নিশীন করিয়া রাখে শুনা আছে। ইহা সত্য বটে, তবে সর্ব্বত্র নয়। যখন কোন লাভের কথা না থাকে, তখন স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে রাখে, লাভের সূচনা দেখিলেই বাহির করিয়া আনে। আমরা যেরূপ ফৌলিংপিস লইয়া ব্যবহার করি, বাঙ্গালিরা পৌরাঙ্গনা লইয়াও সেইরূপ করে; যখন প্রয়োজন নাই, তখন বাক্সবন্দি করিয়া রাখে, শিকার দেখিলেই বাহির করিয়া তাহাতে বারুদ পোরে। বন্দুকের সিসের গুলিতে ছার পক্ষিজাতির পক্ষচ্ছেদ হয়, বাঙ্গালির মেয়ের নয়নবানে বড় বড় ইন্দ্রতুল্য মনুষ্যেরও পক্ষচ্ছেদ হয়। আমি বাঙ্গালির কন্যার অলঙ্কারণের যেরূপ গুণ দেখিয়াছি, তাহাতে আমার ইচ্ছা করে, আমারও ফৌলিংপিস্‌টিতে দুই একখানা সোনার গহনা পরাইব—দেখি, পাখী ঘুরিয়া আসিয়া বন্দুকের উপর পড়ে কি না।

* *Chips from a German Workshop*

শুধু নয়নবানে কেন, শুনিয়াছি বাঙ্গালির মেয়ে নাকি পুষ্পবান প্রয়োগেও বড় সুপটু। হিন্দু সাহিত্যোক্ত পুষ্পশরে, আর এই বঙ্গকামিনীগণের পরিত্যক্ত পুষ্পশরে,কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহা আমি জানি না; যদি থাকে, তবে বাঙ্গালির মেয়েকে ভুবাকাঙ্ক্ষিনী বলিতে হইবে। শুনিয়াছি কোন বাঙ্গালি কবি নাকি লিখিয়াছিলেন, "কিছার মিছার ধমু, ধরে ফুলবান;" এখন কথাটা একটু ফিরাইয়া বলিতে হইবে "কিছার মিছার ফুল, মারে ফুলবান।" যাহা হউক, নয়নবানের উপর আবার ফুলবান? বাঙ্গালায় ইংরেজ টেঁকা ভার হইল— আমার সর্ব্বদা ভয় করে, আমি এই গরিব দোকানদারের ছেলে, দুটাকার লোভে সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি— কে জানে কখন, বঙ্গকুলকামিনীপ্রেরিত কুসুমশর আসিয়া, এই ছেঁড়া তাম্বু ফুটা করিয়া, আমার হৃদয়ে আঘাত করিবে, আমি অমনি ধপাস্ করিয়া চিতপাত হইয়া পড়িয়া যাইব! হায়! তখন আমার কি হইবে! কে মুখে জল দিবে!

আমি এমত বলি না, যে সকল বাঙ্গালির মেয়ে এরূপ ফৌলিংপিস্, অথবা সকলই এরূপ পুষ্পক্ষেপণী প্রেরণে সুচতুরা। তবে কেহ কেহ বটে. ইহা আমি জনরবে অবগত হইয়াছি। শুনিয়াছি, তাঁহারা নাকি ভর্ত্তৃনিয়োগানুসরেই এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত। এই ভর্ত্তৃগণ দেশীয় শাস্ত্রানুসারে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। হিন্দুদিগের যে চারিটী বেদ আছে—তাহার মধ্যে চাণক্য শ্লোক নামক বেদে (আমি এসকল শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছি) লেখা আছে যে

আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি,

ইহার অর্থ এই হে পদ্মপলাশ লোচনে শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার উন্নতির জন্য তোমাকে এই বনফুলের মালা দিতেছি, তুমি গলায় পর!

উড়িষ্যার পথে প্রভাত।*

(১)

উঠ উঠ রাত্তি পোহায়;
শুক্ল—ত্রয়োদশীর সোনার চাঁদ
একলা ফেলে ঐ পালায়,
ভেবে—ঘুমুয়ে আছে বসুমতী
ধীরি ধীরি চোর পালায়॥
কিবা—বহুরূপী নিশাপতি—
ভানুর ধাঁকে অস্ত যায়

* নীলগিরিমালা বালেশ্বর হইতে পুরীযায়ী পন্থার কিয়দ্দূর পশ্চিমে থাকিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছে—এই পথের উপর অশ্ব-শকটে শুক্ল ত্রয়োদশীর তিমির-শেষা রাত্রির প্রভাত বর্ণন।—ছন্দঃমাত্রাবৃত্ত

ধরিয়ে—ঢল ঢল লাল শোভায়
ভানুর যাঁকে অস্ত যায়॥
উঠ উঠ রাতি পোহায়॥
শশী—প্রণয় কিরণ জাল গুটায়,
ঝাটান—আঁধার রাশি ফের ছড়ায়,
ধরার মুখে কালি মাখায়,
চেয়ে—ম্লানমুখী দেখ ধরায়॥
উঠ উঠ রাতি পোহায়॥
জলন্ত—অঙ্গার যেমন তুলে শিখায়,
শেষে—নির্ব্বাণমুখে শিষ গুটায়,
তথাপি—লাল রমণে চোক্ জুড়ায়,
তেমনি—অর্চ্চিহীন দেখ চাঁদায়,
অর্চ্চিহীন দেখ শোভায়॥
শশধর—অদ্রি চূড়ায় ঐ দাঁড়ায়,
রক্তিম—অঙ্গার যেন গিরি চূড়ায়,
শৈল—অগ্নি গিরি প্রায় বুঝায়,
এই ছিল যে—গেল কোথায়॥
উঠ উঠ রাতি পোহায়॥

(২)

হুলু দেয় শৃগাল গণে
হেরে—অন্ধকার প্রাণ সখায়;
গর্জ্জায়—সহায় পেয়ে গিরি গুহায়
বৃক—অকারণে কোপ জানায়, চোক রাঙায়
কর্কশ—আঁধার মানিক চোক জ্বালায়,
নৃশংসের—ক্ষমতায় রাগ যোগায়;
হরিণীর প্রাণ শুকায়,
অগ্রপদে চট চটায়;
নিশাচর—সুপ্তলোভ ফের জাগায়,
বনস্থলী—মর মরায় খস খসায়;
পক্ষিণী—পাখীর কোলে মুখ লুকায়,
চট নিদ্রায়;
বাছার মা—কোলে ঢেকে নেয় কুলায়
নিদ্রাচোকে দীন বাছায়;
স্ত্রীজাতির—আপন প্রাণের ভয় ভুলায়
মা হোলেই মার মায়ায়;
বানরপাল—চকিত মনে রয় শাখায়,
কিচির মিচির বাক জুড়ায়
মন্ত্রণা—পেটুক কথার শেষ নিশায়
আধ নিদ্রায়,
কিচির মিচির বাক জুড়ায়।
উঠ উঠ রাতি পোহায়॥

(৩)

ভানুপ্রিয়া ঊষা সতী
প্রাচীদ্বারে জল ছিটায়,
শীতল আলোক জল ছড়ায়;
গ্রাম্য বৌয়ে কায শিখায়॥
উঠ উঠ রাতি পোহায়॥
সাহস—আলোক সাথে এল ধরায়;
ফুল ফুটায়, বায়ু খেলায়,
কোক মিলায় কুহু তুলায়॥
সাহস—কোলাহলে দিক্ জাগায়,
পাখিকুল—কোলাহলে বন মাতায়॥
এবার—জোলো আলোয় দিক্ ভাসায়॥

৪

ঐ লাল রতন দিন ফুটায়॥
ঢেকেছে—দিনমণি কাচ বসনে
সাঁওতাল গিরির নীল আভায়;
হাঁসি পায় ল্যাঙটা গিরির
চিকণ বাসের সভ্যতায়॥
চলেছে—দলেবলে নীল গিরি
লক্ষ মাথায় উড়িষ্যায়
যেন—তরঙ্গিতা দেখ ধরায়

তুলেছে—দেখা দেখি বসুমতী
ঢেউ মালায়
শকটের উল্টা দিকে
মৃত্তরঙ্গে দেশ্ ছুটায় ॥
(৫)
রৌদ্রের্—তীক্ষ্ণ প্রভায়্
প্রভাত্ কুসুম্ দেখ শুকায়্ ॥

বসিয়ে—দ্বারদেশে রৌদ্র সাথে
দিনের্ কায্ তোর্ অপেক্ষায়্
নীরবে—দলে দলে দিনের্ সাথে
দিনের্ কায্ তোর্ অপেক্ষায্
উঠউঠ দিন্ ফুরায়্ ॥

পলাশির যুদ্ধ।*

পলাশির যুদ্ধ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত। এবং পলাশির যুদ্ধ অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত। কেন না ইহার প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই। সুতরাং কাব্যকারের ইহাতে বিশেষ অধিকার। এই জন্যই বোধ হয়, মেকলে ক্লাইবের জীবনচরিত নামক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।* যাহা হউক মেকলের সঙ্গে আমাদের এক্ষণে কার্য্য নাই; নবীন বাবুর গ্রন্থের কথা বলি।

* আমরা এরূপ ব্যঙ্গ করিতে বড় ভয় পাই। সময়েং এরূপ ব্যঙ্গ করিয়া, আমরা বড় অপ্রতিভ হই। এদেশীয় পাঠকেরা সচরাচর, পিতৃ মাতৃ উচ্চারণ করিয়া অথবা মূর্খ, পাপিষ্ঠ, নরাধম বলিয়া কাহাকে গালি দিলে, বুঝিতে পারেন যে একটা রহস্য হইল বটে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে যে ব্যঙ্গ হইতে পারে, ইহা আমরা সকলে বড় বুঝিতে পারি না। যে সকল ইংরেজ সমালোচক, যাহা কিছু আর্য্য সাহিত্যে আর্য্য দর্শনে, আর্য্য ভাস্কর্য্যে, বা আর্য্য বিজ্ঞানে উৎকৃষ্ট দেখেন, তাহাই ইউরোপ হইতে নীত মনে করেন, তাঁহাদিগকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য, এবং যে সকল দেশী সমালোচক যেখানে সাদৃশ্য দেখেন, সেইখানে চুরি মনে করেন, তাঁহাদিগকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য, আমরা সেবার লিখিয়াছিলাম, যে শকুন্তলা মিরন্দার যেখানে সাদৃশ্য আছে, সেখানে অবশ্য সেক্ষপীয়র হইতে কালিদাস চুরি করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া অনেকেই ব্যতিব্যস্ত! কি সর্ব্বনাশ! কালিদাস সেক্ষপীয়রের পরবর্ত্তী! আর এক খানি গ্রন্থ সমালোচনা কালে, লেখক যেসকল পচা পুরাতন চর্ব্বিত চর্ব্বিত পুনশ্চর্ব্বিত তত্ত্ব লিখিয়াছিলেন, তাহার দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া, অতিশয় অভিনব বলিয়া পাঠককে উপঢৌকন দিয়াছিলাম। পড়িয়া লেখক বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া, রোদন করিয়া বলিলেন, "আমার লিখিত বিষয় সকলের নবীনত্ব

* পলাশির যুদ্ধ। (কাব্য) শ্রীনবীন চন্দ্র সেন প্রণীত। কলিকাতা। নূতন ভারত যন্ত্র। ১২৮১।

প্রথমসর্গে, নবদ্বীপনিবাসী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি পাঁচজন বঙ্গীয় প্রধান ব্যক্তিরা শেঠদিগের আগারে বসিয়া সেরাজউদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিবার পরামর্শ করিতেছেন। এই সর্গ যে কাব্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় এমত আমাদিগের বোধ হয় নাই; অন্ততঃ ইহা কিছু সংক্ষিপ্ত করিলে কাব্যের কোন হানি হইত না। ইহার দ্বারা কাব্যের প্রধান অংশ সূচিত এবং প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং নবীন বাবুর স্বাভাবিক কবিত্বের পরিচয় ইহাতে বিলক্ষণ আছে। দুই একটি উদাহরণ দিতেছি। কৃষ্ণচন্দ্রকৃত সিরাজউদ্দৌলার রাজ্য বর্ণন—

"বিরাজিত বঙ্গেশ্বর, বিচিত্র সভায়;—
কামিনী-কোমল-কোল রত্ন-সিংহাসন;
রাজদণ্ড সুরাপাত্র, যাহার প্রভায়
নবাব-নয়নে নিত্য ঘোরে ত্রিভুবন;
সুগোল মৃণালভুজ উত্তরীয় স্থলে
শোভিতেছে অংসোপরে; শুনিছে শ্রবণ
বামাকণ্ঠ-প্রেমালাপ মন্ত্রণার ছলে,
রমণীর সুশীতল রূপের কিরণ
আলোকিছে সভাস্থল, নৃপতি-সদন;
সঙ্গীতে গাইছে অর্থী মনের বেদন।"

রাণী ভবানীর উক্তি অতি সুন্দর, এবং ষড়্‌যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে তাঁহারই বাক্যসকল জ্ঞানগর্ভ। তাহা হইতে, হিন্দু যবনে যে সম্বন্ধ, তদ্বিষয়ক নিম্নোক্ত উপমাটি উদ্ধৃত করিলাম—

নাহি বৃথা জাতি দ্বন্দ্ব ধর্ম্মের কারণে—
অশ্বত্থ পাদপজাত উপবৃক্ষমত
হইয়াছে যবনেরা প্রায় পরিণত॥

ষড়্‌যন্ত্রে এই স্থির হইল যে ইংরেজের সাহায্যে অত্যাচারী সেরাজউদ্দৌলাকে দূর করিতে হইবে—সেরাজের সেনাপতিও তাহাদিগের সহিত মিলিত হইবেন। রাণী ভবানী এই পরামর্শের বিরোধিনী। ইংরেজের সাহায্য যাহা হইবে, তাহা দৈবী বাণীর ন্যায় কথা পরম্পরায় রাণী বুঝাইয়া দিলেন পরে নিজমত এইরূপ প্রকাশ করিলেন—

"আমার কি মত? তবে শুন মহারাজ!—
অসহ্য দাসত্ব যদি; নিষ্কোষিয়া অসি,
সাজিয়া সমর-সাজে নৃপতি-সমাজ
প্রবেশ সম্মুখরণে; যেন পূর্ণ শশী
বঙ্গ-স্বাধীনতা-ধ্বজা বঙ্গের আকাশে,
শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে,
হাসুক উজলি বঙ্গ;—এই অভিলাষে
কোন বঙ্গবাসী-রক্ত ধমনী-ভিতরে
নাহি হয় উষ্ণতর? আমি যে রমণী
বহিছে বিদ্যুৎবেগে আমার ধমনী।"

আছে বলিয়া বঙ্গদর্শন আমাকে গালি দিয়াছে!" কি দুঃখ!

এইস্থানে ক্লাইবের জীবনচরিতকে উপন্যাস গ্রন্থ বলিলাম দেখিয়া, এই সকল পাঠকগণ উপরিকথিত প্রথানুসারে তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন। তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য বলিয়া রাখা ভাল যে কতকগুলি বাঙ্গালা সম্বাদপত্র যেরূপ উপন্যাস, এও সেইরূপ উপন্যাস।

" ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতর।
পরদুঃখে সদা মম হৃদয় বিদরে ;'
সহি কিসে মাতৃদুঃখ ? সত্য সেঠবর!—
' বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থ সুবিস্তার
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন,
হও অগ্রসর, নহে করি পরিহার,
জঘন্য দাসত্ব-পন্থে কর বিচরণ।
প্রগল্‌ভতা মহারাজ! ক্ষম অবলার,
ভয়ে ভীত যদি, আমি দেখাব—আবার!!"

বলা বাহুল্য যে এ পরামর্শ মত কার্য্য হইল না। এইখানে প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গে, কাব্যের যথার্থ আরম্ভ। এইখান হইতে কবিত্বের উৎকর্ষ দেখা যায়। দ্বিতীয় সর্গহইতে এই কাব্যে, কবিত্বকুসুম এরূপ প্রভূতপরিমাণে বিকীর্ণ হইয়াছে, যে কোন স্থান উদ্ধৃত করিবে, সমালোচক তাহার কিছুই স্থিরতা পায় না। ইচ্ছা করে সকলই উদ্ধৃত করি। এইরূপ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে যিনি এ দুর্লভ রত্নসকল ছড়াইতে পারেন, তিনি যথার্থ ধনী বটেন।

কাটোয়া হইতে ইংরেজ সৈন্যের নদী পার হওয়ার চিত্র, তপনচিত্রিত ফটোগ্রাফতুল্য—এবং ফটোগ্রাফে যে অদ্ভুত রশ্মি নাই—ইহাতে তাহা আছে। অপরাহ্ন হইয়াছে—

খচিত সুবর্ণ মেঘে সুনীল গগন
হাসিছে উপরে ; নীচে নাচিছে রঙ্গিণী,
চুম্বি মৃদু কলকলে, মন্দ সমীরণ,—
তরল সুবর্ণময়ী গঙ্গা তরঙ্গিণী।
শোভিছে একটী রবি পশ্চিম গগনে,
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী-জীবনে।

অদূরে কাটোয়া দুর্গে ব্রিটিস্-কেতন,
উড়িছে গৌরবে উপহাসিয়া ভাস্করে।
উঠিতেছে ধূমপুঞ্জ আঁধারি গগন,
ভস্মিয়া যবন-বীর্য্য কাটোয়া-সমরে।
সশস্ত্র ব্রিটিস সৈন্য তরী আরোহিয়া
হইতেছে গঙ্গাপার, অস্ত্র ঝলমলে ;
দূরহতে বোধ হয়, যাইছে ভাসিয়া
জবা-কুসুমের মালা জাহ্নবীর জলে ;
রক্তবস্ত্রে, রণ-অস্ত্রে, রবির কিরণ
বিকাশিছে প্রতিবিম্ব, ধাঁধিয়া নয়ন।

ব্রিটিসের রণবাদ্য বাজে ঝম্ ঝম,
হইতেছে পদাতিক-পদ সঞ্চালন
তালে তালে, বাজে অস্ত্র ঝনন ঝনন্,
হেষিছে তুরঙ্গ রঙ্গে, গর্জ্জিছে বারণ।
থেকে থেকে বীরকণ্ঠ সৈনিকের স্বরে,
ঘুরিছে ফিরিছে সৈন্য ভুজঙ্গ যেমতি
সাপুড়িয়া মন্ত্রবলে;—কভু অস্ত্র করে,
কভু স্কন্ধে ; ধীরপদ ; কভু দ্রুতগতি।
'ড্রমের' ঝর্ঝর রব ' বিপুল' ঝঙ্কার
বিজ্ঞাপিছে ব্রিটিসের বীর অহঙ্কার।

সৈনিকদিগের কেবল বাহ্য দৃশ্য নহে, আন্তরিক ভাবও সুচিত্রিত হইয়াছে। গঙ্গা পার হইয়া, সেনাপতি ক্লাইব তরুতলে বসিয়া, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যচিন্তিত। ভাবী ঘটনার অনিশ্চয়তা এবং আপনার দুঃসাহসিকতা পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি

শঙ্কিত। এই অবস্থায় ইংলণ্ডীয় রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে দর্শন দিয়া, তাঁহাকে আশ্বাসিত করেন। সেই চিত্রটি, যথার্থ কবির সৃষ্টি; রাজলক্ষ্মীকে কবি এক অপূর্ব্ব মহিমাময় শোভায় পরিমণ্ডিত করিয়াছেন।

কোটি কহিনুর কান্তি করিয়া প্রকাশ,
শোভিছে ললাট-বক্ষ, সেই বরাননে;
গৌরবের রঙ্গভূমি, দয়ার নিবাস,
প্রভুত্ব ও প্রগল্‌ভতা বসে একাসনে।
শোভে বিমণ্ডিত যেন বালার্ক-কিরণে,
কনক-অলকাবলী—বিমুক্ত কুঞ্চিত,
অপূর্ব্ব খচিত চারু কুসুম রতনে,—
চির-বিকসিত পুষ্প, চির-সুবাসিত
বামার সুরভি শ্বাস, কুসুম সৌরভ,
ঘ্রাণে নর অমরতা করে অনুভব।

ঝলসিছে শীর্ষোপরি কিরীট উজ্জ্বল,
নির্ম্মিত জ্যোতিতে, জ্যোতির্ম্মালায়খচিত
জ্যোতি রত্নে অলঙ্কৃত, জ্যোতিই সকল;
জ্বলিছে হাসিছে জ্যোতিঃ চির প্রজ্বলিত।
উজ্জ্বল সে জ্যোতিঃ জিনি মধ্যাহ্ন তপন,
অথচ শীতল যেন শারদ চন্দ্রিমা,
যেমন প্রখরতেজে ঝলসে নয়ন,
তেমতি অমৃত মাখা পূর্ণমধুবিমা।
ক্লাইব মুদিত নেত্রে জাগ্রত স্বপনে,
ভুবন ঈশ্বরী মূর্ত্তি দেখিলা নয়নে।

তাঁহার বাক্যগুলি আকাশপ্রসূত মেঘধ্বনি আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে।

"রাজার উপরে রাজা, রাজরাজেশ্বর;
জেতার উপরে জেতা জিতের সহায়,
আছেন উপরে বৎস! অতি ভয়ঙ্কর!
দয়ালু, অপক্ষপাতী, মূর্ত্তিমান্ ন্যায়,
তাঁর রবি শশী তারা নক্ষত্রমণ্ডলে,
সমভাবে দেয় দীপ্তি ধনী ও নির্ধনে,
সমভাবে সর্ব্বদেশে শ্বেতে ও শ্যামলে
বরষে তাঁহার মেঘ, বাঁচায় পবনে।
পার্থিব উন্নতি নহে, পরীক্ষা কেবল
সম্মুখে ভীষণ, বৎস! গণনার স্থল।"

ক্ষুদ্র২ বিষয়ের বর্ণনায়, কবির কবিত্ব প্রকাশ। নিম্নোদ্ধৃত ক্ষুদ্র চিত্রটি দেখ—

সজ্জিত তরণী ছিল তীরে দাঁড়াইয়া,
লম্ফ দিয়া যেই বীর তরী আরোহিল;
স্থির ভাগীরথী জল করি উচ্ছসিত,
অমনি ব্রিটিস্ বাদ্য বাজিয়া উঠিল;
ছুটিল তরণী বেগে বারি বিদারিয়া,
তালে তালে দাঁড়ী দাঁড়ে পড়িতে লাগিল;
আঘাতে আঘাতে গঙ্গা উঠিল কাঁপিয়া,
সুনীল আরশি খানি ভাঙিল গড়িল;
একতানে বীরকণ্ঠ ব্রিটিস-তনয়
গায় "জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয়—"

ঐ তরণীর নাবিক দিগের গীত অতি মনোহর—বাইরণের যোগ্য। গীতটি শুনিয়া বাইরণকৃত নাবিকদস্যুর গীত মনে পড়ে।*

সমুদ্রের বুকে পদাঘাত করি,
অভয়ে আমরা ব্রিটননন্দন;
আজ্ঞাবহ করি তরঙ্গলহরী,
দেশ দেশান্তরে করি বিচরণ।

* *The Corsair.*

নবআবিষ্কৃত আমেরিকা দেশে,
কিম্বা আফ্রিকার মৃগতৃষ্ণিকায়,
ঐশ্বর্য্যশালিনী পূরব প্রদেশে,
ইংলণ্ডের কীর্ত্তি না আছে কোথায় ?
পূরব পশ্চিম গায় সমুদয়,
"জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয়।"

সম্পদ সাহস ;সঙ্গী তরবার;
সমুদ্র বাহন; নক্ষত্র কাণ্ডারী;
ভরসা কেবল শক্তি আপনার ;
শয্যা রণক্ষেত্র; ঈষা ত্রাণকারী।
বজ্রাগ্নি জিনিয়া আমাদের গতি,
দাবানলসম বিক্রম বিস্তার ;
আছে কোন্ দুর্গ? কোন্ অদ্রিপতি?
কোন্ নদ নদী, ভীম পারাবার ?
শুনিয়া সভয়ে কম্পিত না হয়,
"জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয় ?"

আকাশের তলে এমন কি আছে,
ডরে যারে বীর ব্রিটিসতনয় ?
কেবল ব্রিটিসললনার কাছে,
সে বীরহৃদয় মানে পরাজয়;
বীরবিনোদিনী সেই বামাগণে,
স্মরিয়া অন্তরে; চল রণে তবে ;
হায়! কিবা সুখ উপজিবে মনে,
শুনে রণবার্ত্তা বামাগণে যবে,
গাবে বামাকণ্ঠ-স্বর করি লয়,
"জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয়।"

অতএব সবে অভয় অন্তরে,
চীত হয়ে পড়ে দাও দাঁড়ে টান,
ব্রিটনিয়াপুত্র রণে নাই ডরে,
খেলার সামগ্রী বন্দুক কামান ;
ব্রিটিসের নামে ফিরে সিন্ধুগতি,
বিক্ষিপ্ত অশনি অর্দ্ধপথে রয়;
কিছার দুর্ব্বল যবনভূপতি,
অবশ্য সমরে হবে পরাজয়;
গাবে বঙ্গসিন্ধু, গাবে হিমালয়,
"জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয়।"

তৃতীয় সর্গের আরম্ভে সিরাজদ্দৌলার শিবিরে নৃত্য গীতের ধূম পড়িয়াগিয়াছে। এমত সময়ে,সহসা,ইংরেজের বজ্র গর্জ্জিয়া উঠিল। পুনশ্চ, বাইরণ কৃত,ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পূর্ব্বরাত্রি বর্ণনা স্মরণ পড়ে—

"There was a sound of revelry by night" &c.

নিম্নলিখিত গায়িকার বর্ণনাও বাই-রনের যোগ্য—

বাণী-বীণা বিনিন্দিত স্বর মধুময়
বহিছে কাঁপায়ে রক্ত অধরযুগল;
বহিতেছে সুশীতল বসন্তমলয়
চুম্বি পারিজাত যেন, মাখি পরিমল ;
বিলাসবিলোল যুগ্ম নেত্রনীলোৎপল
বাসনা-সলিলে, মরি, ভাসিছে কেবল!

তোপের শব্দে নৃত্যগীত ভাঙ্গিয়া গেল—সিরাজদ্দৌলা ভবিতব্য চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার উক্তিগুলিতে, তাঁহার স্বার্থপর, অধ্যবসায়বিহীন, দুর্ব্বল, ভীত চিত্ত, অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত প্রকটিত হইয়াছে। এই কাব্যে কবি চরিত্রের আশ্লেষণ† শক্তির তাদৃশ পরিচয় দেন

† Synthesis.

নাই বটে কিন্তু এই স্থলে বিশ্লেষণ‡ শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন।

নবাব, আপনার কর্ম্মফল ও চরিত্র-দোষ চিন্তা করিয়া, ভয়বিমূঢ় হইয়া, মীরজাফরের শরণ লইব বলিয়া দৌড়িলেন, কিন্তু ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার একজন স্নেহময়ী মহিষী তাঁহাকে তুলিয়া, অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলেন। এদিকে, এক ব্রিটিস্ যুবক—

প্রিয়ে কেরোলাইনা আমার!

ইত্যাদ্য এক সুমধুর গীতিধ্বনি বিকীর্ণ করিতে লাগিল—এইরূপে রজনী প্রভাতা হইল। তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত হইল।

এই কাব্যের বিশেষ একটি দোষ, কার্য্যের মন্থরগতি। ইহাতে কার্য্য অতি অল্প; যাহা আছে, তাহার গতি অতি অল্পে২ হইতেছে। অল্প ঘটনার বিস্তীর্ণ বর্ণনায় সর্গসকল পরিপূরিত হইতেছে। প্রথম সর্গে রাজগণ পরামর্শ করিলেন, এই মাত্র; দ্বিতীয় সর্গে ইংরেজসেনা গঙ্গা পার হইয়া পলাশীতে আসিল এই মাত্র; তৃতীয় সর্গে কিছুই হইল না। কিন্তু কবির ওজস্বিনী কবিতার মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া, এসকল দোষ লক্ষিত করিবার অবকাশ পাওয়া যায় না।

চতুর্থ সর্গে পলাশির যুদ্ধ। যুদ্ধ বর্ণনা অতি সুন্দর—

ইংরাজের বজ্রনাদী কামান সকল,
গম্ভীর গর্জ্জন করি,
নাশিতে সম্মুখ অরি,
মুহূর্ত্তেকে উগরিল কালান্ত অনল।

বিনামেঘে বজ্রাঘাত চাষা মনে গণি,
ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণে,
চাহিল আকাশ পানে,
ঝরিল কামিনী-কক্ষ-কলসী অমনি।

পাখিগণ কলরব করি ব্যস্তমনে,
পশিল কুলায়ে ডরে;
গাভীগণ ছুটে রড়ে,
বেগে গৃহদ্বারে গিয়ে হাঁকাল সঘনে।

আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন।
উগরিল ধূমরাশি,
আঁধারিল দশ দিশি,
গরজিল সেই সঙ্গে ব্রিটিস বাজন।

আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন।
কাঁপাইয়া ধরাতল,
বিদারিয়া রণস্থল,
উঠিল যে ভীমরব ফাটিল গগন।

সেই ভীমরবে মাতি ক্লাইবের সেনা,
ধূমে আবরিত দেহ,
কেহ অশ্বে পদে কেহ,
গেল শত্রু মাঝে, অস্ত্রে বাজিল ঝঞ্ঝনা।

খেলিছে বিদ্যুৎ এক ধাঁধিয়া নয়ন!
লাখে লাখে তরবার,
ঘুরিতেছে অনিবার,
রবিকরে প্রতিবিম্ব করি প্রদর্শন।

‡ Analysis.

ছুটিল একটী গোলা রক্তিম-বরণ,
বিষম বাজিল পায়ে,
সেই সাংঘাতিক ঘায়ে,
ভূতলে হইল মির্ মদন পতন!

"হুর্‌রো, হুর্‌রো" করি গর্জ্জিল ইংরাজ,
নবাবের সৈন্যগণ,
ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ,
পলাতে লাগিল সবে নাহি সহে ব্যাজ।

"দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে, দাঁড়ারে যবন,
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ,
যদি ভঙ্গ দেও রণ,"
গর্জ্জিল মোহনলাল "নিকট শমন?"

তৎপরে মোহনলালের যে বীরবাক্য আছে, তাহা আরও সুন্দর। সত্য ইতিহাসে ইহা কীর্ত্তিত আছে, যে হিন্দু সেনাপতি মোহনলাল পলাশির ক্ষেত্রে ক্লাইবকে প্রায় বিমুখ করিয়াছিলেন, এবং যদি মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা না করিতেন, তবে ভারত সাম্রাজ্য অদ্য কে ভোগ করিত তাহা বলা যায় না। যবনসেনা পলায়নোদ্যত দেখিয়া মোহনলাল তাহাদিগকে ফিরাইবার জন্য যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিব কি? না, পাঠকের ইচ্ছা হয়, বিরলে বসিয়া আপনি পাঠ করিবেন।

তাঁহার বাক্যে সৈন্য আবার ফিরিল আবার রণ হইতে লাগিল—কিন্তু এমত সময়ে শঠ মিরজাফরের পরামর্শে নবাব রণস্থগিত করিবার আজ্ঞা প্রচার করিলেন। নবাবের সৈন্য তখন রণে নিবৃত্ত হইল। তাহা দেখিয়া ইংরেজ দ্বিগুণ বল করিল—

তেমতি বারেক যদি টলিল যবন,
ইংরাজ শঙ্গিন করে,
ইন্দ্র যেন বজ্র ধরে,
ছুটিল পশ্চাতে, যেন কৃতান্ত সমন।

কারো, বুকে কারো পৃষ্ঠে, কাহারও গলায়
লাগিল; শঙ্গিন ঘায়,
বরিষার ফোটাপ্রায়,
আঘাতে আঘাতে পড়ে যবন ধরায়।

ঝম্ ঝম্ ঝম্ করি ব্রিটিসবাজনা,
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
আনন্দে করিল বঙ্গে বিজয়ঘোষণা।

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি অচল উপর,
শোণিতে আরক্তকায়,
অস্ত গেল রবি, হায়!
অস্ত গেল যবনের গৌরবভাস্কর।

ইংলণ্ডের রণজয় হইল—সূর্য্যাস্ত হইল—কবি সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া নিজমনের কথা কিছু লিখিয়াছেন। কিন্তু এরূপ উপাখ্যান কাব্যে এতাদৃশ দীর্ঘ মন্তব্য, আমাদিগের বিবেচনায় যথাস্থানে নিবিষ্ট নহে। চাইলড হেরল্ডে বাইরণ সচরাচর এইরূপ মন্তব্য পদ্যে বিন্যস্ত করিয়া লোকমুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু চাইল্ড হেরল্ড বর্ণন কাব্য, আর পলাশির যুদ্ধ উপাখ্যান কাব্য। যাহা চাইল্ড হেরল্ডে সাজে,

পলাশির যুদ্ধে তাহা সাজে না। এই কাব্যে কার্য্যের গতিরোধ করা কর্ত্তব্য হয় নাই। কিন্তু এ কাব্যের কার্য্য অতি মন্দগামী, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

পঞ্চম সর্গে জেতৃগণের উৎসব, সিরাজদ্দৌলার কারাবাস ও মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে।

মেঘনাদবধ, বা বৃত্রসংহারের সহিত এই কাব্যের তুলনা করিতে চেষ্টা পাইলে, কবির প্রতি অবিচার করা হয়। ঐ কাব্যদ্বয়ের ঘটনা সকল, কাল্পনিক, অতি প্রাচীন কালে ঘটিয়াছিল বলিয়া কল্পিত এবং সুরাসুর রাক্ষস, বা অমানুষিক শক্তিধর মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত; সুতরাং কবি সে ক্ষেত্রে যথেচ্ছা ক্রমে বিচরণ করিয়া, আপনার অভিলাষ মত সৃষ্টি করিতে পারেন। পলাশির যুদ্ধে ঘটনা সকল ঐতিহাসিক, আধুনিক; এবং আমাদিগের মত সামান্য মনুষ্যকর্ত্তৃক সম্পাদিত। সুতরাং কবি এস্থলে, শৃঙ্খলাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পৃথিবীতে বদ্ধ, আকাশে উঠিয়া গান করিতে পারেন না। অতএব কাব্যের বিষয়নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নবীন বাবুকে সৌভাগ্যশালী বলিতে পারি না।

তবে, এই কাব্যমধ্যে ঘটনাবৈচিত্র সৃষ্টিবৈচিত্র, সঙ্ঘটন করা, কবির সাধ্য বটে। তৎসম্বন্ধে নবীন বাবু তাদৃশ শক্তিপ্রকাশ করেন নাই। বৃত্রসংহারের একটি বিশেষ গুণ এই যে, সেই এক খানি কাব্যে উৎকৃষ্ট উপাখ্যান আছে, নাটক আছে, এবং গীতিকাব্য আছে। পলাশির যুদ্ধে, উপাখ্যান এবং নাটকের ভাগ অতি অল্প—গীতি অতি প্রবল। নবীন বাবু বর্ণনা এবং গীতিতে এক প্রকার মন্ত্রসিদ্ধ। সেইজন্য পলাশির যুদ্ধ এত মনোহর হইয়াছে।

এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বাইরণের লিপিপ্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। চরিত্রের আশ্লেষণে দুইজনের একজনও কোন শক্তি প্রকাশ করেন নাই—বিশ্লেষণে দুইজনেরই কিছু শক্তি আছে। নাটকের যাহা প্রাণ—হৃদয়ে হৃদয়ে "ঘাত প্রতিঘাত"—দুইজনের একজনের কাব্যে তাহার কিছুমাত্র নাই। কিন্তু অন্যদিকে দুইজনেই অত্যন্ত শক্তিশালী। ইংরেজিতে বাইরণের কবিতা তীব্রতেজস্বিনী জ্বালাময়ী অগ্নিতুল্যা, বাঙ্গালাতেও নবীন বাবুর কবিতা সেইরূপ তীব্রতেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা। তাঁহাদিগের হৃদয়নিরুদ্ধ ভাব সকল, আগ্নেয় গিরিনিরুদ্ধ, অগ্নিশিখাবৎ—যখন ছুটে, তখন তাহার বেগ অসহ্য। বাইরণ স্বয়ং এক স্থানে কোন নায়কের প্রণয়বেগ বর্ণনাচ্ছলে নায়ককে যাহা বলাইয়াছেন, তাঁহার নিজের কবিতার বেগ এবং নবীনবাবুর কবিতার বেগসম্বন্ধে তাহাই বলা যাইতে পারে।

*

But mine was like the lava flood
That boils in Etna's breast of flame.

I cannot prate in puling strain
Of ladye-love and beauty's chain:
If changing cheek and scorching vein,
Lips taught to writhe but not complain,
If bursting heart, and madd'ning brain,
And daring deed and vengeful steel
And all that I have felt and feel,
Betoken love, that love was mine,
And shown by many a bitter sign*

নবীন বাবুরও যখন স্বদেশবাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না। সেও গৈরিক নিস্রবের ন্যায়। যদি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয়শূন্য তেজোময়, সত্যপ্রিয়তা, যদি দুর্ব্বাসাপ্রার্থিত ক্রোধ, দেশবাৎসল্যের লক্ষণ হয়—তবে সেই দেশবাৎসল্য নবীন বাবুর, এবং তাহার অনেক লক্ষণ এই কাব্যমধ্যে বিকীর্ণ হইয়াছে।

বাইরণের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। বাইরণের ন্যায়, তাঁহারও শক্তি আছে, যে দুই চারিটি কথায়, তিনি উৎকৃষ্ট বর্ণনার অবতরণ করিতে পারেন। ক্লাইবের নৌকারোহণ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। কিন্তু অনেক সময়েই, নবীনবাবু সে প্রথা পরিত্যাগ করিয়া, বর্ণনায় অনর্থক কালহরণ করেন।

যাহাই হউক, কবিদিগের মধ্যে নবীন বাবুকে আমরা অধিকতর উচ্চ আসন দিতে পারি না পারি, তাঁহাকে বাঙ্গালার বাইরণ বলিয়া পরিচিত করিতে পারি। এ প্রশংসা বড় অল্প প্রশংসা নহে। পলাশির যুদ্ধ যে বাঙ্গালার সাহিত্য ভাণ্ডারে একটি বহুমূল্য রত্ন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

উপসংহারকালে, পাঠকদিগকে আমরা একটি কথা বলিব। পলাশির যুদ্ধের আমরা রাখিয়া ঢাকিয়া পরিচয় দিয়াছি। যদি তাঁহারা ইহার যথার্থ পরিচয় লইতে ইচ্ছা করেন, আদ্যোপান্ত স্বয়ং পাঠ করিবেন। যে বাঙ্গালি হইয়া, বাঙ্গালির আন্তরিক রোদন না পড়িল, তাহার বাঙ্গালি জন্ম বৃথা।

* The Giaour.

রাধারাণী।

১

রাধারাণী নামে এক বালিকা, মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই। তাহাদিগের অবস্থা পূর্ব্বে ভালছিল—বড় মানুষের মেয়ে। কিন্তু তাহার পিতা নাই; তাহার মাতার সঙ্গে একজন জ্ঞাতির একটি মোকদ্দামা হয়; সর্ব্বস্ব লইয়া মোকদ্দামা; মোকদ্দামাটি বিধবা হাইকোর্টে হারিল। সে হারিবামাত্র, ডিক্রীদার জ্ঞাতি ডিক্রী জারি করিয়া, ভদ্রাসন হইতে উহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। প্রায় দশলক্ষ টাকার সম্পত্তি, ডিক্রীদার সকলই লইল। খরচা ও ওয়াশিলাত দিতে নগদ যাহাছিল, তাহাও গেল; রাধারাণীর মাতা, অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া, প্রিবিকৌন্সিলে একটি আপীল করিল। কিন্তু আর আহারের সংস্থান রহিল না। বিধবা একটি কুটীরে আশ্রয় লইয়া, কোন প্রকারে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল। রাধারাণীর বিবাহ দিতে পারিল না।

কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে রথের পূর্ব্বে রাধারাণীর মা ঘোরতর পীড়িতা হইল—যে কায়িক পরিশ্রমে দিনপাত হইত, তাহা বন্ধ হইল। সুতরাং আর আহার চলে না। মাতা রুগ্না, এজন্য কাজে কাজেই তাহার উপবাস; রাধারাণীর জুটিল না, বলিয়া উপবাস। রথের দিন তাহার মা একটু বিশেষ হইল, পথ্যের প্রয়োজন হইল, কিন্তু পথ্য কোথা? কি দিবে?

রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কতকগুলি বনফুল তুলিয়া, তাহার মালা গাঁথিল। মনে করিল যে এই মালা রথের হাটে বিক্রয় করিয়া দুই একটি পয়সা পাইব, তাহাতেই মার পথ্য হইবে।

কিন্তু রথের টান অর্দ্ধেক হইতে না হইতেই বড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি দেখিয়া লোক সকল ভাঙ্গিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না। রাধারাণী মনে করিল যে আমি একটু না হয় ভিজিলাম—বৃষ্টি থামিলেই আবার লোক জমিবে। কিন্তু বৃষ্টি আর থামিল না। লোক আর জমিল না। সন্ধ্যা হইল—রাত্রি হইল—বড় অন্ধকার হইল—অগত্যা রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল।

অন্ধকার—পথ কর্দ্দমময়, পিচ্ছিল—কিছুই দেখা যায় না। তাহাতে মূষলধারে শ্রাবণের ধারা বর্ষিতেছিল। মাতার অন্নাভাব মনে করিয়া তদপেক্ষাও রাধারাণীর চক্ষুঃবারিবর্ষণ করিতেছিল। রাধারাণী কাঁদিতে২ আছাড় খাইতেছিল—কাঁদিতে২ উঠিতেছিল—আবার কাঁদিতে২ আছাড় খাইতেছিল। দুই গণ্ডবিলম্বী ঘন কৃষ্ণ অলকাবলী বহিয়া, কবরী

বহিয়া, বৃষ্টির জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। তথাপি রাধারাণী সেই এক পয়সার বনফুলের মালা বুকে করিয়া রাখিয়াছিল—ফেলে নাই।

এমত সময়ে অন্ধকারে, অকস্মাৎ কে আসিয়া রাধারাণীর ঘাড়ের উপর পড়িল। রাধারাণী এতক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কাঁদে নাই—এক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিল।

যে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল সে বলিল, "কে গা তুমি কাঁদ?"

পুরুষমানুষের গলা—কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাধারাণীর রোদন বন্ধ হইল। রাধারাণীর চেনা লোক নহে—কিন্তু বড় দয়ালু লোকের কথা—রাধারাণীর ক্ষুদ্র বুদ্ধিটুকুতে ইহা বুঝিতে পারিল। রাধারাণী রোদন বন্ধ করিয়া বলিল,

"আমি দুঃখীলোকের মেয়ে। আমার কেহ নাই—কেবল মা আছে।"

সে পুরুষ বলিল, "তুমি কোথা গিয়াছিলে?"

রা। আমি রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। বাড়ী যাইব। কিন্তু অন্ধকারে, বৃষ্টিতে পথ পাইতেছি না।

পুরুষ বলিল, "তোমার বাড়ী কোথা?"

রাধারাণী বলিল, "শ্রীরামপুর।"

সে ব্যক্তি বলিল, "আমার সঙ্গে আইস—আমিও শ্রীরামপুর যাইব। চল, কোন পাড়ায় তোমার বাড়ী—তাহা আমাকে বলিয়া দিও—আমি তোমাকে বাড়ী বাখিয়া আসিতেছি। বড় পিছল, তুমি আমার হাত ধর, নহিলে পড়িয়া যাইবে।"

এইরূপে সে ব্যক্তি রাধারাণীকে লইয়া চলিল। অন্ধকারে সে রাধারাণীর বয়স অনুমান করিতে পারে নাই, কিন্তু কথার স্বরে বুঝিয়াছিল, যে রাধারাণী বড় বালিকা। এখন রাধারাণী তাহার হাত ধরায় হস্তস্পর্শে জানিল, রাধারাণী বড় বালিকা। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল যে, "তোমার বয়স কত?"

রাধা। দশ এগার বছর—

"তোমার নাম কি?"

রাধা। রাধারাণী

"হাঁ রাধারাণী! তুমি ছেলেমানুষ একেলা রথ দেখিতে গিয়াছিলে কেন?"

তখন সে, কথায় কথায়, মিষ্ট২ কথাগুলি বলিয়া, সেই এক পয়সার বনফুলের মালার সকল কথাই বাহির করিয়া লইল। শুনিল, যে মাতার পথ্যের জন্য বালিকা এই মালা গাঁথিয়া রথহাটে বেচিতে লইয়াগিয়াছিল—রথ দেখিতে যায় নাই—সে মালাও বিক্রয় হয় নাই—এক্ষণও বালিকার হৃদয়মধ্যে লুক্কায়িত আছে। তখন সে বলিল, "আমি একছড়া মালা খুঁজিতেছিলাম। আমাদের বাড়ীতে ঠাকুর আছে তাঁহাকে পরাইব। রথের হাট শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল—আমি তাই মালা কিনিতে পারি নাই। তুমি মালা বেচ ত আমি কিনি।"

রাধারাণীর আনন্দ হইল, কিন্তু মনে ভাবিল যে আমাকে যে এত যত্ন করিয়া, হাত ধরিয়া, এ অন্ধকারে বাড়ী লইয়া যাইতেছে, তাহার কাছে দাম লইব কি

প্রকারে? তা, নহিলে, আমায় মা খেতে পাবে না। তা নিই।

এই ভাবিয়া রাধারাণী, মালা, সমভিব্যাহারীকে দিল। সমভিব্যাহারী বলিল, "ইহার দাম চারি পয়সা—এই লও।" সমভিব্যাহারী এই বলিয়া মূল্য দিল। রাধারাণী বলিল, "এ কি পয়সা? এ যে বড় ঠেক্‌চে।"

"ডবল পয়সা—দেখিতেছ না দুইটা বৈ দিই নাই।"

রাধা। তা এ যে অন্ধকারেও চক্ চক্ করচে। তুমি ভুলে টাকা দাও নাই ত?

"না। নূতন কলের পয়সা, তাই চক্ চক্ করচে।"

রাধা। তা, আচ্ছা ঘরে গিয়ে, প্রদীপ জেলে যদি দেখি, যে পয়সা নয়, তখন ফিরাইয়া দিব। তোমাকে সেখানে একটু দাঁড়াইতে হইবে।

কিছু পরে, তাহারা রাধারাণীর মার কুটীরদ্বারে, আসিয়া উপস্থিত হইল। সে খানে গিয়া, রাধারাণী বলিল, "তুমি ঘরে আসিয়া দাঁড়াও, আমরা আলো জ্বালিয়া দেখি টাকা কি পয়সা।"

সঙ্গী বলিল, "আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি। তুমি আগে ভিজা কাপড় ছাড়—তার পর প্রদীপ জ্বালিও।"

রাধারাণী বলিল, "আমার আর কাপড় নাই—একখানি ছিল,তাহা কাচিতে দিয়াছি। তা, আমি ভিজা কাপড়ে সর্ব্বদা থাকি, আমার ব্যামো হয় না। আঁচলটা নিঙড়ে পরিব এখন। তুমি দাঁড়াও আমি আলো জ্বালি।"

"আচ্ছা।"

ঘরে তৈল ছিল না, সুতরাং চালের খড় পাড়িয়া, চকমকি ঠুকিয়া, আগুণ জ্বালিতে হইল। আগুণ জ্বালিতে কাজে কাজেই একটু বিলম্ব হইল। আলো জ্বালিয়া, রাধারাণী দেখিল, টাকা বটে, পয়সা নহে।

তখন রাধারাণী বাহিরে আসিয়া আলো ধরিয়া তল্লাস করিয়া দেখিল, যে টাকা দিয়াছে, সে নাই—চলিয়া গিয়াছে।

রাধারাণী তখন বিষণ্ণবদনে, সকল কথা তাহার মাকে বলিয়া, মুখপানে চাহিয়া রহিল—সকাতরে বলিল—"মা। এখন কি হবে!"

মা বলিল, "কি হবে বাছা! সে কি আর না জেনে টাকা দিয়েছে। সে দাতা, আমাদের দুঃখ শুনিয়া দান করিয়াছে—আমরাও ভিখারী হইয়াছি—দানগ্রহণ করিয়া খরচ করি।"

তাহারা এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এমত সময়ে কে আসিয়া তাহাদের কুটীরের আগড় ঠেলিয়া বড় শোর গোল উপস্থিত করিল। রাধারাণী দ্বার খুলিয়া দিল—মনে করিয়াছিল যে সেই তিনিই বুঝি আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। পোড়া কপাল! তিমি কেন? পোড়ার মুখো কাপুড়ে মিন্‌সে!

রাধারাণীর মার কুটীর, বাজারের অনতিদূরে। তাহাদের কুটীরের নিক-

টেই পদ্মলোচন শাহার কাপড়ের দোকান। পদ্মলোচন খোদ,—সেই পোড়ার মুখো কাপুড়ে মিন্সে—একজোড়া নূতন কুঞ্জদার শান্তিপুরে কাপড় হাতে করিয়া আনিয়াছিল, এখন দ্বার খোলা পাইয়া তাহা রাধারাণীকে দিল। বলিল "রাধারাণীর এই কাপড়।"

রাধারাণী বলিল, "ওমা! আমার কিসের কাপড়!"

পদ্মলোচন—সে বাস্তবিক পোড়ার মুখো কি না, তাহা আমরা সবিশেষ জানি না—রাধারাণীর কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল। বলিল, "কেন, এই যে এক বাবু এখনই আমাকে নগদ দাম দিয়া বলিয়া গেল, যে এই কাপড় এখনই ঐ রাধারাণীকে দিয়া এসো।"

রাধারাণী তখন বলিল, "ওমা সেই গো! সেই। তিনিই কাপড় কিনে পাঠিয়ে দিয়েচেন। হাঁগা, পদ্মলোচন।"—

রাধারাণীর পিতার সময় হইতে পদ্মলোচন ইহাদের কাছে সুপরিচিত—অনেক বারই ইঁহাদিগের নিকট, যখন সুদিন ছিল, তখন, চারি টাকার কাপড়ে শপথ করিয়া আট টাকা সাড়ে বার আনা, আর দুই আনা মুনফা লইয়াছিলেন—

"হাঁ পদ্মলোচন—বলি সে বাবুটিকে চেন?" পদ্মলোচন বলিল, "তোমরা চেন না?"

রাধা। না।

পদ্ম। আমি বলি তোমাদের কুটুম্ব। আমি চিনি না।

যাহা হৌক, পদ্মলোচন চারি টাকার কাপড় আবার মায় মুনফা আট টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনায় বিক্রয় করিয়াছিলেন, আর অধিক কথা কহিবার প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া প্রসন্নমনে দোকানে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে রাধারাণী, প্রাপ্ত টাকা ভাঙ্গাইয়া মার পথ্যের উদ্যোগের জন্য বাজারে গেল। বাজার করিয়া, তৈল আনিয়া, প্রদীপ জ্বালিল। মার জন্য যৎকিঞ্চিৎ রন্ধন করিল। স্থান পরিস্কার করিয়া, মাকে অন্ন দিবে, এই অভিপ্রায়ে ঘর ঝাঁটাইতে লাগিল। ঝাঁটাইতে একখানা কাগজ কুড়াইয়া পাইল—হাতে করিয়া তুলিল—"এ কি মা!"

মা, দেখিয়া বলিল—একখানা নোট!

রাধারাণী বলিল, "তবে তিনি ফেলিয়া গিয়াছেন।"

মা, বলিলেন, "হাঁ। তোমাকে দিয়া গিয়াছেন। দেখ, লেখা আছে "রাধারাণীর জন্য।"

রাধারাণী বলিল, "হাঁ মা, এমন লোক কে মা!"

মা বলিলেন, "তাঁহার নামও নোটে লেখা আছে। পাছে কেহ চোরা নোট বলে, এই জন্য নাম লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম রুক্মিণীকুমার রায়।"

পরদিন, মাতায় কন্যায়, রুক্মিণীকুমার রায়ের অনেক সন্ধান করিল। কিন্তু

শ্রীরামপুরে, বা নিকটবর্ত্তী কোনস্থানে রুক্মিণীকুমার রায়, কেহ আছে, এমত কোন সন্ধান পাইল না। নোটখানি তাহারা ভাঙ্গাইল না—তুলিয়া রাখিল—তাহারা দরিদ্র, কিন্তু লোভী নহে।

২

রাধারাণীর মাতা পথ্য করিলেন বটে, কিন্তু সে রোগহইতে মুক্তি পাওয়া, তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। তিনি অতিশয় ধনী ছিলেন, এখন অতি দুঃখিনী হইয়া ছিলেন, এই শারীরিক এবং মানসিক দ্বিবিধ কষ্ট, তাঁহার সহ্য হইল না। রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, তাঁহার শেষকাল উপস্থিত হইল।

এমত সময়ে, বিলাত হইতে সম্বাদ আসিল যে প্রিবি কৌন্সিলের আপীলে তাঁহার পক্ষে নিষ্পত্তি পাইয়াছে; তিনি আপন সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন, ওয়াশিলাতের টাকা ফেরৎ পাইবেন, এবং তিন আদালতের খরচা পাইবেন। কামাখ্যানাথ বাবু তাঁহার পক্ষে হাইকোর্টে উকীল ছিলেন, তিনি স্বয়ং এই সম্বাদ লইয়া রাধারাণীর মাতার কুটীরে উপস্থিত হইলেন। সুসম্বাদ শুনিয়া, রুগ্নার অবিরল নয়নাশ্রু পড়িতে লাগিল।

তিনি নয়নাশ্রু সম্বরণ করিয়া কামাখ্যা বাবুকে বলিলেন, "যে প্রদীপ নিবিয়াছে, তাহাতে তেল দিলে কি হইবে? আপনার এ সুসম্বাদেও আমর আর প্রাণরক্ষা হইবে না। আমার আয়ুঃশেষ হইয়াছে। তবে আমার এই সুখ, যে রাধারাণী আর অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে না। তাই বা কে জানে? সে বালিকা, তাহার এ সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে? কেবল আপনিই ভরসা। আপনি, আমার এই অন্তিমকালে আমারে একটি ভিক্ষা দিউন—নহিলে আর কাহার কাছে চাহিব?"

কামাখ্যাবাবু অতি ভদ্র লোক। এবং তিনি রাধারাণীর পিতার বন্ধু ছিলেন। রাধারাণীর মাতা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে, তিনি রাধারাণীর মাতাকে বলিয়াছিলেন, যে যতদিন না আপীল নিষ্পত্তি পায়, অন্ততঃ ততদিন তোমরা আসিয়া আমার গৃহে অবস্থান কর, আমি আপনার মাতার মত তোমাকে রাখিব। রাধারাণীর মাতা তাহাতে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। পরিশেষে কামাখ্যাবাবু কিছু কিছু মাসিক সাহায্য করিতে চাহিলেন। "আমার এখনও কিছু হাতে আছে—আবশ্যক হইলে চাহিয়া লইব।" এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া রাধারাণীর মাতা সে সাহয্য গ্রহণে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। রুক্মিণী কুমারের দান গ্রহন, তাঁহাদিগের প্রথম ও শেষ দান গ্রহন।

কামাখ্যা বাবু এতদিন বুঝিতে পারেন নাই, যে তাঁহারা এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। দশা দেখিয়া, কামাখ্যা বাবু অত্যন্ত কাতর হইলেন। আবার রাধারাণীর মাতা, যুক্তকরে তাঁহার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছেন, দেখিয়া আরও কাতর হইলেন। বলিলেন,

"আপনি আজ্ঞা করুন, আমি কি করিব? আপনার যাহা প্রয়োজন, আমি তাহাই করিব।"

রাধারাণীর মাতা বলিলেন, "আমি চলিলাম, কিন্তু রাধারাণী রহিল। এক্ষণে আদালত হইতে আমার শ্বশুরের যথার্থ উইল সিদ্ধ হইয়াছে, অতএব রাধারাণী একা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। আপনি তাহাকে দেখিবেন, আপনার কন্যার ন্যায়, তাহাকে রক্ষা করিবেন। এই আমার ভিক্ষা। আপনি এই কথা স্বীকার করিলেই আমি সুখে মরিতে পারি।"

কামাখ্যা বাবু বলিলেন, "আমি আপনার নিকট শপথ করিতেছি, আমি রাধারাণীকে আপন কন্যার অধিক যত্ন করিব। আমি কায়মনোবাক্যে এ কথা কহিলাম, আপনি বিশ্বাস করুন।"

যিনি মুমূর্ষু তিনি, কামাখ্যা বাবুর চক্ষের জল দেখিয়া, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার সেই শীর্ণ শুষ্ক অধরে একটু আহ্লাদের হাসি হাসিলেন। হাসি দেখিয়া কামাখ্যা বাবু বুঝিলেন, ইনি আর বাঁচিবেন না।

কামাখ্যা বাবু তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন, যে এক্ষণে আমার গৃহে চলুন। পরে ভদ্রাসন দখল হইলে আসিবেন। রাধারাণীর মাতার যে অহঙ্কার, সে দারিদ্র্যজনিত—এজন্য দারিদ্র্যাবস্থায় তাঁহার গৃহে যাইতে চাহেন নাই। এক্ষণে আর দারিদ্র্য নাই, সুতরাং আর সে অহঙ্কারও নাই। এক্ষণে তিনি যাইতে সম্মত হইলেন। কামাখ্যা বাবু, রাধারাণী ও তাহার মাতাকে সযত্নে নিজালয়ে লইয়া গেলেন।

তিনি রীতিমত পীড়িতার চিকিৎসা করাইলেন। কিন্তু তাঁহার জীবন রক্ষা হইল না, অল্পদিনেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

উপযুক্ত সময়ে কামাখ্যা বাবু রাধারাণীকে তাঁহার সম্পত্তি দখল দেওয়াইলেন। কিন্তু রাধারাণী বালিকা বলিয়া তাহাকে নিজবাটীতে একা থাকিতে দিলেন না, আপন গৃহেই রাখিলেন। কালেক্টর সাহেব, রাধারাণীর সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে আনিবার জন্য যত্ন পাইলেন, কিন্তু কামাখ্যা বাবু বিবেচনা করিলেন, আমি রাধারাণীর জন্য যতদূর করিব, সরকারি কর্ম্মচারিগণ ততদূর করিবে না। কামাখ্যাবাবুর কৌশলে, কালেক্টর সাহেব নিরস্ত হইলেন। কামাখ্যাবাবু স্বয়ং রাধারাণীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণা করিতে লাগিলেন।

বাঁকি রাধারাণীর বিবাহ। কিন্তু কামাখ্যাবাবু নব্যতন্ত্রের লোক—বাল্যবিবাহে তাঁহার দ্বেষ ছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন, যে রাধারাণীর বিবাহ তাড়াতাড়ি না দিলে, জাতি গেল মনে করে, এমত কেহ তাহার নাই। অতএব যবে রাধারাণী, স্বয়ং বিবেচনা করিয়া বিবাহে ইচ্ছুক হইবে, তবে তাহার বিবাহ দিব। এখন সে লেখাপড়া শিখুক।

এই ভাবিয়া কামাখ্যাবাবু রাধারাণীর

বিবাহের কোন উদ্যোগ না করিয়া, তাহাকে উত্তমরূপে সুশিক্ষিতা করিলেন।

৩

পাঁচ বৎসর গেল—রাধারাণী পরম সুন্দরী ষোড়শবর্ষীয়া কুমারী। কিন্তু সে অন্তঃপুরমধ্যে বাস করে, তাহার সে রূপরাশি কেহ দেখিতে পায় না। এক্ষণে রাধারাণীর সম্বন্ধ করিবার সময় উপস্থিত হইল। কামাখ্যাবাবুর ইচ্ছা, রাধারাণীর মনের কথা বুঝিয়া তাহার সম্বন্ধ করেন। তত্ত্ব জানিবার জন্য আপনার কন্যা, বসন্তকুমারীকে ডাকিলেন।

বসন্তের সঙ্গে, রাধারাণীর সখীত্ব। উভয়ে সমবয়স্কা। এবং উভয়ে অত্যন্ত প্রণয়। কামাখ্যাবাবু বসন্তকে আপনার মনোগত কথা বুঝাইয়া বলিলেন।

বসন্ত,সলজ্জভাবে,অথচ অল্প হাসিতে২ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল,

"রুক্মিণীকুমার রায় কেহ আছে?"

কামাখ্যাবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "না। তা ত জানি না। কেন?"

বসন্ত বলিল, "রাধারাণী রুক্মিণীকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না।"

কামাখ্যা। সেকি? রাধারাণীর সঙ্গে অন্য ব্যক্তির পরিচয় কিপ্রকারে হইল?

বসন্ত অবনতমুখে অল্প হাসিল। সে রথের রাত্রের বিবরণ সবিস্তারে রাধারাণীর কাছে শুনিয়াছিল,পিতার সাক্ষাতে সকল বিবৃত করিল। শুনিয়া কামাখ্যাবাবু রুক্মিণীকুমারের প্রশংসা করিয়া বলিলেন,

"রাধারাণীকে বুঝাইয়া বলিও, রাধারাণী একটি মহা ভ্রমে পড়িয়াছে। বিবাহ কৃতজ্ঞতা অনুসারে কর্ত্তব্য নহে। রুক্মিণী কুমারের নিকট রাধারাণীর কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত; যদি সময় ঘটে, তবে অবশ্য প্রত্যুপকার করিতে হইবে। কিন্তু বিবাহে রুক্মিণীকুমারের কোন দাবি দাওয়া নাই। তাতে আবার সে কি জাতি, কত বয়স তাহা কেহ জানি না। তাহার পরিবার সন্তানাদি থাকিবারই সম্ভাবনা; রুক্মিণীকুমার বিবাহ করিবারই বা সম্ভাবনা কি?"

বসন্ত বলিল, "সম্ভাবনা কিছুই নাই, তাহাও রাধারাণী বিলক্ষণ বুঝিয়াছে। কিন্তু সে সেই রাত্রিঅবধি, রুক্মিণীকুমারের একটি মানসিক প্রতিমা গড়িয়া, আপনার মনে তাহা স্থাপিত করিয়াছে। যেমন দেবতাকে লোকে পূজা করে,রাধারাণী সেই প্রতিমা তেমনি করিয়া,প্রত্যহ মনে২ পূজা করে। এই পাঁচ বৎসর রাধারাণী আমাদিগের বাড়ী আসিয়াছে, এই পাঁচ বৎসরে এমন দিন প্রায় যায় নাই,যে দিন রাধারাণী রুক্মিণীকুমারের কথা আমার সাক্ষাতে একবারও বলে নাই। আর কেহ রাধারাণীকে বিবাহ করিলে,তাহার স্বামী সুখী হইবে না।"

কামাখ্যাবাবু মনে২ বলিলেন,"বাতিক। ইহার একটু চিকিৎসা আবশ্যক। কিন্তু

প্রথম চিকিৎসা বোধ হয়, রুক্মিণীকুমারের সন্ধান করা।"

কামাখ্যাবাবু, রুক্মিণীকুমারের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বয়ং কলিকাতায় তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বন্ধুবর্গকেও সেই সন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। দেশেং আপনার মোয়াক্কেলগণকে পত্র লিখিলেন। প্রতি সম্বাদপত্রেও বিজ্ঞাপন দিলেন। সে বিজ্ঞাপন এইরূপ;—

"বাবু রুক্মিণীকুমার রায়, নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন—বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইহাতে রুক্মিণী বাবুর সন্তোষের ব্যতীত অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হইবে না।

শ্রীইত্যাদি—"

কিন্তু কিছুতেই রুক্মিণীকুমারের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। দিন গেল, মাস গেল, বৎসর গেল, তথাপি কই, রুক্মিণীকুমার ত আসিল না।

ইহার পর, রাধারাণীর আর একটি ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইল—কামাখ্যা বাবুর লোকান্তরগতি হইল। রাধারাণী ইহাতে অত্যন্ত শোকাতুরা হইলেন, দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হইলেন, মনে করিলেন। কামাখ্যা বাবুর শ্রাদ্ধাদির পর, রাধারাণী, আপন বাটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এবং নিজ সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণা স্বয়ং করিতে লাগিলেন। কামাখ্যা বাবুর বিচক্ষণতা হেতু, রাধারাণীর সম্পত্তি বিস্তর বাড়িয়াছিল। বিষয় হস্তে লইয়াই, রাধারাণী প্রথমেই দুই লক্ষ মুদ্রা গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিলেন। তৎসঙ্গে এই প্রার্থনা করিলেন, যে এই অর্থে তাঁহার নিজগ্রামে, একটি অনাথনিবাস স্থাপিত হউক। তাহার নাম হৌক—"রুক্মিণীকুমারের প্রসাদ।"

গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ প্রস্তাবিত নাম শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু তাহাতে কে কথা কহিবে? অনাথনিবাস সংস্থাপিত হইল। রাধারাণীর মাতা দারিদ্র্যাবস্থায় নিজগ্রাম ত্যাগ করিয়া, শ্রীরামপুরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কেন না যে গ্রামে যে ধনী ছিল, সে সহসা দরিদ্র হইলে, সেগ্রামে তাহার বাস করা কষ্টকর হয়। তাঁহাদিগের নিজগ্রাম শ্রীরামপুর হইতে কিঞ্চিৎ দূর—আমরা সে গ্রামকে রাজপুর বলিব। এক্ষণে রাধারাণী রাজপুরেই বাস করিতেন। অনাথনিবাসও রাধারাণীর বাড়ীর সম্মুখে, রাজপুরে সংস্থাপিত হইল। নানা দেশ হইতে দীন দুঃখী অনাথ আসিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল।

৪

দুই এক বৎসর পরে, একজন ভদ্র লোক, সেই অনাথনিবসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর। অবস্থা দেখিয়া, অতি ধীর, গম্ভীর, এবং অর্থশালী লোক বোধ হয়। তিনি সেই "রুক্মিণীকুমারের প্রসাদের"

দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রক্ষকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার বাড়ী?"

তাহারা বলিল, "এ কাহারও বাড়ী নহে। এখানে দুঃখী অনাথ লোক থাকে। ইহাকে "রুক্মিণীকুমারের প্রসাদ বলে।'"

অগন্তুক বলিলেন, "আমি ইহার ভিতরে গিয়া দেখিতে পারি?"

রক্ষকগণ বলিল, "দীন দুঃখীলোকেও ইহার ভিতর অনায়াসে যাইতেছে—আপনাকে নিষেধ কি?"

দর্শক ভিতরে গিয়া সব দেখিয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বলিলেন,

"বন্দবস্ত দেখিয়া, আমাব বড় আহ্লাদ হইয়াছে। কে এই অন্নচ্ছত্র দিয়াছে? রুক্মিণীকুমার কি, তাঁহাব নাম?"

রক্ষকেরা বলিল, "শ্রীমতী রাধারাণী দাসী এই অন্নচ্ছত্র দিয়াছেন।"

দর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে ইহাকে রুক্মিণীকুমারেব প্রসাদ বলে কেন?"

রক্ষকেবা বলিল, "তাহা আমবা কেহ জানি না।"

"রুক্মিণীকুমার কার নাম?"

"কাহারও নয়।"

"যে রাধারাণী দাসীর নাম করিলে, তাঁহার নিবাস কোথায়?"

রক্ষকেরা, সম্মুখে অতি বৃহৎ অট্টালিকা দেখাইয়া দিল।

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "তোমরা বলিতে পার, এই রাধারাণী সধবা না বিধবা?"

উত্তর "সধবাও নন্—বিধবাও নন্—উনি বিবাহ করেন নাই। বড় মানুষের মেয়ে—উঁহার কেহ নাই—কে বিবাহ দিবে?"

প্রশ্ন—"উনি পুরুষ মানুষেব সাক্ষাতে বাহিব হইয়া থাকেন? রাগ করিও না—এখন অনেক বড় মানুষের মেয়ে মেম লোকের মত বাহিরে বাহির হইয়া থাকে, এই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

রক্ষকেবা উত্তর করিল "ইনি সেরূপ চরিত্রের নন। পুরুষের সমক্ষে বাহিব হন না।"

প্রশ্নকর্ত্তা ধীরে২ রাধারাণীর অট্টালিকার অভিমুখে গিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ক্রমশঃ

রাধারাণী।

৫

যিনি আসিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচ্ছদ সচরাচর বাঙ্গালি ভদ্রলোকের মত; বিশেষ পারিপাট্য, অথবা পারিপাট্যের বিশেষ অভাবও কিছু ছিল না. কিন্তু তাঁহার অঙ্গুলিতে একটী হীরকাঙ্গুরীয় ছিল; তাহা দেখিয়া, রাধারাণীর কর্ম্মকারকগণ অবাক্ হইয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল, এত বড় হীরা তাহারা কখন অঙ্গুরীয়ে দেখে নাই। তাঁহার সঙ্গে কেহ লোক ছিল না, এজন্য তাহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না যে, কে ইনি? মনে করিল বাবু স্বয়ং পরিচয় দিবেন, কিন্তু বাবু কোন পরিচয় দিলেন না। তিনি রাধারাণীর দেওয়ানজির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার হস্তে একখানিপত্র দিলেন, বলিলেন,

"এই পত্র আপনার মুনিবের কাছে পাঠাইয়া দিয়া, আমাকে উত্তর আনিয়া দিন।"

দেওয়ানজি বলিলেন, "আমার মুনিব স্ত্রীলোক, অবিবাহিতা, আবার অল্পবয়স্কা। এজন্য তিনি নিয়ম করিয়াছেন,যে কোন অপরিচিত লোকে পত্র আনিলে, আমরা তাহা না পড়িয়া তাঁহার কাছে পাঠাইব না।"

আগন্তুক বলিল, "আপনি পড়ুন।"

দেওয়ানজি পত্র পড়িলেন—

"প্রিয় ভগিনি!

"এব্যক্তি পুরুষ হইলেও ইঁহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিও—ভয় করিও না। যেমত২ ঘটে আমাকে লিখিও।

শ্রীমতী বসন্তকুমারী।"

কামাখ্যা বাবুর কন্যার স্বাক্ষর দেখিয়া, কেহ আর কিছু বলিল না—পত্র অন্তঃপুরে গেল।

অন্তঃপুর হইতে পরিচারিকা, পত্রবাহক বাবুকে লইতে আসিল। আর কেহ সঙ্গে যাইতে পাইল না—হুকুম নাই।

পরিচারিকা, বাবুকে লইয়া এক সুসজ্জিত গৃহে বসাইলেন। রাধারাণীর অন্তঃপুরে সেই প্রথম পুরুষ মানুষ প্রবেশ করিল। দেখিয়া, একজন পরিচারিকা রাধারাণীকে ডাকিতে গেল, আরএকজন অন্তরালে থাকিয়া আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল, যে তাঁহার বর্ণটুকু গৌর—স্ফুটিত মল্লিকারাশির মত গৌর; তাঁহার শরীর দীর্ঘ, এবং ঈষৎ স্থূল; কপাল দীর্ঘ; অতি সূক্ষ্ম পরিষ্কার ঘনকৃষ্ণ সুরঞ্জিত কেশজালে মণ্ডিত; চক্ষু, বৃহৎ, কটাক্ষ স্থির, ভ্রূযুগ, সূক্ষ্ম, ঘন, দূরায়ত, এবং নিবিড়কৃষ্ণ; নাসিকা দীর্ঘ, এবং উন্নত, ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ, ক্ষুদ্র, এবং কোমল; গ্রীবা, দীর্ঘ, অথচ মাংসল; অন্যান্য অঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত, কেবল অঙ্গুলিগুলি দেখা যাইতেছে, সেগুলি

শুভ্র, সুগঠিত, এবং একটি বৃহদাকার হীরকে রঞ্জিত। পরিচারিকা মনেং বাসনা করিল সে যদি কোন পুরুষ কখন আমাদের মুনিব হন, তবে যেন ইনিই হয়েন।

রাধারাণী সেই স্থানে আসিয়া পরিচারিকা বিদায় করিয়া দিলেন। রাধারাণী আসিবামাত্র দর্শকের বোধ হইল যে সেই কক্ষমধ্যে এক অভিনব সূর্য্যোদয় হইল রূপের আলোকে তাঁহার মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

আগন্তুকের উচিত প্রথম কথা কহা—কেন না তিনি পুরুষ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ—কিন্তু তিনি সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রাধারাণী একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,

"আপনি এরূপ গোপনে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ করিয়াছেন কেন? আমি স্ত্রীলোক. কেবল বসন্তের অনুরোধেই আমি ইহা স্বীকার করিয়াছি।"

আগন্তুক বলিল, "আমি আপনার সহিত একপ সাক্ষাতের অভিলাষী হইয়াছি, ঠিক তা নহে।"

রাধারাণী অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "তা নয়, বটে। তবে বসন্ত কি জন্য এরূপ অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা কিছু লেখেন নাই। বোধ হয় আপনি জানেন।"

আগন্তুক,একখানি অতিপুরাতন সম্বাদপত্র বাহির করিয়া তাহা রাধারাণীকে দেখাইলেন। রাধারাণী পড়িলেন; কামাখ্যাবাবুর স্বাক্ষরিত রুক্মিণীকুমারের সেই বিজ্ঞাপন! রাধারাণী, দাঁড়াইয়াছিলেন—দাঁড়াইয়াং নারিকেল পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। আগন্তুকের দেবতুল্য গঠন দেখিয়া, মনে ভাবিলেন, ইনিই আমার সেই রুক্মিণীকুমার। আর থাকিতে পারিলেন না—জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "আপনার নাম কি রুক্মিণীকুমার বাবু!"

আগন্তুক বলিলেন, "না।" "না" শব্দ শুনিয়াই, রাধারাণী, ধীরেং আসন গ্রহণ করিলেন। আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—তাঁহার বুক যেন ভাঙ্গিয়াগেল। আগন্তুক বলিলেন, "না। আমি যদি রুক্মিণীকুমার হইতাম—তাহা হইলে, কামাখ্যা বাবু এ বিজ্ঞাপন দিতেন না। কেন না, তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। কিন্তু যখন এই বিজ্ঞাপন বাহির হয় তখনই আমি ইহা দেখিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।"

রাধারাণী বলিল,"যদি আপনার সঙ্গে এই বিজ্ঞাপনের কোন সম্বন্ধ নাই, তবে আপনি ইহা তুলিয়া রাখিয়াছিলেন কেন?"

উত্তরকারী বলিলেন, "একটি কৌতুকের জন্য। আজি আট দশ বৎসর হইল. আমি যেখানে সেখানে বেড়াইতাম—কিন্তু লোকলজ্জাভয়ে আপনার নামটি গোপন করিয়া কাল্পনিক নাম ব্যবহার করিতাম। কাল্পনিক নামটি

রুক্মিণীকুমার। আপনি অত বিমনা হইতেছেন কেন?"

রাধারাণী একটু স্থির হইলেন—আগন্তুক বলিতে লাগিলেন—"যথার্থ রুক্মিণীকুমার নামধরে, এমন কাহাকেও চিনি না। যদি কেহ আমারই তল্লাস করিয়া থাকে—তাহা সম্ভব নহে—তথাপি কি জানি—সাত পাঁচ ভাবিয়া বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিলাম—কিন্তু কামাখ্যা বাবুর কাছে আসিতে সাহস হইল না।"

"পরে?"

"পরে কামাখ্যা বাবুর শ্রাদ্ধে তাঁহার পুত্রগণ আমাকে নিমন্ত্রণ করিল, কিন্তু আমি কার্য্যগতিকে আসিতে পারি নাই। সম্প্রতি সেই ত্রুটির ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য তাঁহার পুত্রদিগের নিকট আসিয়াছিলাম। কৌতুক বশতঃ বিজ্ঞাপনটি সঙ্গে আনিয়াছিলাম। প্রসঙ্গ ক্রমে উহার কথা উত্থাপন করিয়া কামাখ্যা বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এ বিজ্ঞাপন কেন দেওয়া হইয়াছিল? কামাখ্যা বাবুর পুত্র বলিলেন, যে রাধারাণীর অনুরোধে। আমিও এক রাধারাণীকে চিনিতাম—এক বালিকা—আমি একদিন দেখিয়া তাহাকে আর ভুলিতে পারিলাম না। যে মাতার পথ্যের জন্য, আপনি অনাহারে থাকিয়া বনফুলের মালা গাঁথিয়া—সেই অন্ধকার বৃষ্টিতে—" বক্তা আর কথা কহিতে পারিলেন না—তাঁহার চক্ষু জলে পুরিয়া গেল। রাধারাণীরও চক্ষু জলে ভাসিতে লাগিল। চক্ষু মুছিয়া রাধারাণী বলিল,

"সে পোড়ারমুখীর কথায় এখন প্রয়োজন কি? আপনার কথা বলুন।"

আগন্তুক উত্তর করিলেন, "তাঁহাকে গালি দিবেন না। যদি সংসারে কেহ সোনামুখী থাকে, তবে সেই রাধারাণী। যদি কাহাকে পবিত্র সরলচিত্ত, এ সংসারে আমি দেখিয়া থাকি, তবে সেই রাধারাণী। যদি কাহারও কথায় অমৃত থাকে, তবে সেই রাধারাণী—যথার্থ অমৃত! বর্ণে২ অপ্সরার বিনা বাদ্যে, যেন কথা কহিতে বাধ২ করে, অথচ সকল কথা, পরিষ্কার সুমধুর,—অতি সরল! আমি এমন কণ্ঠ কখন শুনি নাই—এমন কথা কখনও শুনি নাই!"

রুক্মিণীকুমার—এক্ষণে ইঁহাকে রুক্মিণীকুমারই বলা যাউক—ঐ সঙ্গে মনে২ বলিলেন, "আবার আজবুঝি তেমনি কথা শুনিতেছি!"

রুক্মিণীকুমার মনে২ ভাবিতেছিলেন, আজি এতদিন হইল, সেই বালিকার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম কিন্তু আজিও সে কণ্ঠ আমার মনের ভিতর জাগিতেছে। যেন কাল শুনিয়াছি। অথচ আজি এই রাধারাণীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার সেই রাধারাণীকেই বা মনে পড়ে কেন? এই কি সেই? আমি মূর্খ! কোথায় সেই দীনদুঃখিনী কুটীরবাসিনী ভিখারিণী, আর কোথায় এই উচ্চপ্রাসাদবিহারিণী ইন্দ্রাণী! আমি সে রাধারাণীকে অন্ধকারে ভালকরিয়া দেখিতে পাই নাই, সুতরাং জানি না যে সে সুন্দরী কি কুৎসিতা,

কিন্তু এই শচীনিন্দিতা রূপসীর শতাংশের একাংশ রূপও যদি তাহার থাকে, তাহা হইলে সেও লোকমনোমোহিনী বটে!

এ দিকে রাধারাণী, অতৃপ্তশ্রবণে রুক্মিণীকুমারের মধুর বচনগুলি শুনিতেছিলেন—মনে মনে ভাবিতেছিলেন, তুমি যাহা পাপিষ্ঠা রাধারাণীকে বলিতেছ, কেবল তোমাকেই সেই কথাগুলি বলা যায়! তুমি আজ আট বৎসরের পর রাধারাণীকে ছলিবার জন্য কোন্ নন্দনকানন ছাড়িয়া পৃথিবীতে নামিলে? এত দিনে কি আমার হৃদয়ের পূজায় প্রীত হইয়াছ? তুমি কি অন্তর্যামী? নহিলে আমি লুকাইয়া২, হৃদয়ের ভিতরে লুকাইয়া তোমাকে যে পূজা করি, তাহা তুমি কি প্রকারে জানিলে?

এই প্রথম, দুইজনে, স্পষ্ট দিবসালোকে, পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দুইজনে, দুইজনের মুখপানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আর এমন আছে কি? এই সসাগরা নগনদীচিত্রিতা জীবসঙ্কুলা পৃথিবীতলে, এমন তেজোময়, এমন মধুর, এমন সুখময়, এমন চঞ্চল অথচ স্থির, এমন সহাস্য অথচ গম্ভীর, এমন প্রফুল্ল অথচ ব্রীড়াময়, এমন আর আছে কি? চিরপরিচিত অথচ অত্যন্ত অভিনব, মুহূর্ত্তে২ অভিনব মধুবিম্ময়, আত্মীয় অথচ অত্যন্তপর, চিরস্মৃত অথচ অদৃষ্টপূর্ব্ব—কখন দেখি নাই, কখন আর এমন দেখিব না, এমন আর আছে কি?

রাধারাণী বলিল,—বড়কষ্টে বলিতে হইল, কেন না চক্ষের জল থামে না, আবার সেই চক্ষের জলের উপর কোথা হইতে পোড়া হাঁসি আসিয়া পড়ে—রাধারাণী বলিল, "তা, আপনি এতক্ষণ কেবল সেই ভিখারিণীর কথাই বলিলেন, আমাকে যে কেন দর্শন দিয়াছেন, তা ত এখনও বলেন নাই।"

হাঁ গা এমন করিয়া কি কথা কহা যায় গা? যাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে, প্রাণেশ্বর! দুঃখিনীর সর্ব্বস্ব! চিরবাঞ্ছিত! বলিয়া যাহাকে ডাকিতে ইচ্ছা করিতেছে; আবার যাকে সেই সঙ্গে "হাঁ গা সেই রাধারাণী পোড়ারমুখী তোমার কে হয় গা" বলিয়া তামাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে—তার সঙ্গে আপনি মশাই, দর্শন দিয়াছেন, এই সকল কথা নিয়ে কি কথা কহা যায় গা? তোমরা পাঁচজন, রসিকা, প্রেমিকা, বাক্‌চতুরা, বয়োধিকা, ইত্যাদি ইত্যাদি আছ, তোমরা পাঁচজনে বল দেখি, ছেলেমানুষ রাধারাণী কেমন করে্য এমন করে্য কথা কয় গা?

রাধারাণী মনে২ একটু পরিতাপ করিল, কেন না কথাটা একটু ভর্ৎসনার মত হইল। রুক্মিণীকুমার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,

"তাই বলিতেছিলাম। আমি সেই রাধারাণীকে চিনিতাম—রাধারাণীকে মনে পড়িল, একটু—এতটুকু—অন্ধকার রাত্রে জোনাকির ন্যায়—একটু আশা

হইল, যে যদি এই রাধারাণী আমার সেই রাধারাণী হয়!”

“তোমার রাধারাণী!” রাধারাণী ছল ধরিয়া হাসিল।

হাঁ গা, না হেসে কি থাকা যায় গা? তোমরা আমার রাধারাণীর নিন্দা করিও না।

রুক্মিণীকুমারও মনে ছল ধরিল—“তুমি হইয়াছি—আপনি নই।” প্রকাশ্যে বলিল, “আমারই রাধারাণী। আমি একরাত্রি মাত্র তাহাকে দেখিয়া—দেখিয়াছিই বা কেমন করিয়া বলি—এই আট বৎসরেও তাহাকে ভুলি নাই। আমারই রাধারাণী।”

রাধারাণী বলিল, “হৌক, আপনারই রাধারাণী।”

রুক্মিণী বলিতে লাগিলেন, “সেই ক্ষুদ্র আশায় আমি কামাখ্যাবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধারাণী কে? কামাখ্যা বাবুর পুত্র সবিস্তারে পরিচয় দিতে বোধ হয় অনিচ্ছুক ছিলেন, কেবল বলিলেন, ‘আমাদিগের কোন আত্মীয়ার কন্যা।’ যেখানে তাঁহাকে অনিচ্ছুক দেখিলাম, সেখানে আর অধিক পীড়াপীড়ি করিলাম না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধারাণী কেন রুক্মিণীকুমারের সন্ধান করিয়াছিলেন শুনিতে পাই কি? যদি প্রয়োজন হয়, ত বোধ করি, আমি কিছু সন্ধান দিতে পারি। আমি এই কথা বলিলে, তিনি বলিলেন, ‘কেন রাধারাণী রুক্মিণীকুমারকে খুঁজিয়াছিলেন, তাহা আমি সবিশেষ জানি না; আমার পিতৃঠাকুর জানিতেন; বোধ করি আমার ভগিনীও জানিতে পাবেন। যেখানে আপনি সন্ধান দিতে পারেন বলিতেছেন, সেখানে আমার ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে হইতেছে।’ এই বলিয়া তিনি উঠিলেন। প্রত্যাগমন করিয়া তিনি আমাকে যে পত্র দিলেন, সে পত্র আপনাকে দিয়াছি। তিনি আমাকে সেই পত্র দিয়া বলিলেন, আমার ভগিনী সবিশেষ কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিলেন না, কেবল এই পত্র দিলেন, আর বলিলেন, যে ‘এই পত্র লইয়া তাঁহাকে স্বয়ং রাধারাণীর কাছে যাইতে বলুন। স্বয়ং রাধারাণী সন্ধান দিবেন ও লইবেন।’ আমি সেই পত্র লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। কোন অপরাধ করিয়াছি কি?”

রাধারাণী বলিল, “করিয়াছেন। তাহা পশ্চাৎ বলিব কি? এক্ষণে ইহাই বলি, যে আপনি মহাভ্রমে পতিত হইয়াই এখানে আসিয়াছেন। আপনার রাধারাণী কে তাহা আমি চিনি না। সে রাধারাণীর কথা কি, শুনিলে বলিতে পারি আমা হইতে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে কি না?”

রুক্মিণী সেই রথের কথা সবিস্তারে বলিলেন কেবল নিজদত্ত অর্থ বস্ত্রের কথা কিছু বলিলেন না। রাধারাণী বলিলেন, .

"এই জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, যে যদি আপনি কোন অপরাধ করিয়া থাকেন, তাহা সাহস করিয়া বলিব কি? আপনাকে কোন কথা বলিতে সাহস হয় না, কেন না আপনাকে দয়ালু লোক বোধ হইতেছে না। যদি আপনি সেরূপ দয়ার্দ্রচিত্ত হইতেন, তাহাহইলে, আপনি যে ভিখারী বালিকার কথা বলিলেন, তাহাকে অমন দুর্দ্দশাপন্না দেখিয়া অবশ্য তাহার কিছু আনুকূল্য করিতেন। কই, আনুকূল্য করার কথা ত কিছু আপনি বলিলেন না?"

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, "আনুকূল্য বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই। আমি সেদিন নৌকাপন্থে রথ দেখিতে আসিয়াছিলাম—পাছে কেহ জানিতে পাবে, এই জন্য ছদ্মবেশে রুক্মিণীকুমার রায় পরিচয়ে লুকাইয়া আসিয়াছিলাম—অপরাহ্ণে ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় বোটে থাকিতে সাহস না করিয়া একা তটে উঠিয়া আসিয়াছিলাম। সঙ্গে যাহা অল্পছিল, তাহা রাধারাণীকেই দিয়াছিলাম। কিন্তু সে অতি সামান্য। পরদিন প্রাতে আসিয়া উহাদিগের বিশেষ সংবাদ লইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই রাত্রে আমার পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তখনই আমাকে কাশী যাইতে হইল। পিতা অনেক দিন রুগ্ন হইয়া রহিলেন, কাশী হইতে প্রত্যাগমন করিতে আমার বৎসরাধিক বিলম্ব হইল। বৎসর পরে আমি ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই কুটীরের সন্ধান করিলাম—কিন্তু তাহাদিগকে আর সেখানে দেখিলাম না।"

রা। "আপনি রাধারাণীকে যেরূপ ভাল বাসেন দেখিতেছি, তাহার কারণ জানিবার জন্য আমার বড় ব্যস্ততা হইতেছে। স্ত্রীলোকে অমন ব্যস্ত হইয়াই থাকে। তাই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে। বোধ হয় সে রথের দিন নিরাশ্রয়ে, বৃষ্টি বাদলে, আপনাকে সেই কুটীরেই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। আপনি কতক্ষণ সেখানে অবস্থিতি করিলেন?

রু। অধিকক্ষণ নহে। আমি যাহা রাধারাণীর হাতে দিয়াছিলাম, তাহা দেখিবার জন্য, রাধারাণী আলো জ্বালিতে গেল—আমি সেই অবসরে, তাহার বস্ত্র কিনিতে চলিয়া আসিলাম।

রাধা। আর কি দিয়া আসিলেন?

রু। আর কি দিব? একখানা ক্ষুদ্র-নোট ছিল, তাহা কুটীরে রাখিয়া আসিলাম।

রাধা। আমার অতি সামান্য একটা প্রয়োজন আছে। আসিতেছি। একটু অপেক্ষা করুন।

সেই নোটখানি রাধারাণী অদ্যাপি যত্নে রাখিয়াছিল—তাহা বাহির করিয়া আনিল। আসিয়া বলিল,

"নোটখানি ওরূপে দেওয়া বিবেচনাসিদ্ধ হয় নাই—তাহারা মনে করিতে পারে, আপনি নোটখানি হারাইয়া গিয়াছেন।"

রু। না, আমি পেন্‌সিলে লিখিয়া দিয়াছিলাম, "রাধারাণীর জন্য।" তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলাম; "রুক্মিণীকুমার রায়।" যদি সেই রুক্মিণীকুমারকে সেই রাধারাণী অন্বেষণ করিয়া থাকে, এই ভরসায় বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।

রাধা। তাই বলিতেছিলাম, আপনি গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন। যে আপনার শ্রীচরণ দর্শন জন্য এত কাতরা তাহাকে এত দিন দেখা দেন নাই কেন? সেই রাধারাণী সেই রুক্মিণীকুমারের সন্ধান করিতেছিল কিনা, এই দেখুন।

এই বলিয়া রাধারাণী সেই নোটখানি রুক্মিণীকুমারের হাতে দিয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণতা হইয়া বলিলেন, "প্রভু, সে দিন তুমি আমাদিগের জীবনদান করিয়াছিলে। এ পৃথিবীতে তুমি আমার দেবতা।"

৬

রাধারাণী যুক্তকরে বলিলেন, "আপনি বলিয়াছেন, আপনার যথার্থ নাম রুক্মিণীকুমার নহে। আমি যাঁহাকে আরাধ্য দেবতা মনে করি, তাঁহার নাম জানিতে বড় ইচ্ছা করে।"

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, "আমার নাম দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়।"

রাধা। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের নাম শুনিয়াছি।

রু। লোকে অমন সকলকেই রাজা বলে। কুমার দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় বলিলেই আমার যথেষ্ট সম্মান হয়।

রাধা। এক্ষণে আমার সাহস বাড়িল; আপনি আমার স্বজাতীয় জানিয়া, স্পর্দ্ধা হইতেছে যে, আপনাকে আজি আমার আতিথ্য স্বীকার করিতে বলি।

রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "আমি না ভোজন করিয়া তোমার বাড়ী হইতে যাইব না।"

রাধারাণীর আজ্ঞা পাইয়া, দেওয়ানজি আসিয়া রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণকে বহির্বাটীতে লইয়া গিয়া যথেষ্ট সমাদর করিলেন। যথাসময়ে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ ভোজন করিলেন। রাধারাণী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে রাধারাণী বলিলেন,

"বহুদিন হইতে আমার প্রত্যাশা ছিল যে একদিন না একদিন আপনার দর্শন লাভ করিয়া আপনার পূজা করিব। কিছু পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। এই হারছড়াটি অতি সামান্য, কিন্তু আমি দিয়াছি বলিয়া রাণীজি যদি ব্যবহার করেন, তবে আমি কৃতার্থ হই।" এই বলিয়া, রাধারাণী এক মহামূল্য বহুশত বৃহদাকার হীরকখণ্ডখচিত, গ্রন্থিত নক্ষত্রমালা তুল্য প্রভাশালী, হার বাহির করিলেন। দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন

"রাণীজি? রাণীজি কেহ নাই। দশবৎসর হইল আমার পরিবার গত হইয়াছেন। আর আমি বিবাহ করি নাই।"

রাধারাণীর মাথা ঘুরিয়াগেল। বহুকষ্টে,

মন স্থির রাখিয়া—মন ঠিক স্থির রহিল, কথা শুনিয়া এমনও বোধ হয় না—রাধারাণী বলিল,

"যাহা আপনার জন্য গড়াইয়াছি, তাহা আপনাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। অনুমতি করেন ত ও হার আপনাকেই পরাইয়া দিই।"

এই বলিয়া রাধারাণী হাসিতে২ সেই নক্ষত্রমালা তুল্য হার দেবেন্দ্রনারায়ণের গলায় পরাইয়াদিল। দেবেন্দ্রনারায়ণ আপনাকে এইরূপ সজ্জিত দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন,

"এহার আমারই হইল?"

রাধা। যদি গ্রহণ করেন।

দে। গ্রহণ করিলাম। এখন আমার বস্তু আমি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিতে পারি?

রা। যাহা আপনার যোগ্য নহে, তাহা অন্যকে দান করাই রাজাদিগের রীতি।

দে। এ হার আমার যোগ্য নহে—অথবা আমি ইহার যোগ্য নহি। তুমিই ইহার যোগ্য—তোমাকেই এ হার দান করিলাম।

এই বলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণ সেই হার, রাধারাণীর গলায় পরাইয়া দিলেন।

রাধারাণী অসন্তুষ্ট হইল না। মুখনত করিয়া, মৃদু২ হাসিতে লাগিল; এক২ বার মুখ তুলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের মুখপানে চাহিতে লাগিল। দেবেন্দ্রনারায়ণ বুঝিলেন। বলিলেন,

"আমি ওহার লইব না, তাই তোমায় দিলাম। আমায় অন্য একছড়া দাও?"

রাধা। কোন্‌ছড়া?

দেবেন্দ্র বলিলেন, "তোমার গলায় যে ছড়া আগে হইতে আছে।"

রাধারাণী পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, "চিত্রে, ওখানে আছিস কি?"

চিত্রা, অন্তরাল হইতে দেখিতেছিল। বলিল, "আছি।"

রাধারাণী বলিলেন, "তোর শাঁকটা কোথা?"

চিত্রা বলিল, "এইখানে আছে।"

রাধা। তবে বাজা।

এই বলিয়া রাধারাণী, আপনার নিজের হার, গলা হইতে খুলিয়া, দেবেন্দ্রনারায়ণকে পরাইয়া দিলেন।

চিত্রা, উচ্চরবে শাঁক বাজাইল।

তারপর রীতিমত বিবাহ হইল কি? হইল বৈকি। বসন্ত আসিল, তাহার ভাইয়েরা আসিল, রাজা দেবেন্দ্রের কত লোক আসিল—কিন্তু অত কথা আর তোমাদের শুনে কাজ নাই।

সমাপ্ত।

চৈতন্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিদ্যা বিলাস

এক্ষণে চৈতন্য নবযৌবনে* পদার্পণ করিলেন। শরীরের সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকসিত-প্রায় হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। মনের বৃত্তি সমুদয় প্রস্ফুটিত হইয়া সতেজ হইল। নবীন উৎসাহ ও বলে মন বলশালী হইল। কল্পনা ভবিষ্যৎ জীবনের মধুময় চিত্র গঠন করিয়া নানাবর্ণে বিভূষিত করিল। আশা ভরসা ভাবী খ্যাতি প্রতিপত্তির দিকে প্রধাবিত হইল। চৈতন্য একান্ত হৃদয়ে যত্ন ও একাগ্রতাসহ বিদ্যোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। এবং শীঘ্রই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীর মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধিতে সর্ব্বোচ্চস্থানে অভিষিক্ত হইলেন।

হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌর সুন্দর।
রাত্রিদিন বিদ্যাভ্যাস নাহি অবসর॥
উষাকালে সন্ধ্যা করি ত্রিদশের নাথ।
পড়িতে চলেন সর্ব্বশিষ্য করি সাথ॥
আসিয়া বৈসেন গঙ্গাদাসের সভায়।
পক্ষ প্রতিপক্ষ প্রভু করেন সদায়॥

* * * *

প্রভু বলে ইথে আছে কোন বড় জন।
আসিয়া খণ্ডুক দেখি আমার স্থাপন॥
অহঙ্কার করি লোক ভালে মূর্খ হয়।
যেবা জানে তার ঠাঁই পুথি না চিন্তায়॥

মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি চতুষ্পাঠীর অন্যান্য শিষ্যগণ চৈতন্যের ব্যাকরণের শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইল। এবং যদিও চৈতন্য সমপাঠী ছিলেন, তথাপি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

চিন্তিলে ইহার স্থানে কিছু লজ্জা নাই।
এমত সুবুদ্ধি সর্ব্ব নবদ্বীপে নাই॥
চৈতন্যভাগবতে মুরারি গুপ্তের উক্তি।

সমপাঠীদিগের প্রশংসাবাদে চৈতন্যের কর্ণ বধির হইল এবং অহঙ্কারে মস্তিষ্ক ঘুরিয়া গেল। চৈতন্য ইঁহাদিগের কতিপয়কে লইয়া মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে চতুষ্পাঠী স্থাপিত করিলেন। এই নবীন চতুষ্পাঠীতে নবদ্বীপবাসী আরও অনেকে আসিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিল।

চৈতন্য কিরূপে সমপাঠীদিগের উপর এতাদৃশ প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ মাত্র। সুতরাং বোধ হয় ব্যাকরণ ব্যতীত কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায় প্রভৃতি কোন শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন না। চৈতন্য ভাগবত † ও চৈতন্য চরিতা-

* শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর বেশ মদন মোহন।
ষোড়শ বৎসর প্রভু প্রথম যৌবন॥
চৈতন্য ভাগবত ৬২ পৃ।

† চৈতন্যের প্রতি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের উপদেশ। "তোমার পিতা পিতামহ সকলেই পণ্ডিত ছিলেন তুমিও বিদ্যোপার্জ্জন কর।"

মৃতের‡ কোনকোন স্থলে ইহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে।

মনুষ্য যাহা সর্ব্বদা দেখে, প্রায় তাহাতে আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু কোন অভূতপূর্ব্ব ঘটনা দেখিলে, তাহা ভাল হউক আর মন্দ হউক, তাহাতে আকৃষ্ট হয়। বিদ্যাবত্তা সচরাচর দেখা যায়, কিন্তু অসামান্য বুদ্ধিমত্তা সেরূপ নহে। চৈতন্য একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য ও মানসিক বৃত্তি সাধারণ লোকের অপেক্ষা অশেষ গুণে অধিক। চৈতন্য জন্ম হইতে মহাপুরুষ।† আবার বাল্যকাল হইতে মনোবৃত্তির বিচালন হওয়ায় তাঁহার স্বাভাবিক তেজস্বিতা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল, সুতরাং এই অলোকসামান্য প্রতিভার তেজে তাঁহাদের মন যে বিমোহিত ও ইতি-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আডাম স্মিথ* বলেন অসাধারণ গুণ অথবা বিভবসম্পন্ন লোক দেখিলে আমরা হতজ্ঞান হইয়া, অনন্যোদ্দেশে তাঁহার নিকট নতশির হই। ইহা মনুষ্যের নৈসর্গিক, ধর্ম্ম এই জন্যই পৃথিবীতে ধর্ম্মসংস্কারক প্রভৃতি মহাপুরুষগণ একজীবনে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বস্তুতঃ যে জন্য কার্লাইল মহম্মদের ভক্ত, মিস কব পার্কারের ভক্ত উনবিংশ শতাব্দীর দর্শনসমাজ কোম্‌তের ভক্ত, সেইকারণে চৈতন্যের সমপাঠীসম্প্রদায়ও তাঁহার ভক্ত ও তাঁহার অপূর্ণতাতে অন্ধ।

চতুষ্পাঠী সংস্থাপন হইলে চৈতন্য একমাত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে কালযাপন করিতে লাগিলেন, অনন্যমনা হইয়া একমাত্র বিদ্যাপরায়ণ হইলেন। দিনে দিনে নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি বিস্তার হইতে লাগিল। এই সময়ে চৈতন্য জ্ঞানোপার্জ্জনই জীবনের মুখ্য কার্য্য ভাবিয়াছিলেন এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর সভাজয়, দিগ্বিজয় প্রভৃতি, কল্পনাদ্বারা মানসপটে চিত্রিত করিয়া তাহারই মাধুর্য্যে বিমোহিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণ, জগন্নাথ মিশ্রের বংশে ভক্তি-বিরহিত পণ্ডিতের জন্মপরিগ্রহ দেখিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলেন।

দেখি বিশ্বম্ভর রূপ সকল বৈষ্ণব।
হরিষ বিষাদমনে ভাবে নিরন্তর॥
হেন দিব্য শরীরে না হয় কৃষ্ণরস।
কি করিবে বিদ্যায় করিলে কাল বশ॥

‡ দিগ্বিজয়ীর সহিত চৈতন্যের কথোপকথনে চৈতন্য স্বয়ং অনভিজ্ঞতা স্বীকার করেন। কিন্তু স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রাখর্য্যে দিগ্বিজয়ীকে পরাভব করেন।

† জন্মকালে মানসিক ক্ষমতার তারতম্য থাকে। কার্লাইল প্রভৃতি ইউরোপীয় অনেক প্রথম শ্রেণীর চিন্তাশীলব্যক্তি এবিষয় স্বীকার করেন। অস্মদ্দেশীয় ভাগবত প্রভৃতি অনেক গ্রন্থেরও এই মত। বস্তুতঃ সংসারে একটু দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা মানসিক ক্ষমতার নৈসর্গিক তারতম্য দেখিতে পাই।

* *Theory of Moral Sentiments.*

চৈতন্যের মনে কি এপর্য্যন্ত ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত হয় নাই ? বৈষ্ণবগ্রন্থকারেরা "হেন দিব্য শরীরে না হয় কৃষ্ণরস" এই চরণ দ্বারা স্পষ্টতঃ হয় নাই বলিয়াছেন। কিন্তু স্থানান্তরে "পাষণ্ডী দেখয়ে যেন যমের সমান" এই চরণ দ্বারা চৈতন্যের তাৎকালিক ধর্ম্মের প্রতি আস্থা স্বীকার করিয়াছেন। আমরা শেষমতেরই পক্ষপাতী, এবিষয় উত্তরোত্তর এই প্রস্তাবে বর্ণিত হইবে। তবে এই মাত্র বোধ হয় বাল্যস্বভাব চৈতন্যের পরিণতবয়স্ক বৈষ্ণবদিগের সহিত বিশেষ আনুগত্য ছিল না, বিশেষতঃ বিদ্যাবিষয়ে তাঁহার সমধিক সহানুভূতি ছিল এতাবৎ ধর্ম্মের উপর একান্তহৃদয়ে যত্ন ও আস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন না।

একদা একজন দিগ্বিজয়ী বহু দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী জয় করিয়া নবদ্বীপ আগমন করিলেন। চৈতন্য এতাবৎ শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন এব্যক্তি নিতান্ত সাংসারিক জ্ঞানশূন্য অন্যথা দিগ্বিজয় করিতে নবদ্বীপ আসিবে কেন। নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতগণ এক্ষণে ইহাকে পরাস্ত করিয়া সর্ব্বস্বাপহরণ* করিবে। চৈতন্য এই চিন্তায় নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। এবং একদা সশিষ্যে গঙ্গাতীরে বসিয়া শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছেন, এমন সময়ে দিগ্বিজয়ী তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রভু তাঁহার নাম ও বিদ্যাবত্তা পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছিলেন। সুতরাং দর্শনমাত্র সাদর সম্ভাষণে বসিতে অনুরোধ করিলেন। ক্ষণেক পরে চৈতন্য দিগ্বিজয়ীকে গঙ্গার একটী স্তব পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। দিগ্বিজয়ী গঙ্গার স্তব† পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, চৈতন্য তাঁহার ব্যাখ্যার দোষারোপ করিলেন। দিগ্বিজয়ী চৈতন্যের আপত্তির যাথার্থ্যানুভব করিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। এইরূপে যত প্রস্তাব উপস্থিত হইল দিগ্বিজয়ী চৈতন্যের নিকট পরাভূত হইয়া হতবুদ্ধি হইলেন। চৈতন্যের শিষ্যগণ হাসিতে উদ্যত হইলে, চৈতন্য ইঙ্গিতে নিবারণ করিলেন। কোমলহৃদয় চৈতন্য দিগ্বিজয়ীকে মনঃক্ষুণ্ণ দেখিয়া যারপর নাই অনুতপ্ত হইলেন এবং নানারূপ সৌজন্য প্রকাশ করিয়া কথঞ্চিৎ প্রফুল্লচিত্ত করিলেন। দিগ্বিজয়ীকে জয় করিয়া চৈতন্য নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজে বিখ্যাত হইলেন। অনেক পণ্ডিত তাঁহার সহিত তর্কবিতর্ক করিতে আসিয়া পরাভূত হইলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ বলেন চৈতন্য সকল পণ্ডিতকে জয় করিলেন। আমরা এ বাক্যে বিশ্বাস করি না, যে হেতু তাঁহার দর্শনশাস্ত্রে অধিকার রঘুনাথ শিরোমণির তুল্য ও স্মৃতিশাস্ত্রে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের তুল্য থাকার কোনই নিদর্শন পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে তিনি যেরূপ ধর্ম্মবিষয়ে একাধিপত্য করিয়াছেন উপ

* পূর্ব্বকালে দিগ্বিজয়িগণ প্রতিশ্রুত হইত পরাভূত হইলে সর্ব্বস্ব দিব।

† চৈতন্যচরিতামৃত ১ম খণ্ড।
চৈতন্য মঙ্গল।

রোক্ত মহাপুরুষদ্বয়ও দর্শন ও স্মৃতিতে তদ্রূপ করিয়াছিলেন।

চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে, দিগ্বিজয়ী পরাভূত হইয়া একদিন নিশিযোগে স্বপ্ন দেখিলেন, বাগ্‌দেবী তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতেছেন "তুমি যাহার নিকট পরাজিত হইয়াছ সে মনুষ্য নহে, অখিলনাথ। বিপ্রবর শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া চৈতন্যের নিকট আসিয়া গলবস্ত্রে নানারূপ স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। একথা সত্য হউক বা নাহউক দিগ্বিজয়ী "গৌড়, তিরহুত, দিল্লী, কাশী, গুজরাট, লাহোর, কাঞ্চিপুরী হেলঙ্গ, তৈলঙ্গ, উড্র প্রভৃতি দেশের পণ্ডিতসমাজ জয় করিয়া যে একজন বালকের নিকট পরাভূত হইলেন, তাহাকে অলোকসামান্য জ্ঞান করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? চৈতন্য দিগ্বিজয়ীকে বলিলেন বৃথা বিদ্যাবলে মোক্ষ হইবে না, তুমি যাবজ্জীবন কৃষ্ণের চরণ সেবা কর।

যাবত মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবত সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয়॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ পাদপদ্মে যদি মনোবৃত্তি রয়॥

চতুর্থ অধ্যায়।

ধর্ম্মভাবের অঙ্কুর

বালকের কোমল মন আর্দ্র মৃত্তিকাবৎ, যেরূপ ইচ্ছা গঠিত হইতে পারে। যাহা দেখে তাহারই অনুকরণ করে—ভাব সংসর্গগুণে তাহারই হৃদয়ে বিদ্ধ হয়। বহুদর্শন নাই। জ্ঞান ও চিন্তার বিষয় অতি অল্প। পক্ষান্তরে মন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। বহুবিষয়াভাবে এক বিষয় লইয়াও সর্ব্বদা আন্দোলিত হয়। বালকের বুদ্ধিবৃত্তি নৈসর্গিক অবস্থায় অবস্থিত, পরিমার্জ্জিত নহে। বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত না হইলে, প্রায় কার্য্য করিতে পারে না। সংসারে কে না দেখিয়াছেন মার্জ্জিতবুদ্ধির লোক ব্যতীত অন্যে বুদ্ধিবৃত্তি বিশেষ পরিচালন করে না, কিন্তু কল্পনা সেই অভাব পূরণ করে। এই জন্যই অপরিণতবয়স্ক বালক কল্পনাপরায়ণ। ভাব সংসর্গগুণে যাহা মনোমধ্যে বিদ্ধ হয় কল্পনা তাহা লইয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করে। নানারূপ চিত্র বিচিত্র প্রতিমা নির্ম্মাণ করে। কতবার নির্জ্জন প্রান্তরের হরিৎবর্ণ শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে, নিদাঘসন্তপ্ত শরীরে সায়ংকালীন সমীরণ সেবন করিতে করিতে, কল্পনা তাহাতে কত সুখের চিত্র আঁকে। কতবার নদীতটে উপবিষ্ট হইয়া নদীর মধুমাখা সঙ্গীত রব শ্রবণ করিতে করিতে কল্পনা তাহাতে কত দূরাগত সুখরব শুনিতে পায়। কত বার গভীর রজনীতে নিদ্রিত হইলে, কল্পনা কত মনোহর চিত্র দেখিতে পায়। কালে যুবক এই বিষয়ে একেবারে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া উন্মত্তবৎ হইয়া উঠেন। নিষ্ঠুর বিরুদ্ধাভিজ্ঞান ইহার অলীকতা

প্রত্যক্ষ প্রমাণ না করিয়া দিলে, কদাপি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। যখন সেই কল্পনা পারলৌকিক সুখ সহ যুক্ত হয়, তখন মনুষ্য কদাপি তদনুসরণ জীবদ্দশাতে ত্যাগ করিতে পারে না, যেহেতু তাহার সত্য মিথ্যা এজীবনে প্রত্যক্ষ হয় না। এই জন্যই ধর্ম্মানুসরণকারীদিগের ন্যায় অন্য পথাবলম্বী তাদৃশ বদ্ধপরিকর হয় না। কলম্বস প্রথম যাত্রায় হয়ত পশ্চিম প্রদেশে বৃহৎ দ্বীপ আবিষ্কারের ভাব ত্যাগ করিতে পারিতেন কিন্তু মার্টিন লুথর জীবন থাকিতে পোপের বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ করিতে পারিতেন না। চৈতন্যের কল্পনা ধর্ম্মসহ যুক্ত হওয়ায় অবিকল ইহাই ঘটিয়াছিল। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বক্ল † বলেন "আমার কার্য্যের জন্য আমা অপেক্ষা আমি যে সমাজে বাস করি সেই সমাজ অধিক পরিমাণে দায়ী।" বস্তুতঃ যে জন্য ইংলণ্ডীয়গণ স্বাধীনতাপ্রিয়, বারাঙ্গণাত্মজা অলীক হাস্য কৌতুক প্রিয় সর্ব্বদেশীয় কামিনীবৃন্দ বস্ত্রালঙ্কার প্রিয়, কামরূপবাসী শক্তিভক্ত, সেইজন্যই যেমন মিলের তনয় জন্ মিল দর্শনাসক্ত এবং জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের তনয় বিশ্বরূপের কনিষ্ঠ পরম বিষ্ণুভক্ত ও সংসারে গতরাগ। শৈশবে পিতার ও সহোদরের ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া চৈতন্য অবশ্যই মনে করিয়াছিলেন, ধর্ম্মই মনুষ্য জীবনের সার, ইহলোকের অকিঞ্চিৎকর ভোগ সুখাপেক্ষা অশেষগুণে প্রার্থনীয়। ধর্ম্মজনিত সুখ নিত্য আর বিলাসসুখ অনিত্য। বিশেষতঃ যখন দেখিলেন ধর্ম্মের জন্য জ্যেষ্ঠ ইহলোকের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জনক জননী ত্যাগ করিয়া, সংসারের বিলাসবাসনা ভোগ ত্যাগ করিয়া, সংসারের খ্যাতি প্রতিপত্তির অভিলাষ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস করিয়াছেন, তখন তাঁহার মন ধর্ম্ম চিন্তায় অবশ্যই বিচলিত হইয়াছিল। যদিও জনক জননীর অপত্য বিরহ জনিত অসহ্য যন্ত্রণা দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন এবং তাহার কারণ ধর্ম্মের উপর কথঞ্চিৎ গতরাগ হইয়াছিলেন, তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে অগ্রজের সন্যাস তাঁহার মনে সংসারের ভোগবাসনা সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত করিবার বীজ বপন করিয়াছিল। তবে তাহা দীর্ঘ কালে অঙ্কুরিত হইয়া পুষ্ট হয়।

চৈতন্য পিতা মাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন "আমি চিরদিন আপনাদিগের নিকট থাকিয়া চরণ সেবা করিব।"

এই সকল ঘটনা বশতঃ চৈতন্য বাল্যকাল হইতেই ক্রমশঃ ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া আসিতেছিলেন। কেবল প্রথম যৌবনে জ্ঞানচর্চ্চায় মনোভিনিবেশ করিয়া তৎপ্রতি অযথা আসক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহার বয়স ১৬। ১৭ বৎসর মাত্র। এই সময়ে একদিন শিষ্যবর্গ সঙ্গে করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন এমন সময়ে পথে শ্রীবাস পণ্ডি-

† Buckle's History of Civilisation, Vol. I.

তের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীবাস তাঁহাকে বৈষ্ণববিদ্বেষী বলিয়া জানিতেন; তাঁহার মুখদর্শন পাপ বিবেচনা করিয়া সহসা অন্যদিকে গমন করিলেন। চৈতন্য শিষ্যদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শিষ্যগণ বলিল "শ্রীবাস কার্য্যান্তরে ঐ পথে গিয়াছে।" চৈতন্য বলিলেন "তাহা নহে আমাকে পাষণ্ড বিবেচনা করিয়া শ্রীবাস আমার মুখ দর্শন করিবে না, এজন্য অন্য পথে গেল।"

এই ঘটনা চৈতন্যকে প্রথমতঃ ধর্ম্মের দিকে লইয়া যায়। বস্তুতঃ একটী ঘটনা বা একটী উপদেশ সময়ে মনুষ্যের মনে যুগান্তর উপস্থিত করে। সময়ে একটী সামান্য ঘটনা দেখিয়া যেমন কোন বিষয় মনে বিদ্ধ হয় সহস্র গ্রন্থ অধ্যয়ন অথবা সহস্র উপদেশ শ্রবণ করিলে তাহা হয় না। ঘোর অবিশ্বাসী নাস্তিকও হঠাৎ কোন বিপদে পতিত হইয়া অথবা প্রিয়জন হারাইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে। চৈতন্যের জীবনেও শ্রীবাসের এই আচরণ এইরূপ ফলোৎপাদন করিয়াছিল। চৈতন্য তখনই হৃদয়ের সহিত বলিলেন।—

এমন বৈষ্ণব মুই হইমু সংসারে।
অজ ভব আসিবেক আমার দুয়ারে ॥
শুন ভাই সব এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইব মুই সর্ব্ব বিলক্ষণ ॥
আমারে দেখিয়া যে যে সকলে পলায়।
তাহারাও যেন মোর গুণ কীর্ত্তি গায় ॥

এই সময়ে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে বৈষ্ণবগণ নাম সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পাষণ্ডেরা তাঁহাদিগকে যারপর নাই উপহাস করিতে আরম্ভ করিল। বৈষ্ণবগণ মহাদুঃখিত হইয়া অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট সমুদয় বর্ণন করিলেন। অদ্বৈত বলিলেন শীঘ্রই আমাদিগের দল পুষ্ট হইয়া দুঃখনিবৃত্তি হইবে। ইহার কিছুদিন পরে, ঈশ্বরপুরী নামক জনৈক মহাপণ্ডিত ও ভাগবত শান্তিপুরে অদ্বৈতের আলয়ে আগমন করিলেন। বৈষ্ণবগণ ঈশ্বরপুরীকে দেখিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। ঈশ্বরপুরী কিয়দ্দিবস শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া নবদ্বীপ গমন করিলেন এবং তথায় গোপীনাথ আচার্য্যের আলয়ে অবস্থান করিলেন। চৈতন্যদেব ঈশ্বরপুরীর সহিত আনুগত্য করিয়া প্রতিদিন ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরপুরী চৈতন্যের অসাধারণ রূপলাবণ্য, অসামান্য প্রতিভা ও আন্তরিক ঈশ্বরনিষ্ঠা দেখিয়া যারপর নাই প্রীত হইলেন।

একদা ভারতী মহাশয় কৃষ্ণের চরিত সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া চৈতন্যকে দোষগুণ জিজ্ঞাসা করিলেন। চৈতন্য বলিলেন "ভক্ত যাহা বলে ভগবান্ তাহাতেই সন্তুষ্ট অতএব গ্রন্থের দোষগুণ বলা নিরর্থক।"

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরোবদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ ॥

ভক্তি মাহাত্ম্য প্রতিপাদক চৈতন্যের এই প্রথম বচন। প্রাচীন আর্য্যদিগের

শাস্ত্রাদি কর্ম্ম ও জ্ঞান কাণ্ডপ্রধান, যদিও ভাগবত প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থে ভক্তি মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি বৈষ্ণবদিগের * বিশেষতঃ চৈতন্যের পূর্ব্বে তাহা প্রায়ই কেহ প্রকৃষ্ট রূপে জীবনে পরিণত করেন নাই।

অদ্যাপি চৈতন্য অধ্যয়ন অধ্যাপন ও বিচার এই ত্রিবিধ পণ্ডিতের কার্য্য পরিহার করেন নাই। মুকুন্দ কবিরাজ, গদাধর পণ্ডিত প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের সহিত ক্রমে চৈতন্যের পরিচয় ও বিচার হইল। সকলই তাঁহার অলোকসামান্য বিদ্যাবুদ্ধিতে মোহিত হইলেন।

একদা প্রদোষকালে চৈতন্যদেব গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়া শিষ্যদিগকে শাস্ত্রোপদেশ করিতেছেন, এমন সময়ে কয়েক জন বৈষ্ণব তথায় সমাগত হইয়া ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিমোহিত হইলেন এবং এরূপ মহাপুরুষ কৃষ্ণভক্তি বিরহিত এজন্য নানারূপ মনোদুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একজন চৈতন্যের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন

——হের শুন নিমাঞি পণ্ডিত।
বিদ্যায় কি কাজ কৃষ্ণ ভজহ তুরিত॥
পড়ে কেন লোক কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥

চৈতন্যদেব উত্তর করিলেন

তোমরা শিখাও মোরে কৃষ্ণ ভজিবার
শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

এই সময়ে চৈতন্যের জীবন নূতন বেশ ধারণ করিয়াছে এবং যে ভক্তিভাবে সমুদয় ভারত মোহিত হইয়াছিল তাহার অঙ্কুর দেখা দিয়াছে। একদা চৈতন্য ভক্তিরসে আর্দ্রমনা হইয়া গৃহে রহিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার দশা † উপস্থিত হইল। তিনি ক্ষণ নৃত্য, হুঙ্কার, তর্জ্জন, গর্জ্জন ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আত্মীয় বন্ধু বায়ুরোগ বিবেচনা করিয়া মস্তিষ্কে নারায়ণ তৈল মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তথায় আসিয়া বলিলেন, এ বায়ুরোগ নহে প্রেম-বিকার। ক্ষণেক পরে চৈতন্য প্রকৃতিস্থ হইলেন। চৈতন্যের এই প্রথম দশা।

দশা ভঙ্গ হইলে চৈতন্য নগরভ্রমণে বহির্গত হইয়া নবদ্বীপের প্রত্যেক ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিতে গেলেন। নবদ্বীপের আপামর সাধারণ সকলেরই আলয়ে ভ্রমণ করিলেন। এইরূপ শিষ্টতা ও অলোকসামান্য বিদ্যা বুদ্ধি ও রূপলাবণ্যে ক্রমে চৈতন্য আবাল বৃদ্ধবনিতার প্রতিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিলেন। হিন্দু মুসলমান স্ত্রী পুরুষ সকলেই চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন।

নবধর্ম্মসংস্থাপক ও প্রতিষ্ঠাকারক দিগের জীবনী সম্বন্ধে এইরূপই হইয়া থাকে। নানক মহম্মদ প্রভৃতি সকলেই

* রামানুজ আচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় ভক্তিপ্রধান, কিন্তু চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ব্বে ভক্তি সাধারণ্যে পরিগৃহীত হয় নাই।

† প্রেম ভক্তিতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হওয়া।

সাধারণ প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ বাক্যোচ্চারণ করিয়া উৎপীড়িত হওয়ার পূর্ব্বে সর্ব্ব সাধারণের যারপর নাই প্রিয় ছিলেন। বস্তুতঃ সকল ধর্ম্মের মূল এক। সত্যকথন, ন্যায়ব্যবহার ও পরোপকার সকল ধর্ম্মের মূল কথা, সুতরাং নিতান্ত বিরুদ্ধাচরণ (যথা ইদানীন্তন হিন্দুর পক্ষে গো মাংস ভক্ষণ) না দেখিলে, কেন তাদৃশ সদ্‌গুণশালী মহাপুরুষের প্রশংসা করিবে না।

এই সময়ে চৈতন্য সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু তত বাহুল্যের সহিত নহে। অদ্যাপি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনই জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। প্রধান পণ্ডিতদিগের ন্যায় চৈতন্য গৃহীদিগের নিকট নানারূপ ভেট ও বিদায় পাইতে লাগিলেন, তাহাতে প্রচুর অর্থাগম হইতে আরম্ভ হইল। এদিকে তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইল। নানা আত্মীয় বন্ধু ও অতিথিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং রন্ধন করিয়া সকলকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। এইরূপ গার্হস্থাশ্রমই গৃহী বৈষ্ণবদিগের আদর্শ। বৈষ্ণব মাত্রেই অতিথিপরায়ণ, আখড়াধারিগণ ভিক্ষা করিয়া অতিথি সৎকার করেন। চৈতন্য বলেন,

তৃণানি ভূমি রুদকং বাক্‌চতুর্থীচ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গৃহে নোচ্ছিদ্যন্তে
কদাচন॥

* * *

সত্যবাক্যে করিবেক করি পরিহার।
তথাপি অতিথি শূন্য না হব তাহার॥

শ্রী শ্রীকৃষ্ণদাস।

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার।*

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

বঙ্গে ব্রহ্মণাধিকার সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাব লিখিবার সময়ে অমরা অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে আমরা পুনর্ব্বার এই বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। অনেক দিন, আমরা তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিতে পারি নাই। এক্ষণে নিম্নপরিচিত গ্রন্থখানির সাহায্যে প্রোক্ত বিষয়েব পুনরালোচনায় সাহসিক হইলাম।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত এই গ্রন্থখানি, ইউরোপে প্রচারিত হইলে, একটা কোলাহল বাঁধিয়া উঠিত; বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অতিউৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া বড় প্রশংসা পড়িয়া যাইত; এবং অন্ততঃ কিছু কাল সকলের মুখে ইহার প্রশংসা শুনা যাইত। কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয়ের দুর-

* সম্বন্ধ নির্ণয়। বঙ্গদেশীয় আদিম জাতি সমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত। শ্রীলাল মোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

দৃষ্ট ক্রমে তিনি বাঙ্গালি, বাঙ্গালা দেশে বসিয়া, বাঙ্গালা ভাষায়, এই পুস্তক লিখিয়া বাঙ্গালি সমালোচকের হস্তে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রশংসা দূরে থাক্—কিছু সুসভ্য-গালি পালাজ খান নাই, ইহা তাঁহার সৌভাগ্য।

বিদ্যানিধি মহাশয় যে পরিমাণে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা পুস্তকে দুর্লভ; বাঙ্গালি লেখক কেহই এত পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করে না। আমরা সেই সকল বিষয় বা প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

সম্বন্ধনির্ণয়, কেবল ব্রাহ্মণগণের ইতিবৃত্তবিষয়ক নহে। কায়স্থাদি শূদ্রগণও বৈদ্যগণের বিবরণ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের বিবরণ বিশেষ পর্য্যালোচনীয়; অন্য জাতির বিবরণ তাহার আনুষঙ্গিক মাত্র।

আমরা "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার" প্রথম প্রস্তাবে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার ফল এই দাঁড়াইতেছে যে উত্তর ভারতে অন্যান্যাংশে যত কাল ব্রাহ্মণের অধিকার এদেশে ততকাল নহে—সে অধিকার অপেক্ষাকৃত আধুনিক। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বহুশত বৎসর পূর্ব্বে যে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, এমত বিবেচনা না করিবার অনেক কারণ আছে।

মনুসংহিতাদি-প্রদত্ত প্রমাণে, এবং ভাষাতত্ত্ববিদ্ গণের বিচারে, ইহাই স্থির হইয়াছে যে আর্য্যগণ প্রথমে পঞ্চনদ প্রদেশ অধিকার ও অবস্থান করিয়া কালসাহায্যে ক্রমে পূর্ব্বদিকে আগমন করেন। সর্ব্বশেষে বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সে আগমন কিরূপ, তাহার একটু বিচার আবশ্যক হইয়াছে।

প্রথমতঃ একজাতিকৃত অন্যজাতির দেশাধিকার দ্বিবিধ।

(১) আমরা দেখিতে পাই, আমেরিকা ইংরেজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ইংরেজগণ আমেরিকা কেবল অধিকৃত করেন, এমত নহে, তথায় বাস করিয়াছিলেন। ইংরেজসম্ভূত বংশেরাই এখন আমেরিকার অধিবাসী; আমেরিকা এখন তাঁহাদিগের দেশ।

পুনশ্চ, সাক্ষণ জাতি ইংলণ্ড জয় করিয়াছিল। তাহারাও ইংলণ্ডের অধিবাসী হইয়াছিল।

আর্য্যেরাও পশ্চিমাঞ্চল—আমরা যাহাকে পশ্চিমাঞ্চল বলি—বিজিত করিয়া তথাকার অধিবাসী হইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজাধিকৃত আমেরিকা ও সাক্ষণাধিকৃত ইংলণ্ডের সঙ্গে আর্য্যাধিকৃত পশ্চিমভারতের প্রভেদ এই যে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের আদিম অধিবাসিগণ জেতৃগণ কর্ত্তৃক একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, আর্য্যবিজিত আদিম অধিবাসিগণ জেতৃবশীভূত হইয়া শূদ্রনাম গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগের সমাজভুক্ত হইয়া রহিল।

(২) পক্ষান্তরে, ইংরেজেরা ভারত অধিকৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ভারতের

অধিবাসী নহেন। কতকগুলি ভারতবর্ষে বাস করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা এদেশে বিদেশী। ভারতবর্ষ ইংরেজের রাজ্য কিন্তু ইংরেজের বাসভূমি নহে।

সেইরূপ রোমকবিজিত রাষ্ট্রনিচয় রোমকদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু রোমকদিগের বাসভূমি নহে। গল, আফ্রিকা, গ্রীস, মিশর প্রভৃতি দেশ তত্তদ্দেশীয় প্রাচীন অধিবাসিগণেরই বাসস্থল রহিল; অনেক রোমক তত্তদ্দেশে বাস করিলেন বটে, কিন্তু রোমকেরা তথাকার অধিবাসী হইলেন না।

অতএব আমেরিকাকে ইংরেজভূমি, উত্তর ভারতকে আর্য্যভূমি বলা যাইতে পারে। আধুনিক ভারতকে ইংরেজভূমি বলা যাইতে পারে না। মিশরাদিকে রোমক ভূমি বলা যাইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য বঙ্গদেশকে আর্য্যভূমি বলা যাইতে পারে? মগধ, মথুরা, কাশী প্রভৃতি যেরূপ আর্য্যগণের বাসস্থান, বঙ্গদেশ কি তাই?

ভারতীয় আর্য্যজাতি চতুর্ব্বর্ণ। যেখানে আর্য্যগণ অধিবাসী হইয়াছেন, সেই খানেই চতুর্ব্বর্ণের সহিত তাঁহারা বিদ্যমান। কিন্তু বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় নাই, বৈশ্য নাই।

ক্ষত্রিয় দুইচারি ঘর, যাহা স্থানে২ দেখা যায়, তাঁহারা ঐতিহাসিক কালে, অধিকাংশই মুসলমানদিগের সময়ে আসিয়াছেন। দুই একটী রাজবংশ অতি প্রাচীনকালে আসিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু রাজাদিগের কথা আমরা বলিতেছি না, সামাজিক লোকদিগের কথা বলিতেছি।

বৈশ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ। মুর্শিদাবাদে যখন মুসলমান রাজধানী, তখন জনকয় বৈশ্য আসিয়া তাহার নিকটে বাণিজ্যার্থে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বংশ আছে। এইরূপ অন্যত্রও অল্পসংখ্যক বৈশ্যগণ আছে—তাঁহারা আধুনিক কালে আসিয়াছেন। সুবর্ণবণিক্‌দিগকে বৈশ্য বলিলেও—বৈশ্যেরা সংখ্যায় অল্প। বাণিজ্য স্থানেই কতকগুলি সুবর্ণবণিক্ আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, ইহা ভিন্ন অন্য সিদ্ধান্ত করিবার কারণ নাই।

যখন আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে কাণ্যকুব্জ হইতে আনয়ন করেন, তখন বঙ্গদেশে সাড়ে সাত শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। অদ্যাপি সেই আদিম ব্রাহ্মণদিগের সন্ততিগণকে সপ্তশতী বলে। আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণকে ৯৯৯ সম্বতে আনয়ন করেন। সে খৃঃ ৯৪২ শাল। অতএব দেখা যাইতেছে যে দশম শতাব্দীতে গৌড় রাজ্যে সাড়ে সাত শত ঘরের অধিক ব্রাহ্মণ ছিল না। এ সংখ্যা অতি অল্প; এক্ষণে অতি সামান্য পল্লীগ্রামে ইহার অধিক ব্রাহ্মণ বাস করেন। এক্ষণে যে ইংরেজেরা বঙ্গদেশে বাস করেন, তাঁহারা এই দশম শতাব্দীর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনেক বেশী।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনটি

আর্য্যজাতি। ইহারাই উপবীত ধারণ করে। শূদ্র অনার্য্য জাতি। যেখানে দেখিতেছি, বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয়* আইসে নাই, বৈশ্যগণ কদাচিৎ বাণিজ্যার্থ আসিয়াছিল, এবং ব্রাহ্মণও একাদশ শতাব্দীতে অতিবিরল, তখন বলা যাইতে পারে যে এই বাঙ্গালা, নয়শত বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যভূমি ছিল না, অনার্য্যভূমি ছিল, এবং এক্ষণে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজদিগের যে সম্বন্ধ বাঙ্গালার সহিত আর্য্যদিগের সেই সম্বন্ধ ছিল।

এক্ষণে দেখা যাউক, কতকাল হইল বাঙ্গালায় প্রথম ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। তজ্জন্য আদিশূর ও বল্লালসেনে যে কত বৎসরের ব্যবধান, তাহা দেখা আবশ্যক।

আদিশূর যে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে কাণ্যকুব্জ হইতে আনয়ন করেন, তাঁহাদিগের বংশসম্ভূত কয়েক ব্যক্তিকে বল্লালসেন কৌলীন্য প্রদান করেন। প্রবাদ আছে যে বল্লালসেন, আদিশূরের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজা। কিন্তু এ কিম্বদন্তী যে অমূলক, এবং সত্যের বিরোধী, ইহা বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পূর্ব্বেই সপ্রমাণীকৃত করিয়াছেন। এক্ষণে পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, তাহা পুনঃ প্রমাণিত করিয়াছেন। ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন শ্রীহর্ষ। তিনি মুখোপাধ্যায়দিগের আদিপুরুষ। বল্লালসেন তাঁহার বংশে উৎসাহকে কৌলীন্য প্রদান করেন। উৎসাহ শ্রীহর্ষ হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ।* আদিশূরের পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে দক্ষ একজন। দক্ষ চট্টোপাধ্যায়দিগের আদি পুরুষ তাঁহার বংশোদ্ভূত বহুরূপকে বল্লালসেন কৌলীন্য প্রদান করেন। বহুরূপ দক্ষহইতে অষ্টম পুরুষ। † ভট্টনারায়ণ, ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের একজন। বল্লালসেন তদ্বংশীয় মহেশ্বরকে কৌলীন্য প্রদান করেন। মহেশ্বর ভট্টনারায়ণ হইতে দশম পুরুষ। ইত্যাদি।

আদিশূর যাঁহাদিগকে কাণ্যকুব্জ হইতে আনিয়াছিলেন, বল্লাল তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা হইলে কখন তাঁহাদিগের অষ্টম, দশম বা ত্রয়োদশ পুরুষ দেখিতে পাইতেন না। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, বারেন্দ্র দিগের কুলশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বল্লাল আদিশূরের দৌহিত্র হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ। ইহাই সম্ভব।

ক্ষিতীশবংশাবলীতে লিখিত আছে যে ৯৯৯ অব্দে আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, যে এই অব্দ শকাব্দ নহে, সম্বৎ। কিন্তু সম্বতের সঙ্গে খৃষ্টাব্দের হিসাব করিতে গিয়া তিনি একটি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি লেখেন—

"আদিশূর খৃঃ দশম শতাব্দীর শেষভাগে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন; এবং খৃঃ

---

* (১)শ্রীহর্ষ, (২)শ্রীগর্ভ, (৩)শ্রীনিবাস, (৪)আরব, (৫)ত্রিবিক্রম, (৬)কাক, (৭) ধাঁধু (৮)জলাশয়, (৯)বাণেশ্বর (১০)গুহ, (১১)মাধব,(১২)কোলাহল, (১৩) উৎসাহ।

† (১)দক্ষ (২)সুসেন, (৩)মহাদেব,(৪) হলধর, (৫)কৃষ্ণদেব, (৬)বরাহ, (৭(শ্রীধর, (৮)বহুরূপ

একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ১০৫৬ অব্দে পুত্রেষ্টি যাগ করেন।

প্রমাণ, „ এক্ষণে সম্বৎ——১৯৩২
ঐ „ —খৃষ্টীয় শক——১৮৭৫

সম্বতের সহিত খৃঃ অন্তর———৫৭

এখন দেখা যাইতেছে যে ৯৯৯সম্বৎ অর্থাৎ যে বর্ষে পুত্রেষ্টি যাগ হয় সে বৎসর খৃ ১০৫৬।"—১৬১ পৃষ্ঠা।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের ভুল এই যে সংবতে ৫৭বৎসর যোগ করিয়া খৃষ্টাব্দ বাহির করিতে হয় না; কেননা খৃঃঅব্দ হইতে সংবৎ পূর্ব্বগামী, সংবৎ হইতে ৫৭ বৎসর বাদ দিয়া খৃঃঅব্দ পাইতে হইবে। যোগ করিলে, এখন ১৯৩২+৫৭ =১৯৮৯ খৃষ্টাব্দ হয়। বাদ দিলেই ১৯৩২—৫৭=১৮৭৫ খৃঃঅব্দ পাওয়া যায়। সেইরূপ ৯৯৯সংবতে ৯৯৯—৫৭ =৯৪২ খৃষ্টাব্দ। এইভুল বিদ্যানিধি মহাশয় স্থানান্তরে সংশোধিতও করিয়াছেন, কিন্তু তন্নিবন্ধন তাঁহাকে অনেক অনর্থক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।

ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতে "সামান্যা কারে অব্দ শব্দ লিখিত আছে। সুতরাং ঐঅব্দ পদের শক্তি শক ও সংবৎ উভয়েতেই যাইতে পারে।" বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, উহা সংবৎ ধরিতেহইবে, কিন্তু তিনি এইরূপ অভিপ্রায় করার যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা তত পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত না হইলেও, কথাটি ন্যায্য বোধ হয়। এস্থলে, আমাদিগকে অভ্রান্ত পুরাণতত্ত্ববিৎ বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলে বিচার নির্দ্দোষ হইতে পারে।

বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, সময় প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে যে বল্লাল সেন, দানসাগর নামক গ্রন্থের ১০১৯শকে রচনা সমাপ্ত করেন। ১০১৯শকাব্দ ১০৯৭ খৃঃঅব্দ। তাদৃশ বৃহদ্‌গ্রন্থ প্রণয়নে অনেক দিন লাগিয়া থাকিবে। অতএব বল্লাল সেন তাহার পূর্ব্বে অনেক বৎসর হইতে জীবিত ছিলেন, এমত বিবেচনা করা যায়। আইন আকবরীতে যাহা লেখা আছে, তাহাতে জানাযায় বল্লাল সেন ১০৬৬ খৃঃঅব্দে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। আইন আকবরীর কথা,ও রাজেন্দ্রলাল বাবুর কথায় ঐক্য দেখা যাইতেছে।

আদিশূরের সময়, রাজেন্দ্রলাল বাবু নিজবংশের পর্য্যায় হিসাব করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহার গণনায় ৯৬৪ হইতে ১০০০খৃষ্টাব্দ আদিশূরের সময় নিরূপিত হইয়াছে। এগণনা ক্ষিতীশবংশাবলীর ৯৯৯সঙ্গে ঠিক্ মিলিতেছে না। অন্ততঃ ২২ বৎসরের প্রভেদ হইতেছে; কেননা ৯৯৯সংবতে ৯৪২ খৃষ্টাব্দ। এপ্রভেদ অতি অল্প। এদিকে শকাব্দ ধরিলে ৯৯৯ শকাব্দে ১০৭৭ খৃষ্টাব্দ পাই। তখন, বল্লাল সিংহাসনারূঢ় ইহা উপরে দেখা গিয়াছে। সুতরাং শক নহে সংবৎ।

অতএব আদিশূরের পুত্রেষ্টি যাগার্থ পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন হইতে, বল্লালের গ্রন্থ সমাপন পর্য্যন্ত ১৫৫বৎসর পাওয়া

যাইতেছে। উপরে বলা হইয়াছে যে বল্লাল আদিশূরের দৌহিত্রের অধস্তন সপ্তম পুরুষ; তাহা হইলে আদিশূর হইতে বল্লাল নবম পুরুষ। আদিশূরের সমকালবর্ত্তী দক্ষ হইতে তদ্বংশজাত, এবং বল্লালের সমকালবর্ত্তী বহুরূপ অষ্টম পুরুষ। আদিশূরের সমকালবর্ত্তী বেদগর্ভ হইতে তদ্বংশজাত, এবং বল্লালের সমকালবর্ত্তী শিশু, ৮ম পুরুষ; তদ্রূপ ভট্টনারায়ণ হইতে মহেশ্বর ১০ম পুরুষ; এবং শ্রীহর্ষ হইতে উৎসাহ ১৩ পুরুষ। কেবল ছান্দড় হইতে কানু ৪র্থ পুরুষ। গড়ে আদিশূর হইতে বল্লাল পর্য্যন্ত নয় পুরুষই পাওয়া যায়।

প্রচলিত রীতি এই যে ভারতবর্ষীয় ঐতিহাসিক গণনায় এক পুরুষে ১৮বৎসর পড়তা করা হইয়া থাকে। তাহা হইলে নয়পুরুষে ১৬২ বৎসর পাওয়া যায়। আমরা অন্য হিসাবে বল্লাল ও আদিশূরে ১৫৫বৎসরের প্রভেদ পাইয়াছি। এ গণনার সঙ্গে, সে গণনা মিলিতেছে। অতএব এফল গ্রাহ্য। বল্লাল আদিশূরের সার্দ্ধেক শতাব্দী পরগামী।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের গ্রন্থে জানা যায়, যে যখন বল্লাল কৌলীন্য সংস্থাপন করেন, তখন আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণগণের বংশে একাদশ শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। দেড়শত বৎসরে ঈদৃশ বংশবৃদ্ধি বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যদি বিবেচনা করা যায় যে তৎকালে বহুবিবাহ প্রথা বিশেষ প্রকারে প্রচলিত ছিল, তাহা হইলে ইহা বিস্ময়কর বোধ হইবে না। বহু বিবাহ যে বিশেষ রূপেই প্রচলিত ছিল, তাহা ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের পুত্রসংখ্যার পরিচয় লইলেই বিশেষ প্রকারে বুঝা যাইবে। বিদ্যানিধি মহাশয়ের ধৃত মিশ্র গ্রন্থের বচনে দেখা যায় যে ভট্টনারায়ণের ১৬পুত্র, দক্ষের ১৬ পুত্র, বেদগর্ভের ১২ পুত্র, শ্রীহর্ষের ৪পুত্র, এবং ছান্দড়ের ৮ পুত্র। মোটে ৫ পাঁচ জনে বাঙ্গালায় ৫৬পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। এই ৫৬ পুত্র ৫৬টি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করেন, সেই ৫৬ গ্রাম হইতে রাঢ়ীয়দিগের ৫৬টি গাঁই। যখন দেখা যাইতেছে যে একপুরুষ মধ্যে, ৫ঘর হইতে ৫৬ ঘর অর্থাৎ ১১গুণ বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, তখন নয়পুরুষের শতগুণ বৃদ্ধি নিতান্ত সম্ভব। বরং অধিক, কেননা পঞ্চব্রাহ্মণ অধিক বয়সে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, অতএব তাঁহারা বাঙ্গালায় স্বব্রাহ্মণ বৃদ্ধি করিবার তাদৃশ সময় পান নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের বংশাবলী কৈশোর হইতে পিতৃত্ব স্বীকার করিতেন, ইহা সহজে অনুমেয়।

সুবিখ্যাত ফুলের মুখটি নীলকণ্ঠ ঠাকুরের বংশ বাঙ্গালায় কত বিস্তৃত, তাহা রাঢ়ীয় কুলীনগণ জানেন। এক এক খানি ক্ষুদ্র গ্রামেও পাঁচ সাত ঘর পাওয়া যায়; কোন২ বড় গ্রামে, তাঁহাদিগের সংখ্যা অগণ্য। যে বলিবে যে, সমগ্র বাঙ্গালায় একাদশ শত ঘর মাত্র নীলকণ্ঠ ঠাকুরের সন্তান বাস করে, সে

অন্যায় বলিবেনা। কিন্তু কয় পুরুষ মধ্যে এই বংশবৃদ্ধি হইয়াছে? বহুসংখ্যক নীলকণ্ঠ ঠাকুরের সন্তানের সঙ্গে বর্ত্তমান লেখকের পরিচয় বন্ধুত্ব এবং কুটুম্বিতা আছে। তাঁহারা নীলকণ্ঠ হইতে কেহ সপ্তম কেহ অষ্টম, কেহ নবম পুরুষ। যদি সাত আট পুরুষে, এরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি, এক জন হইতে হইতে পারে, তবে দেড় শত বৎসরে ৫জন হইতে একাদশ শত ঘর হওয়া নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা নহে।

এক্ষণে বোধ হয়, চারিটি বিষয় বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া স্থির হইতেছে।

১ম। আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনিবার পূর্ব্বে এতদ্দেশে সাড়ে সাত শত ঘর ব্যতীত ব্রাহ্মণ ছিল না।

২য়। ৯৪২ খৃ অব্দে আদিশূর ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন।

৩য়। তাহার দেড় শত বৎসর পরে বল্লাল সেন ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্য প্রচলিত করেন।

৪র্থ। এ দেড়শত বৎসরে ঐ পাঁচ ঘর ব্রাহ্মণে এগার শত ঘর হইয়াছিল।

যদি দেড়শত বৎসরে পাঁচজন ব্রাহ্মণের বংশে একাদশ শত ঘর হইয়াছিল, তবে কত কালে বঙ্গদেশের আদিম ব্রাহ্মণ গণের বংশ সাড়ে সাত শত ঘর হইয়াছিল।

যদি, সপ্তশতীদিগের আদি পুরুষও পাঁচজন ছিলেন এবং যদি তাঁহারাও কান্যকুব্জীয়দিগের ন্যায় বহুবিবাহ পরায়ণ ছিলেন, ইহা বিবেচনা করা যায় তবে বাঙ্গালায় প্রথম ব্রাহ্মণদিগের আগমন কালহইতে শত বৎসর মধ্যে, তাঁহাদের বংশে এই সাড়ে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণের জন্ম অসম্ভব নহে।

সপ্ত শতীদিগের পূর্ব্বপুরুষগণও বহুবিবাহপরায়ণ ছিলেন, ইহা অনুমানে দোষ হয় না। কেন না বহুবিবাহ তৎকালে বিলক্ষণ প্রচলিত দেখা যাইতেছে। তবে এমন হইতে পারে যে কান্যকুব্জীয়গণ বিশেষ সুব্রাহ্মণ বলিয়া সপ্তশতীগণও তাঁহাদিগকে কন্যাদানে উৎসুক হইতেন, এই জন্য তাঁহারা অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন; সপ্তশতীগণের পূর্ব্বপুরুষের তত বিবাহ করিবার কোন কারণ ছিল না। কেমন এদিকে পাঁচজন মাত্র যে তাঁহাদিগের আদিপুরুষ ইহা অসম্ভব। বরং ব্রাহ্মণ আসিতে একবার আরম্ভ হইলে ক্রমে ক্রমে একত্রে বা একে একে, রাজগণের প্রয়োজনানুসারে,বা রাজপ্রসাদ লাভাকাঙ্ক্ষায় অধিকসংখ্যক আসাই সম্ভব।

অতএব, কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিবার পূর্ব্বে দুই এক শত বৎসরের মধ্যেই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদিগের প্রথম বাস, বিচারসঙ্গত বোধ হইতেছে। অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ব্রাহ্মণশূন্য অনার্য্যভূমি ছিল। পূর্ব্বে কদাচিৎ কোন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে যদি আসিয়া, বাস করিয়া থাকেন, তাহা গণনীয়ের মধ্যে

নহে। অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণসমাজ ছিল না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে আদিশূরের সময়ে যে কেবল সাড়ে সাত শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ দেখিতেছ, তাহার কারণ এমত নহে, যে ব্রাহ্মণেরা স্বল্পদিন মাত্র বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যই ব্রাহ্মণ সংখ্যার অল্পতার কারণ। কিন্তু বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের যে রূপ প্রাবল্যছিল, মগধ কান্যকুব্জাদি দেশেও তদ্রূপ বা তদধিক ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য হেতু যদি বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ সংখ্যা স্বল্পীভূত হইয়াছিল, তবে সমগ্র ভারতবর্ষেও সেই কারণে ব্রাহ্মণবংশ লুপ্ত প্রায় হইয়াছিল স্বীকার করিতে হইবে। কোন২ আপত্তিকারী তাহাও স্বীকার করিতে পারেন। বলিতে পারেন, যে তখন সমস্ত ভারতেই অল্প ব্রাহ্মণছিল—এক্ষণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, যদি পূর্ব্ব হইতে বঙ্গে ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তবে আদিশূরের পূর্ব্বকাল জাত কোন গ্রন্থে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না কেন? বরং প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তথায় ব্রাহ্মণের বাস না থাকারই নিদর্শন পাওয়া যায় কেন?† আমরা পাঠকদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যে অষ্টম শতাব্দীর বা আদিশূরের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বঙ্গবাসী গ্রন্থকারের নাম তাঁহারা স্মরণ করিয়া বলিতে পারেন? কুল্লুকভট্ট জয়দেব, গোবর্দ্ধনাচার্য্য, হলায়ুধ, উদয়নাচার্য্য, প্রভৃতি যাহার নাম করিবেন সকলই আদিশূরের পরবর্ত্তী। ভট্টনারায়ণ ও শ্রীহর্ষ তাঁহার সমকালিক। প্রাচীন আর্য্যজাতি যেখানে বাস করিয়াছেন, সেই খানেই ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্যের চিহ্নস্বরূপ গ্রন্থাদি রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় যখন ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তখন কার প্রণীত পুস্তকাদিও নাই।

আমরা অবশ্য ইহা স্বীকার করি যে অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বেও আর্য্য রাজকুল বাঙ্গালায় ছিল, এবং তাঁহাদিগের আনুষঙ্গিক ব্রাহ্মণও থাকিতে পারেন। সেরূপ অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ আমাদিগের আলোচনার বিষয় নহে। সেরূপ সকল জাতিই সকল দেশে থাকে। কালিফর্ণিয়াতেও অনেক চীন আছে।

আমরা যে কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য যত্ন পাইয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তবে অনেকেই মনে করিবেন, যে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালির বড় লাঘব হইল। আমরা আধুনিক বলিয়া বাঙ্গালিজাতির অগৌরব করা হইল। আমরা প্রাচীন জাতি বলিয়া আধুনিক ইংরেজদিগের সম্মুখে স্পর্দ্ধা করি—তা না হইয়া আমরাও আধুনিক হইলাম।

আমরা দেখিতেছি না যে অগৌরব কিছু হইল। আমরা সেই প্রাচীন আর্য্যজাতি সম্ভূতই রহিলাম—বাঙ্গালায় যখন আসি না কেন, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ-

† বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার প্রথম প্রস্তাব দেখ।

গণ সেই গৌরবান্বিত আর্য্য। বরং গৌরবের বৃদ্ধিই হইল। আর্য্যগণ বাঙ্গালায় তাদৃশ কিছু মহৎ কীর্ত্তি রাখিয়া যান নাই —আর্য্যকীর্ত্তিভূমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল। এখন দেখা যাইতেছে যে আমরা সে কীর্ত্তি ও যশেরও উত্তরাধিকারী। সেই কীর্ত্তিমন্ত পুরুষগণই আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ। দোবে, চোবে, পাঁড়ে, তেওয়ারীর মত আমরাও ভারতীয় আর্য্যগণের প্রাচীন যশের ভাগী বটে।

আমাদের আর একটি কলঙ্কের লাঘব হইতেছে। আদিশূরের সময়ে মোটে সাড়ে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। বল্লালের সময় সেই সাড়ে সাতশত ঘরের বংশ এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশ একাদশ শত ঘর ছিল। ক্ষত্রীয় বৈশ্য এখনও যখন অতি অল্প সংখ্যক, তবে তখন যে আরও অল্পসংখ্যক ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বল্লালের দেড় শত বৎসর পরে মুসলমানগণ বঙ্গজয় করেন। তখন বঙ্গীয় আর্য্যগণের সংখ্যা অধিক সহস্র নহে, ইহা অনুমেয়। তখনও তাঁহারা এদেশে ঔপনিবেশিক মাত্র। সুতরাং সপ্তদশ অশ্বারোহীকর্ত্তৃক বঙ্গজয়ের যে কলঙ্ক, তাহা আর্য্যদিগের কিছু কমিতেছে বটে।

তখনও বঙ্গীয় আর্য্যগণের অভ্যুদয়ের সময় হয় নাই। এখন সে সময় বোধ হয় উপস্থিত। বাহুবলে না হউক, বুদ্ধিবলে যে বাঙ্গালি অচিরে পৃথিবীমধ্যে যশস্বী হইবে, তাহার সময় আসিতেছে।

আমরা উপরে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, কায়স্থগণ সম্বন্ধেও তাহা বর্ত্তে। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন কায়স্থগণ সৎশূদ্র, অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর নহে। আমাদিগের বিবেচনায় তাহারা বর্ণসঙ্কর বটে। তদ্বিষয়ে বঙ্গদর্শনে ইতিপূর্ব্বে অনেক বলা হইয়াছে। এক্ষণে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সঙ্করতা হেতু কায়স্থগণ আর্য্যবংশসম্ভূত বটে। আদিশূরের সময় পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচ জন কায়স্থও কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে যেমন বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ছিল, সেই রূপ কায়স্থও ছিল, কিন্তু অল্পসংখ্যক। এক্ষণে কায়স্থগণ বঙ্গদেশের অলঙ্কার স্বরূপ।

রজনী।

ষষ্ঠ খণ্ড।

(অমরনাথ বক্তা।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এ ভবের হাট হইতে, আমার এই মনিহারির দোকান খানি উঠাইতে হইল। লোক ঠকাইয়া—আপনি ঠকিয়া, কোন সুখ নাই। মনে করিয়াছিলাম, নানা বর্ণের সুশোভন কাচে, এসাধের বিপণী সাজাইব—অমূল্য মণিমাণিক্য মনে ক-করিয়া, খরিদদার বহুমূল্যে আমার সেই কাচ কিনিবে। কিনিবে না কেন? কিনিয়া বিনিময় দেয় কি? অসার কাচ লইয়া, অসার কাচ দেয়। অসার কথা —অসার স্তব,—অসার তোষামোদ, অ-সার বন্ধুত্ব, অসার আমোদ,—খল হাসি, শঠ প্রবৃত্তি, নীচ আশয়, বিনিময়ে ইহাই দেয়। কাচের বিনিময়ে কাচ লইয়া, এতকালে আমার কি তৃপ্তি হইল? এদগ্ধ হৃদয়ের কোন্ জ্বালা থামিল? এ অনন্ত, অনিবার্য্য পিপাসার কি শমতা হইল? এ হাট ভাঙ্গিব, এ ব্যবসা ছাড়িব—যিনি ছল জানেন না, কপট জানেন না, যাঁহার কাছে খল কপট চলে না, যাঁহার কাছে কাচ বিক্রয় হয়, যিনি বিনিময়ে খাটি সোনা ভিন্ন দেন না, তাঁহারই চরণে সকল সমর্পণ করিব।

প্রভো, তোমায় অনেক সন্ধান করিয়াছি. কই তুমি? দর্শনে, বিজ্ঞানে, তুমি নাই। জ্ঞানীর জ্ঞানে, ধ্যানীর ধ্যানে তুমি নাই। তুমি অপ্রমেয়, এজন্য তোমার পক্ষে প্রমাণ নাই। এই স্ফুটিতোন্মুখ হৃদ্‌পদ্মই তোমার প্রমাণ—ইহাতে তুমি আরোহণ কর। আমি এমনিহারির দোকান ভাঙ্গিব—যিনি সকল খরিদ দারের বড় খরিদ দার, বিনামূল্যে সকলই তাঁহাকে বিক্রয় করিব।

তুমি নাই? না থাক, তোমার নামে আমি সকল উৎসর্গ করিব। অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তস্মৈ নমঃ বলিয়া, এ কলঙ্কলাঞ্ছিত দেহ উৎসর্গ করিব। তুমি যাহা দিয়াছ, তুমি কি তাহা লইবে না? তুমি লইবে, নহিলে এ কলঙ্কের ভার আর কে পবিত্র করিবে?

প্রভো! আপনার কাছে একটা নিবেদন আছে। এ দেহ কলঙ্কিত করাইল কে, তুমি না আমি? আমি যে অসৎ, অসার, দোষ আমার না তোমার? আমার এ মনিহারির দোকান সাজাইল কে, তুমি না আমি? যাহা তুমি সাজাইয়াছ, তাহা তোমাকেই দিব। আমি এ ব্যাবসা আর রাখিব না।

সুখ! তোমাকে সর্ব্বত্রে খুঁজিলাম—পাইলাম না। সুখ নাই—তবে আশায়

কাজ কি? যে দেশে অগ্নি নাই, সে দেশে ইন্ধন আহরণ করিয়া কি হইবে?

প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সব বিসর্জ্জন দিব। একবার ললিতলবঙ্গলতার মুখে হাসি দেখিয়া, এ সংসার হইতে যাইব।

আমি পরদিন শচীন্দ্রকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম শচীন্দ্র অধিকতর স্থির —অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল। তাহার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথোপকথন করিতে লাগিলাম। বুঝিলাম আমার উপর যে বিরক্তি, শচীন্দ্রের মন হইতে তাহা যায় নাই।

পরদিন পুনরপি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। প্রত্যহই তাঁহাকে দেখিতে যাইতে লাগিলাম। শচীন্দ্রের দুর্ব্বলতা ও ক্লিষ্টভাব কমিল না, কিন্তু ক্রমে স্থৈর্য্য জন্মিতে লাগিল। প্রলাপ দূর হইল। ক্রমে শচীন্দ্র আপনার প্রকৃতিস্থ হইলেন।

রজনীর কথা একদিনও শচীন্দ্রের মুখে শুনি নাই। কিন্তু ইহা দেখিয়াছি, যে যেদিন হইতে রজনী আসিয়াছিল, সেইদিন হইতে তাঁহার পীড়া উপশমিত হইয়া আসিতেছিল। এক কথা লবঙ্গ আমাকে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে নাই, কি প্রকারে বলিবে, কেন না রজনী আমারই পত্নী বলিয়া পরিচিতা—কিন্তু আমার বেশ হৃদয়ঙ্গম হইল যে শচীন্দ্র রজনীর প্রতি অনুরক্ত। এই অনুরাগের বিকৃতিতে তাঁহার বায়ুরোগ, অথবা বায়ুরোগের বিকারেই এই অনুরাগ।

একদিন, যখন আর কেহ শচীন্দ্রের কাছে ছিল না, তখন আমি ধীরে২ বিনা আড়ম্বরে রজনীর কথা পাড়িলাম। ক্রমে তাহার অন্ধতার কথা পাড়িলাম, অন্ধের দুঃখের কথা বলিতে লাগিলাম, এই জগৎ সংসারসুখদর্শনে সে যে বঞ্চিত,—প্রিয়জন দর্শনসুখে সে যে আজন্ম মৃত্যুপর্য্যন্ত বঞ্চিত, এই সকল কথা তাঁহার সাক্ষাতে বলিতে লাগিলাম। দেখিলাম শচীন্দ্র মুখ ফিরাইলেন, তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইল।

অনুরাগ বটে।

তখন বলিলাম "আপনি রজনীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আমি সেইজন্যই একটি কথার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে চাই। রজনী একে বিধাতাকর্তৃক পীড়িতা, আবার আমাকর্তৃক আরও গুরুতর পীড়িতা হইয়াছে।"

শচীন্দ্র আমার প্রতি বিকট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন।

আমি বলিলাম, "আপনি যদি সমুদায় মনোযোগপূর্ব্বক শুনেন, তবেই আমি বলিতে প্রবৃত্ত হই।"

শচীন্দ্র বলিলেন, "বলুন।"

আমি বলিলাম, "আমি অত্যন্ত লোভী এবং স্বার্থপর। আমি আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য, তাহাকে আপনার স্ত্রী পরিচয়ে আপনার গৃহে রাখিয়াছিলাম। রজনীর সম্মতিক্রমেই রাখিয়া-

ছিলাম। সে আমার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ ছিল, সেইজন্য আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ করার সহায়তা করিতে সম্মত হইল। কিন্তু আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে, সে আমাকে বিবাহ করিতে অসম্মতা হইয়া, আমার গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল।"

শ। তার পর বিবাহ হইল কি প্রকারে?

আমি বলিলাম, "বিবাহ হয় নাই। রজনী আমার স্ত্রী নহে।"

শচীন্দ্র প্রথমে ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, তাহার পর তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

আমি তখন শচীন্দ্রকে নিরুত্তর দেখিয়া কথা আরম্ভ করিলাম। যেপ্রকারে রজনীর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ, যে প্রকারে তাহাকে অত্যাচারীর হস্তহইতে রক্ষা করিয়া, তাহাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহা বিবৃত করিলাম। দেখিলাম, শচীন্দ্রও আমার কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইলেন। বলিলেন,

"আপনি বলিলেন রজনী আপনাকর্ত্তৃক পীড়িতা হইয়াছে। পীড়িতা নহে, বিশেষ উপকৃতাই হইয়াছিল।"

আমি বলিলাম, "পরে শুনুন।" তখন আমি অবশিষ্ট কথা বলিলাম। যেপ্রকারে রজনীর উত্তরাধিকারিণীত্বের সন্ধান পাইয়াছিলাম, যেপ্রকারে রজনীর সন্ধান পাইয়াছিলাম, যেপ্রকারে তাহার বিষয় উদ্ধারের জন্য যত্ন করিয়াছিলাম, যেপ্রকারে সে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়া আমার মতে সম্মত হইয়া, আমার স্ত্রী পরিচয়ে আমার গৃহবাসিনী হইয়া রহিল, তাহাও বলিলাম। তাহার পর যে প্রকারে রজনী আমাকে বিষয় দান করিয়া, আমাকে বিবাহ করিতে অসম্মতা হইয়া, আমার গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহাও বলিলাম।

শুনিয়া শচীন্দ্র কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন,

"মহাশয়, এ সকল কথা আমাকে বলিতেছেন কেন?" আমি বলিলাম, "আমি যে ধনসম্পত্তির আকাঙ্ক্ষী তাহা আমার হস্তগত হইয়াছে। এক্ষণে রজনী আশ্রয়শূন্যা। তাহার কোন উপায় আমি করিতে পারিতেছি না।"

শচীন্দ্র বলিলেন, "সেজন্য আপনি কাতর হইবেন না। যে অন্ধ অবলা স্ত্রী, বঞ্চক কর্ত্তৃক বঞ্চিত, তাহাকে আশ্রয়দানে আমার পিতা অদ্যাপি অক্ষম হয়েন নাই, অথবা বিমুখ হইবেন না।"

আমি বলিলাম, "আশ্রয় যেখানে সেখানে পাইতে পারে। কিন্তু আমার দোষে তাহার বিবাহের পথ বন্ধ হইয়াছে। যাহাকে লোকে আমার পত্নী বলিয়া জানে, এখন আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হয়, এমন লোক পাওয়া ভার। যদি কেহ আপনার সন্ধানে থাকে, সেই জন্য আপনাকে এত কথা বলিতেছি।"

শচীন্দ্র একটু বেগের সহিত বলিলেন,

"যদি আপনার কথা সত্য হয়, তবে রজনীর পাত্রের অভাব নাই। কিন্তু আপনার কথা সত্য কি না, তাহা কি-প্রকারে জানিব? রজনীত এসকল কথা এত দিন কিছু বলে নাই।"

আমি বুঝিলাম, রজনীর বরপাত্র কে। বলিলাম, "রজনীকে আজি জিজ্ঞাসা করিবেন। আপনি স্বয়ং জিজ্ঞাসা না করিয়া, আপনার বিমাতাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিবেন। বলিবেন, আমি সকল কথা প্রকাশ করিতে অনুমতি করিতেছি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন, আবার মিত্রদিগের আলয়ে গিয়া দেখা দিলাম। লবঙ্গলতাকে বলিয়া পাঠাইলাম, যে আমি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইব। এক্ষণে সম্প্রতি প্রত্যাগমন করিব না—তিনি আমার শিষ্যা, আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিব।

লবঙ্গলতা ইঙ্গিত বুঝিল। আমার সহিত, পূর্ব্বাঙ্গীকার মতে, পুনশ্চ সাক্ষাৎ করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,

"আমি কালি যাহা শচীন্দ্রকে বলিয়া গিয়াছি, তাহা শুনিয়াছ কি?"

ল। শুনিয়াছি। তুমি অদ্বিতীয় পাষণ্ড।

আমি। সে কথা কে অস্বীকার করিতেছে? কিন্তু আমার কথায় বিশ্বাস হয় কি?

ল। কেবল তোমার কথায় বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু রজনীকে জিজ্ঞাসা করায়, সে সমুদায় বলিয়াছে। তাহার কথায় বিশ্বাস করি।

আমি। তাই বা কেন কর? মনে কর তাহাকে আমি এ সকল কথা শিখাইয়া আনিয়াছি।

ল। কি অভিপ্রায়ে তুমি শিখাইবে?

আমি। মনে কর আমাদের যথার্থ বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে উভয়ে উভয়ের উপর বিরক্ত। উভয়ে উভয়কে ছাড়িতে চাই। বিবাহ অস্বীকার ভিন্ন, ইহার আর উপায় কি?

লবঙ্গলতা ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, "যে চুরি করে, সে গৃহস্থকে ডাকিয়া বলে না যে আমি চুরি করিতেছি।"

আমি। চোরের অনেক কৌশল।

ল। তুমি অনেক কৌশল জান বটে, কিন্তু রজনী তত জানে না। রজনী যেপ্রকারে বলিল, তাহাতে আমার বিশ্বাস হইল। সত্য কথা না হইলে, সে তত সবিস্তারে বলিতে পারিত না।

আমি। শিখাইলে, বিচিত্র কি? আদালতে সাক্ষি জোবানবন্দী দেয় কি প্রকারে? শিখিলে সকলেই মিথ্যা কাহিনী সবিস্তারে বলিতে পারে।

ল। রজনী তোমার শিক্ষামতে কথন পারে না। কেন না, তুমি শিখাইলে, কোন না কোন কথায় আমি বুঝিতে পারিতাম, যে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি শিখাইয়াছে। রজনী যাহা বলিল, তাহাতে

বুঝিলাম যে, অন্ধ অন্ধের জ্ঞানমত সকল বলিতেছে ।

আমি । তুমি দ্বিতীয় বেহ্ণাম বোধ হয় । সত্য সত্যই কি তুমি এ কথা বিশ্বাস করিয়াছ ?

ল । সত্য সত্যই বিশ্বাস করিয়াছি ।

আমি । শচীন্দ্র ?

ল । তার আরও বিশ্বাস ।

আমি । ভালই হইয়াছে । এক্ষণে রজনী আমার গৃহে যাইতে অসম্মত । তাহার বিবাহ সুকঠিন । আমি কি তোমাদিগকে নিঃস্ব করিয়া, রজনীকেও তোমাদিগের গলায় ফেলিলাম না কি ?

ল । তুমি বিশেষ দয়ালু ব্যক্তি দেখিতে পাই । বিশেষ আমাদিগের ধন সম্পত্তির উপর তোমার বড় মায়া । কিন্তু রজনীর জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না, সে আমাদিগের গলায় পড়িবে না ।

আমি । তবে তাহাব কি উপায় করিবে ? জিজ্ঞাসায় রাগ কবিও না । আমার একটু প্রয়োজন আছে ।

ল । আমরা তাহার বিবাহ দিব ।

আমি । সে বড় কঠিন । তোমাদের কথায় তাহাকে কুমারী মনে করিয়া বিবাহ করিবে, এমন লোক কি আছে ?

ল । আছে ।

আমি । থাকিতে পারে । এমন অনেক লোক আছে যে তাহাদের অন্য প্রকারে বিবাহের সম্ভাবনা নাই । কিন্তু সে প্রকারের লোককে কি রজনী বিবাহ করিবে ?

ল । যে পাত্র স্থির হইয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিতে রজনী রাজি হইয়াছে ।

আমি । বটে ? কে সে ?

ল । আমার পুত্র শচীন্দ্র ।

আমি । কানাকে !

ল । কানাকে । যাহাতে অমরনাথ বাবু অনিচ্ছুক ছিলেন না, তাহাতে অন্যেও ইচ্ছুক হইতে পারে ।

আমি বিস্মিত হইলাম না, কেন না শচীন্দ্র যে রজনীতে অনুরক্ত তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম । আমি নীরব হইয়া রহিলাম । তখন অবসর পাইয়া লবঙ্গলতা জিজ্ঞাসা করিল,

"তুমি আমার সঙ্গে আর একবার সাক্ষাতের ইচ্ছা করিয়াছিলে কেন ? তুমি নাকি কলিকাতা হইতে উঠিয়া যাইতেছ ?"

অ । যাইব ।

ল । কেন ?

অ । তোমার স্বামীর পাহারাওয়ালার ভয়ে । রাজধানী অন্ধকার করিয়া চলিলাম কি ?

ল । প্রায় । বোধ হয় এখন পুলিষ আপিস উঠিয়া যাইবে ।

অ । বোধ হয় । আর কেহ সুখী হউক না হউক, তুমি হইবে ।

লবঙ্গ চুপ করিয়া রহিল ।

আমি তখন, ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া, লবঙ্গকে বলিলাম, "আমি একটি কথা জি-

জ্ঞাসা করিবার জন্যই, তোমার সঙ্গে এ সাক্ষাতের প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমি সরলান্তঃকরণে জিজ্ঞাসা করিব, তুমিও সরলান্তঃকরণে উত্তর দিবে। আমি এই কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া গেলে, তুমি কি যথার্থই সুখী হও?"

ল। সরলান্তঃকরণেই উত্তর দিব—যথার্থই সুখী হই। কেন না, তোমাকে যেমন করিতে চাহি, তুমি সেরূপ হইলে না। অতএব তোমাকে না দেখিলেই ভাল থাকি।

আ। তুমি আমাকে কিরূপ দেখিতে চাও?

লবঙ্গ, কয়েকটা কথায় এক ঋষির চিত্র আঁকিল—জিতেন্দ্রিয়, অস্বার্থপর, পরোপকারী, বৈরাগী,—আমি বলিলাম,

"আমি তোমার কে, যে তুমি আমাকে ভাল করিতে চাও? আমি তোমার কে, যে তুমি আমাকে ভাল না দেখিলে দুঃখিত হও?"

ল। তুমি আমার কে? তা ত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—

লবঙ্গলতা আর কিছু বলিল না। আমি ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া, বলিলাম,

"যদি লোকান্তর থাকে তবে?"

লবঙ্গলতা বলিল, "আমি স্ত্রীলোক—সহজে দুর্ব্বলা। আমার কত বল দেখিয়া তোমার কি হইবে? আমি ইহাই বলিতে পারি আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।"

আমি বড় বিচলিত হইলাম, বলিলাম, "আমি সে কথায় বিশ্বাস করি। কিন্তু একটী কথা আমি কখন বুঝিতে পারিলাম না। তুমি যদি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তবে আমার গায়ে চিরদিনের জন্য এ কলঙ্ক লিখিয়া দিলে কেন? এ যে মুছিলে যায় না—কখন মুছিলে যাইবে না।"

লবঙ্গ, অধোবদনে রহিল। ক্ষণেক ভাবিল। বলিল,

"তুমি কুকাজ করিয়াছিলে, আমিও বালিকা বুদ্ধিতেই কুকাজ করিয়াছিলাম। যাহার যে দণ্ড, বিধাতা তাহার বিচার করিবেন,—আমি বিচারের কে? এখন সে অনুতাপে আমার—কিন্তু সে সকল কথা না বলাই ভাল। তুমি আমাকে সে অপরাধ ক্ষমা করিবে?"

আমি। তুমি না বলিতেই আমি ক্ষমা করিয়াছি। ক্ষমাই বা কি? উচিত দণ্ড করিয়াছিলে—তোমার অপরাধ নাই। আমি আর আসিব না—আর কখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। কিন্তু তুমি কখন যদি ইহার পরে শোন যে অমরনাথ আর কুচরিত্র নহে, তবে তুমি আমার প্রতি একটু—অণুমাত্র—স্নেহ করিবে?

ল। তোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব।

আমি। না, আমি সে স্নেহের ভিখারী আর নহি। তোমার এই সমুদ্রতুল্য হৃদয়ে কি আমার জন্য এতটুকু স্থান নাই?

ল। না—যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।

আবার "ইহলোকে।" এই কথা আর সেই কথা—আমি যেমন তোমায় চাই—তুমি তেমন নও। যাক—আমি লবঙ্গের কথা বুঝিলাম কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু লবঙ্গ আমার কথা বুঝিল না।

আমি বলিলাম, "আমার যাহা বলিবার অবশিষ্ট আছে তাহা বলিয়া যাই। রজনী আমাকে তাহার সম্পত্তি লিখিয়াদিয়াছিল। সে দানপত্র এই। আমি রজনীর বিষয় পরিত্যাগ করিতেছি। এই সে দানপত্র তোমারই সম্মুখে নষ্ট করিতেছি।"

আমি সেই দানপত্র, বাহির করিয়া, লবঙ্গের সম্মুখে বিনষ্ট করিলাম।

লবঙ্গ বলিল, "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন! আমি তোমাকে অনর্থক বিশ্বাস করি নাই। কিন্তু এ দানপত্র রেজিষ্টরী হইয়াছিল কি?"

আমি। হইয়াছিল।

ল। শুনিয়াছি, রেজিষ্টরী হইলে আর একটা নকল সরকারিতে থাকে।

আমি। এ দানপত্রেরও তা আছে। এই জন্য আমি আর একখানা দানপত্রে কাল দস্তখত করিয়া রেজিষ্টরী করিয়া আনিয়াছি। ইহার দ্বারা আমার সমুদায় স্থাবরসম্পত্তি আমি দিতেছি।

ল। কাহাকে?

আমি। যে রজনীকে বিবাহ করিবে তাহাকে।

ল। তোমার সমুদয় স্থাবর সম্পত্তি?

"হাঁ।"

ল। রজনী যাহা তোমাকে দিয়াছিল তাহা তোমার তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়াই উচিত। এক্ষণে তোমার মতি ফিরিয়াছে বলিয়া, তুমি তাহার বিষয় তাহাকে ফিরাইয়া দিতেছ। ইহা আমার পক্ষে বিস্ময়কর বটে, কিন্তু তবু বুঝিতে পারি। কিন্তু আমি জানি তদ্ভিন্ন, তোমার নিজেরও অনেক জমীদারী আছে। তাহাও রজনীর স্বামীকে দিতেছ কেন?

আমি সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলাম, "তুমি এই দানপত্র এক্ষণে তোমার কাছে অতি গোপনে রাখিবে। যতদিন না রজনীর বিবাহ হয়, ততদিন ইহার কথা প্রকাশ করিও না। বিবাহ হইয়া গেলে, রজনীর স্বামীকে দানপত্র দিও। যদি ইহার অন্যথা কর, তবে তোমার স্বামীর শপথ লাগিবে।"

এই কথা বলিয়া, ললিত লবঙ্গলতার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, দানপত্র আমি তাহার নিকট ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলাম। আমি সকল বন্দবস্ত ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম—আমি আর বাড়ী গেলাম না। একবারে ষ্টেসনে

গিয়া বাষ্পীয় শকটারোহণে কাশ্মীর যাত্রা করিলাম।

দোকানপাট উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ইহার দুই বৎসর পরে, একদা ভ্রমণ করিতে২ আমি ভবানীনগর গেলাম। শুনিলাম যে মিত্র বংশীয় কেহ তথায় আসিয়া বাস করিতেছেন। কৌতূহল প্রযুক্ত আমি দেখিতে গেলাম। দ্বারদেশে শচীন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

শচীন্দ্র আমাকে চিনিতে পারিয়া, নমস্কার আলিঙ্গন পূর্ব্বক আমার হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া উত্তমাসনে বসাইলেন। অনেকক্ষণ তাঁহার সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন হইল। তাঁহার নিকট শুনিলাম, যে তিনি রজনীকে বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু আমার সঙ্গে রজনীর যথার্থই বিবাহ হইয়াছিল, পাছে কলিকাতার লোক কেহ এইরূপ মনে করে, এই ভাবিয়া, তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভবানী নগরে বাস করিতেছেন। ভবানী নগরেও কতকগুলি লোক তাঁহাকে লইয়া আহার করে না, কিন্তু তিনি তাহাতে কিছু মাত্র দুঃখিত নহেন। তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা কলিকাতাতেই বাস করিতেছেন।

আমার নিজসম্পত্তি, এবং রজনীর সম্পত্তির কিয়দংশ প্রতিগ্রহণ করিবার জন্য শচীন্দ্র আমারে বিস্তর অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বলা বাহুল্য যে আমি তাহাতে স্বীকৃত হইলাম না। শেষে শচীন্দ্র রজনীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমারও সে ইচ্ছা ছিল। শচীন্দ্র আমাকে অন্তঃপুরে রজনীর নিকট লইয়া গেলেন।

রজনীর নিকট গেলে, সে আমাকে প্রণামপূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণ করিল। আমি দেখিলাম, যে ধূলিগ্রহণ কালে, পদস্পর্শ জন্য, অন্ধগণের স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী সে ইতস্ততঃ হস্তসঞ্চালন করিল না, এককালেই আমার পাদস্পর্শ করিল। কিছু বিস্মিত হইলাম।

সে আমাকে প্রণাম করিয়া, দাঁড়াইল। কিন্তু মুখ অবনত করিয়া রহিল। আমার বিস্ময় বাড়িল। অন্ধদিগের লজ্জা চক্ষুর্গত নহে। চক্ষে চক্ষে মিলনজনিত যে লজ্জা তাহা তাহাদিগের ঘটিতে পারে না বলিয়া, তাহারা দৃষ্টি লুকাইবার জন্য মুখ নত করে না। একটা কি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, রজনী মুখ তুলিয়া আবার নত করিল, দেখিলাম—নিশ্চিত দেখিলাম—সে চক্ষে কটাক্ষ!

জন্মান্ধ রজনী কি এখন তবে দেখিতে পায়? আমি শচীন্দ্রকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, এমত সময়ে শচীন্দ্র আমাকে বসিবার আসন দিবার জন্য রজনীকে আজ্ঞা করিলেন। রজনী একখানা কারপেট লইয়া পাতিতেছিল—যেখানে পাতিতেছিল সেখানে অল্প একবিন্দু জল পড়িয়াছিল; রজনী আসন রাখিয়া,

অগ্রে অঞ্চলের দ্বারা জল মুছিয়া লইয়া আসন পাতিল। আমি বিলক্ষণ দেখিয়াছিলাম, যে রজনী সেই জলস্পর্শ না করিয়াই আসন পাতা বন্ধ করিয়া জল মুছিয়া লইয়াছিল। অতএব স্পর্শের দ্বারা কখনই সে জানিতে পারে নাই, যে সেখানে জল আছে। অবশ্য সে জল দেখিতে পাইয়াছিল।

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম,

"রজনি এখন তুমি কি দেখিতে পাও?"

রজনী মুখনত করিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "হাঁ।"

আমি বিস্মিত হইয়া শচীন্দ্রের মুখপানে চাহিলাম। শচীন্দ্র বলিলেন, "আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় না হইতে পারে, এমন কি আছে? আমাদিগের ভারতবর্ষে চিকিৎসা সম্বন্ধে কতকগুলি অতি আশ্চর্য্য প্রকরণ ছিল—সে সকল তত্ত্ব ইউরোপীয়েরা বহুকাল পরিশ্রম করিলেও আবিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। চিকিৎসা বিদ্যায় কেন, সকল বিদ্যাতেই এইরূপ। কিন্তু সে সকল, এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, কেবল দুই একজন সন্ন্যাসী, উদাসীন প্রভৃতির কাছে, সে সকল লুপ্তবিদ্যার কিয়দংশ অতি গুহ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আমাদিগের বাড়ীতে একজন সন্ন্যাসী কখন২ যাতায়াত করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে ভাল বাসিতেন। তিনি যখন শুনিলেন আমি রজনীকে বিবাহ করিব, তখন বলিলেন, 'শুভদৃষ্টি হইবে কি প্রকারে? কন্যা যে অন্ধ।' আমি রহস্য করিয়া বলিলাম, 'আপনি অন্ধত্বের আরোগ্য করুন।' তিনি বলিলেন, 'করিব—এক মাসে।' ঔষধ দিয়া, তিনি একমাসে রজনীর চক্ষে দৃষ্টির সৃজন করিলেন।"

আমি আরও বিস্মিত হইলাম, বলিলাম "না দেখিলে, আমি ইহা বিশ্বাস করিতাম না। ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে, ইহা অসাধ্য।"

এই কথা হইতেছিল, এমত সময়ে এক বৎসরের একটি শিশু, টলিতে টলিতে, চলিতে চলিতে, পড়িতে পড়িতে, উঠিতে উঠিতে সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশু আসিয়া, রজনীর পায়ের কাছে দুই একটা আছাড় খাইয়া, তাহার বস্ত্রের একাংশ ধৃত করিয়া টানাটানি করিয়া উঠিয়া, রজনীর আঁটু ধরিয়া তাহার মুখ পানে চহিয়া, উচ্চহাসি হাসিয়া উঠিল। তাহার পরে, ক্ষণেক আমার মুখপানে চাহিয়া, হস্তোত্তোলন করিয়া আমাকে বলিল, "দা!" (যা!)

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে এটি?"

শচীন্দ্র বলিলেন, "আমার ছেলে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহার নাম কি রাখিয়াছেন?"

শচীন্দ্র বলিলেন, "অমর প্রসাদ।"

আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না।

সমাপ্তঃ।

শৈশবসহচরী।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

উন্মাদিনী।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে লিখিত ঘটনার দুই এক দিবস পরে সুবর্ণপুর গ্রাম অন্ধকারময় হইল। রাস্তাঘাটে জনমানব দেখা যায় না—কেবল কখনং পুলিষ কর্ম্মচারিগণ গ্রামের এখানে ওখানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। গ্রামবাসীরা তাহাদিগের ভয়ে বাটীর দ্বার খুলিতে সাহস করেন না, কিছু দিনের জন্য হাট বাজার বন্ধ হইল। তন্নিবন্ধন গ্রামবাসীদিগের ক্রমেং আহারও বন্ধ হইতে লাগিল। সুবর্ণপুর গ্রামের প্রান্তবাহিনী জাহ্নবীও কিছুদিনের জন্য শোভাহীনা হইল। যে সকল যুবতী সর্ব্বদা গ্রীবানিমজ্জিত করিয়া তাঁহার হৃদয়ে রাজহংসীর ন্যায় বিচরণ করিত, তাহাদিগের আর সে জাহ্নবীকূলে দিবসে দেখিতে পাওয়া যায় না—তবে যেসকল কুলকামিনীগণ সূর্য্যদেবকে মুখ দেখাইতে লজ্জা পান, এবং যাঁহারা তজ্জন্য যামিনী প্রভাত না হইতে হইতেই স্নান করিয়া থাকেন কেবলমাত্র তাঁহারাই এক্ষণে জাহ্নবীর শোভাবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। এমত অবস্থায় একদা অতি প্রত্যূষে দুইটি অবগুণ্ঠনবতী যুবতী একটি পরিচারিকা সমভিব্যাহারে অতি দ্রুতপাদবিক্ষেপে ভাগীরথী তীরাভিমুখে কথোপকথন করিতেং গমন করিতেছিল।

"বিনোদিনী এখনও রাত আছে?"

"হ্যাঁ এখনও ঢের রাত, আমার গা ছমছম্ কর্‌চে—ঐ দেখ এখন শুখতারাও উঠে নি। চন্দ্র দিদি ফিরে যাই চ।"

"দূর হ! এতদূর এসে আবার ফিরে যাবি কেন—ভয় কি লো।"

বি। (চুপি চুপি) আজ বড় দিদির ঘরে গামছা আন্‌তে গিয়ে এক ভয়ানক বিকটাকার মানুষ দেখে আমার সেই অবধি বড় ভয় হয়েছে—

চ। সে কি? কুমুদিনীর ঘরে—

বি। হ্যাঁ।

চ। কখন দেখিলি?

বি। এই মাত্র।

চ। এতক্ষণ বলিস্‌নি যে?

বি। বড় দিদি বল্‌তে নিষেধ করেছিল।

চ। তবে বল্লি যে।

বি। বল্‌তে কি চন্দ্র দিদি যতক্ষণ এই কথাটা আমার পেটের ভিতর ছিল ততক্ষণ আমার বড় কষ্ট হচ্ছিল—আমার মাথা খাস কাকেও বলিস্‌নে, আমার ভগিনীপতিকেও না—

চ। না তা বল্‌ব না—তুই কাকে দেখ্‌লি—

বি। আমি তাকে চিনি না—কিন্তু মুখ দেখে বোধ হইল যেন তাকে কখন কোথায় দেখেচি।

চ। কেমনতর দেখ্‌তে।

বি। দেখতে সন্ন্যাসীর মত—বুক-পর্য্যন্ত পাকা দাড়ি। খুব বড়২ চোক, গেরুয়া বসন পরা—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

চন্দ্র। কি করিতেছিল?

বি। বড় দিদির শিওরে বসে মাথায় হাত বুলাইতে ছিল; আমি ঢুকিবামাত্র চমকিয়া উঠিয়া অন্য দ্বার দিয়া পলাইল।

চন্দ্র। কুমুদিনী কি করিতেছিল?

বি। তাঁর এখন একটু জ্বর ছেড়েচে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম দিদি ও কে? তিনি বলিলেন এক সন্ন্যাসী আমার চিকিৎসা করিতেছেন, জ্বর বিশ্রাম কালে আমাকে দেখিতে এসেছিলেন, তারপর আমি যখন গামছা লইয়া ফিরে আসি তখন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বিনোদ, যে সন্ন্যাসীকে এখানে দেখিলি, কাহাকেও বলিসনে কাকাও যেন না জানতে পারেন।

চন্দ্রমুখী। "বাবারে বলিতে নিষেধ করিয়াছে।" এই বলিয়া চন্দ্রমুখী অন্যমনস্ক হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই যুবতীদ্বয় গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীর শোভা দেখিয়া দাঁড়াইল। বিশালহৃদয়া জাহ্নবী নক্ষত্র কিরণে ঝিক্‌মিক্ করিতে২ দূরপ্রান্তে ধূমময়ে মিশিয়াছে। নদীর অপর পারে রজনীর অস্পষ্ট আলোকে অন্ধকারময় দেখাইতেছিল। অদূরবর্ত্তিনী ক্ষুদ্র২ তরণী হইতে দীপালোক নদীজলে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল, আর শীতল নৈশবায়ু নদীহৃদয় আন্দোলিত করিয়া, যুবতীদ্বয়ের স্বেদবিজড়িত অলকাগুচ্ছের চাঞ্চল্য বিধান করিতেছিল। যুবতীদ্বয় বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়া কিছুক্ষণ তীরে দাঁড়াইয়া দূরে একটি ক্ষুদ্র তরীহইতে কে গাহিতেছিল তাহাই শুনিতেছিল—তৎপরে আস্তে২ ঘাটে নামিল। তাহাদিগের পূর্ব্বে দুইএকটি স্ত্রীলোক আসিয়া ঘাটে স্নান করিতেছিল, তাহাদিগের মধ্যে এক জন বাচাল প্রাচীনা চন্দ্রমুখীকে জিজ্ঞাসা করিল,

"কুমুদিনী কেমন আছে?"

চন্দ্র। কুমু এখন আছে ভাল। এই মাত্র জ্বর ছেড়েছে।

প্রাচী। আর সে বাবুটি কেমন আছে?

চন্দ্র। তা বিশেষ জানি না—শুনিয়াছি বড় জ্বর—দিবারাত্রি বেহুঁসে আছে।

প্রা। আচ্ছা, কুমুদিনীর ও বাবুটির একসময় জ্বর হোল কেন?

চন্দ্র। (ক্রুদ্ধভাবে) কেন তা কে জানে—কুমুদিনীর জ্বর হোল স্বর্ণের শোকে, বাবুটির জ্বর হোল ডাকাতেরা মাথায় মেরেছিল বলে।

প্রা। বাবুটি তোমাদের বাটীতে কেন?

চন্দ্রমুখী উত্তর করিল না।

বিনোদিনী বলিয়া উঠিল, "ও গো সে বাবুটি আর কেহ নয়—আমাদের রমণ

পুরের খুড়ীর জামাই, তা আমাদের বাড়ী থাক্‌বে না তো কোথা যাবে?”

প্রা। কার, প্রমদার স্বামী?—আহা প্রমদা মোরে গেছে—ছোঁড়া কি আবার বিয়ে করেছে?

চন্দ্রমুখী বলিল “বিয়ে হয় নি কিন্তু হবে—”

প্রা। কার সঙ্গে?

চন্দ্র। তোমার সঙ্গে।

প্রা। (হাসিয়া) তা তোমরা এমন সব যুবতী শ্যালী থাকতে আমার সঙ্গে কেন। কুমুদিনী এমন সুন্দর কড়ে রাঁড়ি, তাতে আবার বাপ বিধবা বিয়ে না দিতে পেরে বিবাগী হয়েছে। কেন কুমুদিনী বিয়ে করুক্ না, তা হলে বাপ ঘরে ফিরে আস্‌বে।

চন্দ্রমুখী উত্তর করিলেন না—বিনোদিনী “পোড়ার মুখ তোমার” বলিয়া জলে নামিলেন কিন্তু পশ্চাৎ হইতে তাহাদিগের পরিচারিকা চুপি চুপি প্রাচীনার কানে২ বলিল, “তা আশ্চর্য্য নয়।”

প্রাচীনাও তদ্রূপ মৃদুস্বরে বলিলেন “কেন লো?”

পরিচারিকা উত্তর করিল “জামাই বাবু প্রলাপে দিবারাত্র বড়দিদির কথা বল্যে থাকেন এবং বড়দিদিও জ্বর ত্যাগ হল্যে জ্ঞান হলেই জামাইবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করে।”

“তাতে বিয়ে হবে কেমন করে জান্‌লি?”

পরিচারিকা বলিল,

“তা তুমি বুঝে নাও।”

প্রাচীনা বলিল “তাত বুঝলুম এখন চুপ কর।” তৎপরে উচ্চৈঃস্বরে পরিচারিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,

“বিদু তুই কি রজনীবাবুর বাড়ীতে আর থাকিস্ না?”

বি। আর কার জন্যে থাকিব। যে স্বর্ণের জন্য ছিলাম সে গলিয়া অঙ্গার হইয়াছে—এখন আবার সাবেক মুনিব বাড়িতে আছি। এই বলিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিল। বিনোদিনী ও চন্দ্রমুখী স্বর্ণকে মনে পড়াতে অবিশ্রান্ত নয়ন বারি জাহ্নবীর জলে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রাচীনা অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে২ বলিল “আহা স্বর্ণ কি সুন্দর মেয়েছিল যেমন রূপ তেমনি গুণ—অমন মেয়ে কলিতে হয় না—আপনার প্রাণ দিয়া স্বামীকে বাঁচালে।”

বিধু বলিল, “আর তেমনি উপযুক্ত পাত্রে পড়েছিল, রজনী বাবুর মতন বাবু দেখিনি।”

পশ্চাৎ হইতে একজন চীৎকার করিয়া বলিল, “চুপ কর হারামজাদি! রজনীর মতন বাবু দেখিস্‌নি? সে আবার বাবু? কে তাকে বাবু কল্লে, কে তাকে এত ধনের অধিপতি কল্লে? সেও আমি। পাষণ্ড! নেমকহারাম! এখন আমায় চিন্‌তে পারে না, বলে আমি পাগল হু! হু হু! আমি পাগল! ছি! ছি! ছি!”

রমণীগণ দেখিল তটোপরি দাঁড়াইয়া গলিতবসনা আলুলায়িত কৃষ্ণকেশা, মধ্য-

বয়সী সুন্দরী, একটি স্ত্রীলোক রোষভরে হাসিতেছে। সেই অবিরত বায়ুতাড়িত তরঙ্গিনীর উপকূলে অস্পষ্ট উষালোকে সেই উন্মাদিনীর মূর্ত্তি দেখিয়া রমণীগণ চমকিত হইল। বিনোদিনী ভীতা হইয়া চন্দ্রমুখীর অঞ্চল ধরিয়া তাহার পশ্চাৎ লুকাইল।

উন্মাদিনীর হাসি থামিল। কিছু কাল সকলেই নিস্তব্ধ, তৎপরে উন্মাদিনী সেই অন্ধকারময় জাহ্নবীর উপকূল আলোড়িত করিয়া অতি মধুর স্বরে গায়িতে লাগিল—

ডুবিতে এসেছি আমি জাহ্নবী সলিলে।
কি কাজ জীবনে মম চিরদিন ভাবিলে॥
ধন জন ছিল যত প্রিয়তম পতি সুত
একে২ সবে আসি ডুবেগেছে জলে।

উন্মাদিনীর চাঞ্চল্য দেখিয়া বয়ঃকনিষ্ঠা বিনোদিনী ভীতা হইল এবং তাহার ব্যস্ততা হেতু চন্দ্রমুখী তাহার সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। যখন বিনোদিনী উন্মাদিনীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন তখন উন্মাদিনী তাহাকে দেখিয়া বলিল "হুহু! তুমি বড় সুন্দরী—সাবধান তোমার বড় বিপদ!" বিনোদিনী ভীতা হইয়া চন্দ্রমুখীর পশ্চাৎ২ চলিল—পরে কূল হইতে উপরে গিয়া বলিল,"চন্দ্রদিদি মাগি কিভয়ানক পাগল! কিন্তু কি সুন্দরী ছিল, এখনও কত রূপ রয়েছে।"

রমণীগণ চলিয়া গেল, কেবল ঘাটে একাকিনী পূর্ব্বোল্লিখিতা প্রাচীনা রহিল; আর উপকূলে উন্মাদিনী ছিল। প্রাচীনা আস্তে২ আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "হাঁগা রজনীকে কেমন করে তুমি বড় মানুষ কল্লে? সে যে তার বাপের বিষয়ে বড়মানুষ হয়েছে।"

উন্মাদিনী উচ্চহাসি হাসিয়া বলিল, "তার বাপ! তার বাপ্‌কে? রমাকান্ত! হু হু! না! না! সে কেবল আমি জানি। হি! হি!" এই বলিয়া উন্মাদিনী বেগে সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। বর্ষীয়সী চমকিত হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সেই সন্ন্যাসীর পরিচয়।

ডাকাতি হাঙ্গামা কিছুদিন পরে নিবিয়া গেল। তৎপরিবর্ত্তে আর একটি নূতন ঘটনা উপস্থিত হইল। তাহা লইয়া সুবর্ণপুরে পাড়ায় পাড়ায় গণ্ডগোল হইতে লাগিল। এই আখ্যায়িকার প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে যে কুমুদিনী অতি শৈশবে বিধবা হওয়াতে তাঁহার পিতা হরিনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয়বার তাঁহার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে উদ্যোগে সফল হইতে না পারিয়া উদাসীন হইয়াছিলেন। এক্ষণে হঠাৎ হরিনাথ মুখোপাধ্যায় সন্ন্যাস আশ্রম ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং প্রচার করিলেন, যে তাঁহার কন্যা কুমুদিনীর পুনরায় বিবাহ দিবেন।

বোধ হয় বলা বাহুল্য, বিনোদিনী যে

সন্ন্যাসীকে কুমুদিনীর শিয়রে বসিতে দেখিয়াছিলেন তিনি হরিনাথ মুখোপাধ্যায়। অপত্যস্নেহের অনুরোধে সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়াও আপন গৃহে প্রবেশ করিয়া কুমুদিনীকে গোপনে দেখিতে আসিয়াছিলেন। কুমুদিনী প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। পশ্চাৎ চিনিতে পারিয়া স্বর্ণেরশোক ভুলিয়া গেলেন, এবং তাঁহার পিতাকে সন্ন্যাস আশ্রম ত্যাগ করিয়া গৃহে আসিতে নানা প্রকারে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে প্রতিদিন রাত্রে হরিনাথ মুখো কুমুদিনীকে গোপনে দেখিতে আসিতেন, এবং প্রতিদিন রাত্রেই কুমুদিনী তাঁহাকে ঐরূপ অনুরোধ করিতেন। তৎপরে কুমুদিনী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলে একদিন রাত্রে হরিনাথ, কুমুদিনী ও তাহার জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার গৃহিণীকে বলিলেন, "দেখ সংসারে আমার দুই কন্যা ভিন্ন কিছুই ছিল না। যদিও তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলাম, তথাচ আমি সর্ব্বদাই তাহাদিগকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না। সেজন্য যাহা কিছু ঈশ্বরের উপাসনা করিতাম তাহা এ অঞ্চলে থাকিয়া করিতাম, কিন্তু যে দিবস হইতে শুনিলাম যে আমার সোনার প্রতিমা স্বর্ণপ্রভাকে হারাইয়াছি—"বলিতে২ হরিনাথ মুখোর কণ্ঠরোধ হইল—স্ত্রীলোকগণও কাঁদিয়া উঠিলেন, তৎপরে সকলে কিঞ্চিৎ স্থিরতা লাভ করিলে সন্ন্যাসী পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "যে দিবস শুনিলাম স্বর্ণপ্রভাকে হারাইয়াছি, সেই দিবস হইতে ঈশ্বরোপাসনায় আর মন নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না। সর্ব্বদা ইচ্ছা হইতে লাগিল যে কুমুদিনীকে দেখি, এবং কুমুদিনীর পীড়ার সংবাদ শুনিয়া সে ইচ্ছা বলবতী হইল। কুমুকে গোপনে দেখিতে আসিলাম, প্রতি রাত্রে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম, আমি অপত্যস্নেহের স্রোতে যে বাঁধ বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম তাহা ভাসিয়া গেল—আমার এখন আশ্রমবাসী হইতে ইচ্ছা হয়—" এইকথা বলিবামাত্র কুমুদিনী এবং তাহার জননী উভয়ে সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। কুমুদিনী বলিল, "বাবা আমাদের আর কেহ নাই—"

সন্ন্যাসীর দরবিগলিত নয়নাশ্রু কুমুদিনীর মস্তকে পড়িতে লাগিল। অনেক ক্ষণের পর বলিল, "আমি আর তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইব না। যদি তোমরা আমার একটী অনুরোধ রাখ।" কুমুদিনী বলিলেন, "বাবা কি অনুরোধ—তোমার অনুরোধ রাখ্‌ব না! বাবা তুমি যে আমাদের সব!" হরিনাথ তাঁহার পত্নীকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন, "আমি কুমুদিনীর পুনরায় বিবাহ দিব, তোমরা কেহ আপত্তি করিতে পারিবে না।" কুমুদিনীর মাতা বলিলেন, তোমার মেয়ে, তুমি বিবাহ দিবে, কেহ আপত্তি করিবে না। আমি একবার আপত্তি করিয়া তোমায় হারাইয়াছিলাম—আর

এজন্মে তোমার মতে অমত করিব না।” হরিনাথ বলিলেন “আমি আমার কন্যার এবিষয়ে মত জানতে চাই।” কুমুদিনী লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিলেন। মুখ রক্তিমাবর্ণ হইল—মস্তকে ঈষৎ অঞ্চল টা নিলেন—কোন উত্তর করিতে পারিলেন না কিন্তু সন্ন্যাসী পুনঃপুনঃ উত্তর চাওয়াতে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন “বাবা যদি প্রাণ দিলেও তুমি ঘরে ফিরে এস, তবে তাও আমি দিব।” হরিনাথের আহ্লাদের সীমা রহিল না; কাঁদিতে২ কুমুদিনীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—সে রাত্রেই গৃহস্থাশ্রমী হইলেন। কোন গোপনীয় কারণেই হউক আর পিতৃস্নেহ বশতঃই হউক কুমুদিনী অগত্যা বিবাহ করিতে স্বীকৃতা হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

তৃষিতচাতক—করকাভিঘাতী মেঘ।

হরিনাথ বাবুর গৃহে প্রত্যাগমন ও কুমুদিনীর বিবাহের সংবাদ এক দিবস অপরাহ্ণে গ্রামপ্রান্তে একটি উদ্যানে বসিয়া—রজনীকান্ত শুনিলেন। এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহার মনোমধ্যে ভয়মিশ্রিত আশার সঞ্চার হইল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন—কি চিন্তা? তাঁহার কুমুদিনী ভিন্ন কি অন্য চিন্তা ছিল? এই নূতন সংবাদে আজ সেই চিন্তা অতি গাঢ়তর হইল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল তথাপি রজনী সেইখানে বসিয়া ভাবিতেছেন—উদ্যানের পশ্চাতে একটী অতি বিস্তৃত তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড; তন্মধ্যে দশ বারটি গাভি বিচরণ করিতেছে। একটী রাখাল বিচিত্র স্বরে গাভিদিগের গৃহে প্রত্যাগমনের সঙ্কেত করিতেছে। রজনীকান্ত সেই মাঠপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বসিয়া আছেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া রাত্রি হইল—চন্দ্রোদয় হইল—পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া যামিনী মধুর হাসি হাসিয়া অন্ধকারের কালো সাড়ী—খাসা ফুলদার সেই কেরেপের সাড়ী অপসৃত করিয়া, ঘোমটা খুলিয়া, মুখ তুলিয়া হাসিল—সে কাণ্ড দেখিয়া, রজনীর বাগানের ফুল, গাছের পাতা, মাঠের ঘাস, সরোবরের জল, সকলেই সকলের মুখ চাওয়াচায়ি করিয়া হাসিয়া উঠিল। তৎসহিত রজনীর হৃদয়ও হাসিল, কিন্তু চিন্তা আরও গাঢ়তর হইল। ক্রমে রাত্রি এক প্রহর হইল, তথাচ তাঁহার সংজ্ঞা নাই, একজন পরিচারক কি বলিতে আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইল। কিন্তু তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আস্তে২ পলাইল। রজনী যে কি চিন্তা করিতেছিলেন তাহা আমাদের পর্য্যায় ক্রমে অনুসরণ করিয়া প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা বলা আবশ্যক যে তিনি শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন যে তাঁহার শ্বশুর হরিনাথ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করা এবং সেই উপলক্ষে যদি কুমুদিনীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে পারেন তবে তাহা কর্ত্তব্য। কুমুদিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কেমন করিয়া কথা কহিবেন এবং কি কথা কহিবেন আর কি প্রকারেই বা

তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিবেন সেই চিন্তায় এতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছিলেন। মনের ব্যস্ততাহেতু সেই রাত্রেই হরিনাথ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত বিবেচনা করিলেন। রজনী দ্রুতপাদবিক্ষেপে চলিলেন, অতি অল্প ক্ষণেই হরিনাথ বাবুর গৃহে আসিয়া পৌঁছিলেন। একজন দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "বড়বাবু কোথায়?" সে বলিল "বড়বাবু ও শরৎ বাবু খিড়কির বাগানে বেড়াইতেছেন।" রজনী জিজ্ঞাসা কবিলেন "শরৎ বাবু কে?" দ্বারবান উত্তর করিল "শরৎ বাবু, বাবুদের সম্বন্ধে জামাতা—আপনার বাড়ীতে যিনি ডাকাইতের দ্বারা আহত হইয়াছিলেন।" এই কথা শুনিয়া রজনী খিড়কির উদ্যানাভিমুখে চলিলেন। উদ্যানে প্রবেশ কবিয়া দূর হইতে দেখিলেন, একটি পুষ্করিণীর প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলীর একটী সোপানে তাহার দিকে পশ্চাৎ কবিয়া দুই ব্যক্তি বসিয়া চন্দ্রালোকে কথোপকথন কবিতেছিল। পুষ্করিণীর চারিধারে বৃহৎ কামিনীবৃক্ষের কেয়ারি ছিল। রজনী পুষ্করিণীর ঘাটের নিকট আসিয়া দেখিলেন দুইজনের এক জন কুমুদিনী আর অন্যজন এক যুবা পুরুষ। যে যুবা,সেই রাত্রে ডাকাত দিগের হস্ত হইতে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল,সেই যুবা। রজনী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় এক কামিনী বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইলেন। কিন্তু সেইস্থানে যাহা শুনিলেন তাহাতে তিনি প্রস্তরবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। শুনিলেন যে যুবক অতি ব্যগ্রতাসহকারে কুমুদিনীকে কি বলিতেছে; কিন্তু তিনি তাহার কিছুই উত্তর করিতেছেন না—শরৎকুমার কুমুদিনীকে বলিল "তবে কেন—কেন তুমি এই তিনমাস ধরিয়া পীড়িত অবস্থায় আমার জন্য যত্ন প্রকাশ করিতে—কেন তুমি আমায় প্রতিদিবস দেখা দিতে—তুমি কি জানিতে না তোমার সৌন্দর্য্য দেখিবামাত্র লোকে মোহিত হয়—তুমি জানিয়া শুনিয়াও কেন আমার এদুর্দ্দশা করিলে? কেন আমায় চির অভাগা করিলে? ইহার দায়ী তুমি—কুমুদিনী বল—বল,—বল, আমায় বিবাহ করিবে কি না—"

উত্তর নাই; কুমুদিনী মুখাবরণ করিয়া সোপান প্রান্তে বসিয়া আছেন। শরৎকুমাব পুনরায় বলিতে লাগিলেন "কুমুদিনী আমার অল্প বয়স—২২ বৎসর মাত্র —আমার আরও বহুকাল বাঁচিবার আশা আছে কিন্তু তোমার এক কথায় বহুকাল বাঁচিবার আশা একেবারে ঘুচিবে—একবার তুমি বল আমি সংসারে থাকিব কি না।" কুমুদিনী আর থাকিতে পারিলেন না—অস্ফুটস্বরে মুখাবনত করিয়া বলিলেন "থাক" এবং তৎক্ষণাৎ লজ্জাকুল বেগে সে স্থান হইতে উদ্যানের অন্যদিকে গেলেন। শরৎকুমারের হৃদয় সুখে উছলিয়া উঠিল। শরৎকুমার কুমুদিনীর পশ্চাৎ অনুসরণ করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা

করিয়া, গৃহাভিমুখে চলিল। হাসিতে২ চলিল—আর কামিনী বৃক্ষের তলায় রজনীকান্ত দাঁড়াইয়া কি করিল? হাসিতে লাগিল?

তিনি বজ্রাঘাতব্যথিত ব্যক্তির ন্যায় মুমূর্ষু হইয়া, কামিনী বৃক্ষের একটি ডাল অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সে স্থান অসহ্য হইল, ভগ্নহৃদয় হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। আসিতে আসিতে উদ্যানের মধ্যে তাঁহার সেই মনোহারিণীর দেখা পাইলেন; পুনরায় প্রস্তরবৎ সেইখানে দাঁড়াইলেন। কুমুদিনী গজেন্দ্র গমনে চন্দ্রালোকে হাসিতে২ আসিতে ছিল। রজনী দেখিলেন কুমুদিনী কোন অসীমসুখে চঞ্চল হইয়াছেন, এবং তজ্জন্য তাঁহার লাবণ্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। সে রূপ দেখিয়া রজনী চক্ষু মুদিলেন। ইচ্ছা হইল কুমুদিনীর সম্মুখে সেই খানে তাঁহার মৃত্যু হয়—কুমুদিনী হাসিতে২ তাহার নিকট আসিল। রজনী মুখ নত করিয়া রহিলেন—সে লাবণ্য তাঁহার অসহ্য হইল। কুমুদিনী অতি মধুর স্বরে বলিল ভগিনীপতি, এস গৃহে চল; এই বলিয়া হস্ত ধরিল। রজনীর শরীর কাঁপিয়া উঠিল, হস্ত কাঁপিতে লাগিল, কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিল ভগিনীপতি কাঁপিতেছ কেন? রজনী উত্তর করিলেন না, কি উত্তর করিবেন? কুমুদিনী উত্তর না পাইয়া তাঁহার মুখপ্রতি দৃষ্টি করিলেন দেখিলেন, মুখ অতি ম্লান, দৃষ্টি মৃত্তিকার প্রতি। কুমুদিনী অতি কোমল স্বরে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন, ভগিনীপতি কাঁপিতেছ কেন? শরীরে কি কোন অসুখ হয়েছে?" রজনী সে আদরের স্বরে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন—এবং বিকৃতস্বরে বলিলেন "শারীরিক অসুখে, না তা নয়।"

কুমু। তবে কেন কাঁপিতেছ?

রজ। কেন কাঁপিতেছি তোমায় কি বলিব কুমুদিনী?

কুমুদিনী পুনরায় সেইরূপ কণ্ঠস্বরে আদর করিয়া বলিল "ভগিনীপতি, আমার বলিবে না ত কাকে বলিবে—আমার মাথা খাও আমায় বল।"

রজ। তুমি কি বুঝিবে কুমুদিনি! তুমি ত কখন নারী রূপের মহিমা দেখিয়া ভুল নাই—যদি কখন জন্মজন্মান্তরে পুরুষ জন্ম ধারণ করিয়া কোন যুবতীর রূপ দেখিয়া মোহিত হও তবে তখন বুঝিতে পারিবে আমি কাঁপিতেছি কেন।"

কুমুদিনী হাসিয়া বলিল "ভগিনীপতি যাহারা স্ত্রীলোকের রূপ দেখিয়া ভুলে, তাহাদিগের কি দিবারাত্র এই প্রকার হাত কাঁপে। তোমার কি দিবারাত্র এই প্রকার হাত কাঁপে?"

রজনী। কুমুদিনি, আজ এক বৎসর যে স্ত্রীলোকের রূপ দেখিয়া ভুলিয়াছি—যাহার রূপ দিবারাত্র শয়নে স্বপনে ধ্যান করিয়া থাকি, সেই আদর করিয়া আজ আমার হাত ধরিয়াছে। এক্ষণে বুঝিলে কুমুদিনি কেন আমার হাত কাঁপিতেছে? হাত কি কুমুদিনি—আমার

হৃদয় কাঁপিতেছে।" কুমুদিনী রজনীর হস্ত ত্যাগ করিলেন, লজ্জায় মুখ রক্তিমাবর্ণ হইল, গৃহে যাইতে দুইএক পদ অগ্রসর হইলেন। রজনী পথ অবরোধ করিলেন, যেন আর কি বলিবেন, কিন্তু কুমুদিনী বলিতে দিল না—অতি মধুর, অতি স্থির, কাতর, অথচ গম্ভীর স্বরে বলিল "তুমি আমার ভগিনীপতি ছিলে—আছ—চিরকাল থাকিবে—কেন না আমার স্বর্ণ আজিও আমার পক্ষে মরে নাই—কখন মরিবে না—এ হৃদয়ে চিরকাল জাগিবে। আমি কি স্বর্ণের স্বামী কাড়িয়া লইব? ছি! যদি আর এ কথা বলিবে, তবে এই কুসুমিত কামিনীর ডালে, এই আঁচল গলায় বাঁধিয়া, তোমারই সম্মুখে মরিয়া স্বর্ণের কাছে গিয়া আশ্রয় লইব।'

রজনী কাঁচা ছেলে। যদি আমাদের মত, বিজ্ঞ লোকের কাছে পরামর্শের জন্য আসিত, তবে আমরা পরামর্শ দিতাম যে বাপু, যা হলো তা হলো, এখন আর ঘেঁটিয়ে কাজ নাই—এখন চখের জল মুছিয়া, ঘরে গিয়া সকাল২ আহার করিয়া, শয়ন কর। কাল সকালে আর কোন একটা সুন্দরী কন্যার সন্ধান করা যাইবে। কিন্তু রজনী কাঁচা ছেলে, অত বিবেচনা না করিয়া বলিয়া বসিল,

"আমি এ উত্তর প্রত্যাশা করিয়াছিলাম।"

কু। যদি তোমার প্রতি আমার কিপ্রকার স্নেহ বুঝিতে পারিয়া এ উত্তর প্রত্যাশা করিয়াছিলে, তবে—কেন আপনার মনে ও রূপ ভাবকে আশ্রয় দিয়াছিলে—

রজ। আমি এতদিন এরূপ উত্তর প্রত্যাশা করি নাই কিন্তু এখন করিয়াছিলাম।

কু। কেন—এখন কিসে?

রজ। আমি আগে বুঝিতে পারি নাই যে আমা হইতে শরৎ কুমার তোমার অনুগ্রহের পাত্র—

কু। (অতি কঠিন স্বরে) আমি জানিতাম রজনী বাবু ভদ্র লোক, কিন্তু তিনি যে ইতরের ন্যায় আড়ি পাতিয়া লোকের গোপনীয় কথা শুনেন তাহা জানিতাম না—বেস করেছেন—কিন্তু আমার সঙ্গে আর কখন যেন সাক্ষাৎ না হয়।"

এই বলিয়া কুমুদিনী ক্রোধে গৃহাভিমুখে চলিলেন; রজনী বিস্মিত হইয়া সেই খানে রহিলেন। তৎপরে আত্মস্মৃতি লাভ করিয়া দৌড়িয়া কুমুদিনীর সম্মুখে গিয়া বলিলেন "আমার একটা শেষ কথা শুন—এ কথা তোমার শুনিবার কোন আপত্তি নাই। আমায় যে কটূক্তি করিলে তাহার আমি যোগ্য নহি; আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমাদিগের গোপনীয় কথোপকথন শুনি নাই; আমায় দ্বারবানেরা বলিল যে তোমার পিতা এই উদ্যানে আসছেন; আমি তদনুসারে এখানে আসিলাম। কামিনী বৃক্ষ পর্য্যন্ত আসিয়া তোমাদিগের কথা বার্ত্তা শুনিলাম। শুনিয়া আমি স্তম্ভিত ও চলৎশক্তি হীন হইয়াছিলাম—কেন তাহা আর বলিতে

চাহি না। সুতরাং তোমার শেষ কথাও শুনিতে পাইলাম—আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমাদের কথা শুনি নাই—আমি অভদ্র নহি; আমি ইতর নহি—তুমি আমায় এপ্রকার স্বভাবান্বিত মনে করিলে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আমার সহিত আর তোমার সাক্ষাৎ হইবে না। তুমি আমার সব। তোমার সম্মুখে শপথ করিতেছি আর দেখা দিয়া তোমায় যন্ত্রণা দিব না।"

এই বলিয়া রজনীকান্ত বেগে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। কুমুদিনী দেখিলেন যে রজনী এই কথা যখন বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার চক্ষে দুই এক ফোটা বারিবিন্দু পড়িয়াছিল—কুমুদিনী ব্যথিতা হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সুহৃৎ-সঙ্গম।

[কলেজ রিউনিয়নের দ্বিতীয় সম্মিলন উপলক্ষে।*]

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

(১)

বসন্ত-পঞ্চমী তিথি আজি বঙ্গে,
বাজ দেখি বীণা আনন্দের সঙ্গে,
খেলায়ে হৃদয়ে সুখের তরঙ্গে
ভাসা দেখি তায় আশার ফুল।

(২)

শুনিয়া প্রাচীন "অর্ফিউস" গান
পাইল চেতন অচল পাষাণ,
শ্যামের বাঁশীতে যমুনা উজান
বহিল উল্লাসে রসায়ে কূল॥

(৩)

তুই কি নারিবি চেতন পরাণে,
সুহৃত-সঙ্গমে এ সুখের দিনে,
উথলিয়া স্রোত ঈষৎ প্রমাণে
ভিজাতে প্রণয়-তরুর মূল?

(৪)

"কোথা বাল্য-সখা—" বলি একবার
ডাক্ দেখি সুখে মিলে সব তার,
"আয় রে শৈশব-সুহৃৎ আবার
আশার কাননে খেলাতে যাই।"

(৫)

বল্, বীণা, বল্ "নবীন জীবনে
খেলিলে আনন্দে যাহাদের সনে,
হাসিলে, কাঁদিলে, মিলিলে স্বপনে,—
আজ্ কি তাঁদের স্মরণে নাই।"

(৬)

"স্মরণে কি নাই সে সৌরভময়
শৈশবের প্রিয় পাদপ নিচয়,
তড়াগ, প্রাঙ্গণ, সেতু, শিক্ষালয়,
জড়ালে যাহাতে শিশুর মায়া।

* লেখকের নিয়োগানুসারে বঙ্গদর্শনে এই কবিতা প্রকাশিত হইল। ইহা রি-উইনিয়নে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত হইয়া ছিল।

(৭)

"ভুলিলে কি সেই উৎসাহলহরী,
ভাসায়ে যাহাতে জীবনের তরী
তরঙ্গ তুফান্ হেয়জ্ঞান করি
উড়াতে নিশান বিচিত্র কায়া॥

(৮)

"পড়ে নাকি মনে কত দিন হায়,
'মা'—'মা' বলি প্রবেশি আলয়
কত সুখে খেতে সথায় সথায়
জননী তুলিয়া দিতেন যাহা।

(৯)

"সেইরূপে পুনঃ করিয়া উৎসব
জীবন-মধ্যাহ্নে এসো সখা সব
লভি একদিন—যে সুখ দুর্লভ
সংসার-তুফানে ডুবেছে আহা॥

(১০)

"নবীন প্রবীণ এসো সবে মেলি
পরাণে জড়াই পরাণ-পুতলি,
যে ভাবে শৈশবে, যৌবনেতে কেলি
করেছি প্রাণের কপাট খুলে।

(১১)

"লঘু আশা, হায়, লঘু তৃষা লয়ে
শিশুকালে যদি উনমত্ত হয়ে
বাঁধিতে পেরেছি হৃদয়ে হৃদয়ে
স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ সকলি ভুলে।

(১২)

"তবে কি এখন নারিব মিলিতে?
গাঢ় চিন্তা, আশা যখন হৃদিতে
তুলেছে তরঙ্গ প্রবল গতিতে—
বাসনা ঝটিকা বহিছে যবে?

(১৩)

"করিলে যে আগে এত সে কামনা,—
ধরিলে যে হৃদে এত সে বাসনা—
শুধু কি সে সব শিশুর জল্পনা
ছিন্ন তৃণ সম বিফল হবে?

(১৪)

"চেয়ে দেখ, সখে, রয়েছে তেমতি
পাঠগৃহ, মাঠ, সরোবর, পথি,
তেমতি সুঠাম সুন্দর মূরতি
সেই স্তম্ভশ্রেণী হাসিছে হায়।

(১৫)

"আমরাও তবে হাসিব না কেন?
হাসিতাম সুখে আগে সে যেমন
অইখানে যবে করেছি ভ্রমণ
ভানু, বৃষ্টি-ধারা ধরি মাথায়॥

(১৬)

"অই গৃহ, মাঠ, পথ, সরোবর,
অহে কত দিন দেখ কত বার,
ভেবেছ কি কভু কত রত্ন তার
করাল কৃতান্ত করেছে চুরি?

(১৭)

কোথা-সে আজি রে ক্ষণজন্মা ধীর
"দ্বারিক" সুহৃৎ বঙ্গের মিহির!
কোথা "অনুকূল" মলয় সমীর!
"দিনবন্ধু" বঙ্গ-সাহিত্য-সুরি!

(১৮)

"শ্রীমধুসূদন" কোথা সে এখন!
তার তরে আর কে করে ক্রন্দন
সহপাঠী তার?—এবে অদর্শন
বঙ্গের প্রদীপ্ত প্রভাত তারা?

(১৯)

"হে বঙ্কিম, সখে তোমরাও সবে
ক্রমে ক্রমে লীন হইবে এ ভবে,*
নাম, গন্ধ, শোভা কিছুই না রবে—
কালেতে হইবে সকলি হারা।

(২০)

"তাই বলি ভাই এসো একবার
সম্বৎসরে সুখে মিলি হে আবার,
সহাস্য বদনে হৃদয়ের দ্বার
খুলিয়া দেখাই, দেখি আনন্দে।

(২১)

"আর কত দিন বাঁচিব সে বল—
বাঙ্গালির ক্ষুদ্র জীবন-সম্বল
কবে সে ফুরাবে—ছাড়িয়া সকল
ভুলিতে হইবে এ মকরন্দে!

(২২)

"এ শোকের ছায়া ছিল না যখন—
পড়ে নাই ঢাকি হৃদয় দর্পণ,
সুখপূর্ণ মহী, সুখপূর্ণ মন—
সকলি সুন্দর মাধুরীময়।

(২৩)

"সবে সখা-ভাব—ছিল না বিচার
ধনাঢ্য, কাঙ্গাল, রাজপুত্র আর,
একি সে আসন, পঠন সবার—
আনন্দে হৃদয় মগন রয়॥

(২৪)

"সেই সুখময় সুহৃদের মেলা,
পেয়েছ আবার কর সবে খেলা,
সুখের সাগরে ভাসাইয়া ভেলা
খেলাইতে যথা শৈশবকালে।

(২৫)

বাজ বীণা এবে মিলি সব তার,
মৃদুল মৃদুল করিয়া ঝংকার,
প্রণয় কুসুম ফুটাবে সবার,
সরস মধুর জলদ তালে॥

[কোরস্]

বসন্ত-পঞ্চমী তিথি আজি বঙ্গে,
বাজ্ বীণা, বেগে আনন্দের সঙ্গে,
খেলায়ে হৃদয়ে সুখের তরঙ্গে,
ভাসারে তাহাতে আশার ফুল।

শুনিয়া প্রাচীন গায়কের গান
পাইল চেতন অচল পাষাণ,
শ্যামের বাঁশীতে যমুনা উজান
বহিল উল্লাসে রসায়ে কূল॥

তুই কি নারিবি চেতন-পবাণে,
সুহৃত সঙ্গমে এ সুখের দিনে,
উথলিয়া স্রোত ঈষৎ প্রমাণে
ভিজাতে প্রণয়-তরুর মূল।

বর্ষ সমালোচন।

সম্বাদ পত্রের প্রথা আছে, নববর্ষ প্রবৃত্ত হইলে গত বর্ষের ঘটনা সকল সমালোচনা করিতে হয়। বঙ্গদর্শন সম্বাদ পত্র নহে, সুতরাং বঙ্গদর্শন বর্ষ-সমালোচনে বাধ্য নহে। কিন্তু আমাদের কি সাধ করে না? যেমন অনেকে